it is true the Indian artists are second to none. The stone cutters at Gandhar and at Amraoti display the same skill in drawing elaborate patterns and the same skill in executing them, which we now admire in the work of the modern carpet-weavers and Vase-makers. But in the expression of human passions and Emotions, Indian art has completely failed, except during the time when it was held in Graeco-Roman leading strings, and it has scarcely at any time essayed an attempt to give visible form to any divine ideal."

ভারতীয় শিল্পকলা সম্বন্ধে কোন ইউরোপীয় বিশেষজ্ঞ উপরোক্ত মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন এবং সাধারণতঃ ধরিতে গেলে ভারতীয় শিল্পকলা সম্বন্ধে ইহাই ইউরোপীয় পণ্ডিতদিগের মত। ইহাদের মতে ভাস্কর্য্য Sculpture চিত্রবিদ্যা painting ও সঙ্গীত এবং অন্যান্য সমস্ত বিষয়েই ভারত ইউরোপ অপেক্ষা অনেক হীন, এমন কি উভয়ের তুলনাই হইতে পারে না।

ভারতে এখন পর্য্যন্তও, যে সমস্ত বাস্তবিকই উচ্চ আদর্শের ভাস্কর্য্য (Sculpture) কিম্বা painting এর অস্তিত্ব আছে যাহার উৎকর্ষ বিষয়ে কেহই সন্দেহ করিতে প্রস্তুত নহেন—ইহাদের মতে সে সমস্তই গ্রীক অথবা ইউরোপীয় শিল্পী দ্বারা প্রস্তুত। তাজমহল ইহাদের মতে ইটালীয় শিল্পীর দ্বারা প্রস্তুত। কারণ ইহার ভিতরে দেওয়ালের গায়ে যেরূপ লতাপাতা অঙ্কিত আছে তৎ সদৃশ লতা-পাতা ইটালীয় কারিগরগণও অঙ্কিত করিয়াছেন। গান্ধার ও অমরাবতীর ভাস্কর্য্যই গ্রীক ও রোমান শিল্পের অনুকরণ। এ জন্য ইহাদের সৌন্দর্য্য অস্বীকার করিবার উপায় নাই। অজান্তা গুহার অত্যাশ্চর্য্য চিত্রাবলীও এই কারণে গ্রীক-প্রভাবের নিদর্শন। দ্বিতীয় পুলিকেশীর রাজ-সভায় (৬২৫ খ্রীঃ) পারস্য-

রাজার দূতের আগমনের এক সুন্দর চিত্র আছে। এই চিত্রকে উপলক্ষ্য করিয়া কোন ইউরোপীয় পণ্ডিত লিখিয়াছেন—"It proves or goes a long way towards proving that the Ajanta school of pictorial art was derived directly from Persia and ultimately from Greece."

উপরোক্ত যুক্তি অনুসরণ করিয়া সহস্র বৎসর পরে কোন ভারতবাসী পণ্ডিত সম্রাট ৫ম জর্জ্জের রাজ্যাভিষেকের চিত্রে ভারতীয় নৃপতিবৃন্দের মূর্ত্তি দেখিয়া যদি অনুমান করেন যে ইংলণ্ডের চিত্রবিদ্যা ভারতীয় প্রভাব-পূর্ণ, তবে সে অনুমান অযৌক্তিক হইবে না।

ভারতীয় স্থাপত্য-বিদ্যাসম্বন্ধে ইউরোপীয় পণ্ডিতদিগের ইহা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অনুকূল মত আছে। কোনও পণ্ডিত বলিতে বাধ্য হইয়াছেন "They designed like Titans and finished like jewellers" কিন্তু তথাপিও একটু দংশন করিতে ছাড়েন নাই। তাঁহাদের মত যে ভারতবর্ষীয়েরা খিলানের নির্ম্মাণের কৌশল জানিতেন না। কারণ কোনও পুরাতন মন্দিরে খিলান নাই। কিন্তু ইহারা ভুলিয়া যান যে, ভারতবর্ষই ক্ষেত্রতত্ত্ব ও গণিতের জন্মস্থান। আজ পর্য্যন্তও যে দশমিক-প্রথায় অঙ্কপাতের প্রণালী সমস্ত পৃথিবীতে প্রচলিত, তাহা এই ভারতবর্ষেই আবিষ্কৃত হইয়াছিল। কালক্রমে যদি রঙ্গপুর সহর পাটলীপুত্র ও পম্পের ন্যায় ভূপ্রোথিত হয় এবং ৫০০০ বৎসর পরে যদি কোনও ব্যক্তি রঙ্গপুরের উপস্থিত কালেক্টরীর কাছারী খনন করিয়া বাহির করেন, তবে তিনি অনায়াসে অনুমান করিবেন যে, ইংরাজেরা খিলান তৈয়ার করিতে জানিতেন না। কারণ ঐ গৃহে খিলান নাই। মোটের উপর ভারতের যাহা কিছু ভাল তাহা সমস্তই বিদেশীয় এবং যাহা মন্দ তাহা আমাদের নিজস্ব।

কেহ কেহ বলিবেন যদি আমাদের শিল্প সত্যই ভাল হয় তবে ইউরোপীয়দিগের মতামতে ক্ষতি-বৃদ্ধি কি?

ক্ষতি-বৃদ্ধি পূর্ব্বে ছিল না, কিন্তু এখন যথেষ্ট ক্ষতি-বৃদ্ধি আছে। সুকোমল লতার ন্যায় শিল্পও পরিচর্য্যা, যত্ন এবং আশ্রয়ের উপর নির্ভর করে। পূর্ব্বে রাজপ্রাসাদ, দেবালয়াদি প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে রাজানুগ্রহ ও লোকানুগ্রহের ভিত্তির উপর শিল্প দণ্ডায়মান ছিল। এখন অবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হইয়াছে। ইউরোপ এখন পৃথিবীর মধ্যে প্রবল। ইউ-রোপের বাজারে এখন পৃথিবীর পণ্যদ্রব্য যাচাই হয়। ইউরোপের যে মত আমাদেরও তাহাই।

ইউরোপ বলিতেছেন ভারতীয় শিল্প অতি জঘন্য, এবং শিল্প-প্রদর্শনীতে ভারত-শিল্পকে স্থান দেন না, সুতরাং আমাদেরও ঐ মত এবং আমরাও আমাদের শিল্পকে দেশ হইতে একেবারে বিতাড়িত করিবার চেষ্টায় আছি। প্রচুর অর্থব্যয় করিয়া কলের পুতুল ও বিলাতি চিত্র আনিয়া আমাদের ঘর বোঝাই করিতেছি। আমাদের শিল্পীরাও আমাদের রুচি অনুসারে বিলাতি চিত্রের অনুকরণ করিয়া আমাদের শিল্পের প্রাণটুকু পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে বসিয়াছেন। জাতীয় শিল্পই জাতীয়ত্বের পরিণতি ও নিদর্শন। আমরা আমাদের জাতীয়ত্ব পর্য্যন্ত হারাইতে বসিয়াছি।

ইউরোপীয়দিগের ভারত-শিল্পসম্বন্ধে এই অবজ্ঞার প্রধান কারণ আমাদের আচার-ব্যবহার, সাহিত্য, দর্শন, ধর্ম্ম, ইত্যাদি বিষয়ে তাঁহাদের অনভিজ্ঞতা।

ইউরোপীয়গণ আমাদের শিল্পকে গ্রীস ও রোমের তুলাদণ্ড দ্বারা ওজন করিতে চান। কিন্তু ইউরোপীয় শিল্প ও আমাদের শিল্প সম্পূর্ণ বিভিন্ন ভিত্তির উপর স্থাপিত। সুতরাং একই তুলাদণ্ডের দ্বারা উভয়কে ওজন করিলে চলিবে কেন? এই দুই জাতির বিভিন্ন আচার, ব্যবহার রীতি, নীতি ইত্যাদির প্রতি লক্ষ্য করিলেই এই কথা স্পষ্টই বুঝা যাইবে।

একটি ইউরোপীয় উদ্যানে, প্রবেশ করিলে চারিদিকে নানা বর্ণের

বিচিত্র কুসুমরাজি স্তরে স্তরে প্রস্ফুটিত দেখিবে। দেখিয়া নয়ন মোহিত হইবে, কিন্তু প্রায় কোন ফুলেই গন্ধ নাই। আমাদের প্রবাদ-প্রসিদ্ধ শিমূল ফুলও হয়ত এই বাগানে স্থান পাইবার যোগ্য। বলিতে গেলে এই বাগানের মূলমন্ত্র বাহ্যিকরূপ।

অপর দিকে একটি ভারতীয় উদ্যানে প্রবেশ করুন। উদ্যান অর্থে আধুনিক বড়লোকদিগের প্রমোদ-উদ্যান নহে। গৃহস্থের প্রাঙ্গণ-সংলগ্ন উদ্যানের কথা বলিতেছি। এই উদ্যানে পুষ্পের বর্ণ-বিন্যাস ও বিচিত্রতা নাই। কিন্তু বেল, যুঁই, চামেলি, শেফালিকা ইত্যাদির সৌগন্ধে প্রাণ মোহিত করিবে। মধু ও গন্ধহীন পুষ্প এ উদ্যানে স্থান পায় না। কারণ তাহাতে দেবপূজা হয় না। কেবল পূজার উপযুক্ত পুষ্পই এ উদ্যানে স্থান পায়, তাহাতে বর্ণের বৈচিত্রতা থাকুক আর নাই থাকুক।

ইউরোপীয়দিগের আত্মীয়-বিয়োগ হইলে তাঁহারা কৃষ্ণ পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া শোক-প্রকাশ করেন। শবদেহ সুশোভন শকটে করিয়া গোর-স্থানে লইয়া গিয়া সমাহিত করা হয়। বন্ধুবান্ধবেরা বাম হস্তে কাল ফিতা ধারণ করিয়া নীরবে শবের অনুগমন করিয়া অথবা আর্ত্ত পরিবারের গৃহে কার্ড প্রেরণ করিয়া সহানুভূতি জ্ঞাপন করেন।

আমাদের আত্মীয়বিয়োগ ঘটিলে বন্ধুবান্ধবেরা শবদেহ স্কন্ধে বহন করিয়া শ্মশানে লইয়া যান। মৃত দেহ যথাশাস্ত্র দাহ করিয়া পঞ্চভূতে মিশাইয়া দেওয়া হয়। পরিজনবর্গ নগ্ন দেহে ও নগ্ন পদে শুক্ল পরিচ্ছদ পরিধানপূর্ব্বক ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া নির্দ্দিষ্ট কাল অতিবাহিত করেন এবং তদন্তে মৃতের আত্মার মুক্তিকল্পে যথাশাস্ত্র শ্রাদ্ধাদি সমাপন করিয়া ব্রহ্মচর্য্য ভঙ্গ করেন।

ইউরোপীয়েরা সপ্তাহের কোন নির্দ্দিষ্ট দিনে ও নির্দ্দিষ্ট সময়ে সমবেত হইয়া উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া এবং আহারান্তে স্নিগ্ধ হইয়া উপাসনা-

গৃহে যান। উপাসকদিগের মান-মর্য্যদা অনুসারে আসন নির্দ্দিষ্ট থাকে এবং নত জানু হইবার সময়ে সুকোমল "কুশন" ব্যবহার করেন।

আমাদের উপাসনা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধরণের। অনাহারে শুদ্ধবস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক শরীর ও মন শুচি হইয়া, নিবিষ্ট চিত্তে একাকী কুশাসনে বসিয়া উপাসনা করি। উপাসনা অন্তে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করি। আমাদের দেবালয়ে ধনি-দরিদ্রের প্রভেদ নাই। চিত্তশুদ্ধি আমাদের উপাসনার মূলমন্ত্র এবং চিত্ত-বৃত্তির নিরোধ সাফল্য।

ইউরোপীয়দিগের জগৎই বাস্তব (reality) এবং বর্ত্তমানই সব। মরণান্তে হয় অক্ষয় স্বর্গবাস না হয় অক্ষয় নরকবাস। আমাদের নিকট জগৎ মায়া মাত্র, অনাসক্ত ভাবে এবং ফল-প্রত্যাশা না করিয়া কার্য্য করাই আমাদের ধর্ম্ম। কর্ম্মফল পরজন্ম পর্য্যন্ত আমাদের অনুসরণ করে এবং পরম ব্রহ্মে বিলীন হওয়াই আমাদের চরম উদ্দেশ্য।

ইউরোপীয় শিল্পী ক্ষুৎপিপাসা নিবারণান্তর সম্মুখে model রাখিয়া চিত্র অঙ্কিত করেন।

আমাদের শিল্পী অনশনে সংযত চিত্তে ও নিবিষ্ট মনে তাঁহার শিল্পের প্রতিপাদ্য বিষয় ধ্যান করিয়া সেই ধ্যানলব্ধ ফল প্রস্তরে অথবা পটের উপর প্রতিফলিত করেন।

জাতীয় শিল্প, জাতীয় স্বভাব ও চিন্তার পরিণতি। ইউরোপ ও ভারতের জাতীয় স্বভাবের যখন এত বৈলক্ষণ্য তখন আমাদের শিল্প তাঁহাদের তুলনায় ওজন করিলে চলিবে কেন?

গঠন-পারিপাট্য ও বাহ্যিক সৌন্দর্য্যই ইউরোপীয় শিল্পের আদর্শ।

আধ্যাত্মিকতাই আমাদের শিল্পের প্রতিপাদ্য। প্রকৃতি ইউরোপীয়দিগের নিকট প্রত্যক্ষ সত্য। প্রকৃতিকে অনুকরণ করাই ইউরোপীয় শিল্পের উদ্দেশ্য। মনঃসৌন্দর্য্যই গ্রীকদিগের নিকট স্বর্গীয় লক্ষণ। ইহারা

model সম্মুখে রাখিয়া এবং তাহা অনুকরণ করিয়া, দেবতার প্রতিমূর্ত্তি গঠন করিতেন। সুতরাং তাঁহাদের গঠিত দেবতা সকল সুন্দর মানবমাত্র।

আমাদের পক্ষে প্রকৃতি বা জগৎ বাস্তব নহে মায়া মাত্র। এই মায়ার পশ্চাতে যে বাস্তব (real) বস্তু আছে সেই মায়াময়কে সন্ধান করাই আমাদের শিল্পের কার্য্য। প্রকৃতিকে অনুকরণ করা আমাদের শিল্পের উদ্দেশ্য নহে। প্রকৃতির স্থানবিশেষ পরিস্ফুট করা, সেই স্থানে যে মহৎভাব লুক্কায়িত আছে, তাহা আবিষ্কার করা প্রকৃতির উপরের আচ্ছাদন সরাইয়া দিয়া তাহার অন্তর্নিহিত ভাবটি খুঁজিয়া বাহির করাই আমাদের শিল্পের উদ্দেশ্য।

গ্রীক শিল্পী দেবমূর্ত্তি গঠন করিতে হইলে যোদ্ধার পুরুষোচিত সৌন্দর্য্যকে আদর্শ করিতেন।

ভারতীয় শিল্পী ঐরূপ স্থলে সংযতচিত্ত ব্রহ্ম-অনুসন্ধিৎসু সত্ত্বগুণপ্রধান ক্ষীণতনু ব্রাহ্মণের ক্লেশপরায়ণ অবয়বকে আদর্শ করিবেন। রজোগুণ-ব্যঞ্জক মাংসপেশীসকল মুছিয়া ফেলিবেন এবং মূর্ত্তির মুখের ভাবের দ্বারা তাহার দেবত্ব পরিস্ফুট করিতে চেষ্টা করিবেন।

ইউরোপীয় শিল্প পার্থিব, বাস্তব এবং রজো ও তমোগুণসম্পন্ন। আমাদের শিল্প ধ্যানলভ্য, আধ্যাত্মিক ও সত্ত্বগুণসম্পন্ন। ইউরোপীয় শিল্পী কেবল শিল্পিমাত্র। আমাদের শিল্পী একাধারে কবি, দার্শনিক ও শিল্পী।

মানব-রূপ আমাদের সৌন্দর্য্যের চরম আদর্শ নহে। ভগবানের রূপই চরম আদর্শ; কিন্তু নিরাকার অব্যয়, সর্ব্বব্যাপী অসীম ভগবানের রূপ কল্পনা করা মনুষ্য-শক্তির অতীত। সেইজন্য আমাদের শিল্পীরা মনুষ্য-অবয়বে সূক্ষ্ম ও অনির্ব্বচনীয় ভাব যোগ করিয়া দেবতাগঠন করেন। মনুষ্য গঠন করিতে হইলে তাহাতেও কিছু আধ্যাত্মিক ভাব প্রবেশ করাইয়া

দেন। এইখানেই আমাদের শিল্পের বিশেষত্ব এবং এই হিসাবে আমাদের শিল্প গ্রীক ও রোমের শিল্প অপেক্ষা বহু উন্নত।

গ্রীক শিল্পীর গঠিত দেবতা Achilles, Jupiter প্রভৃতির সহিত বড়বদর ও লঙ্কা দ্বীপের বুদ্ধ-মূর্ত্তির তুলনা করুন। গ্রীক দেবতাদের গঠন-প্রণালী অতি সুন্দর, কিন্তু সৌন্দর্য্য ভিন্ন তাঁহাদের অন্য কিছু দেবত্ব নাই। তাঁহারা সৌন্দর্য্যশালী মানবমাত্র। অপর দিকে বুদ্ধ-মূর্ত্তির প্রশস্ত ললাট, অর্দ্ধমুদিত নয়ন, জ্ঞান, অনাসক্তি ও পারলৌকিক চিন্তার পরিচায়ক। করুণ অধর মনোদুঃখে কাতরতা ও সহানুভূতিব্যঞ্জক। অধরের ঈষৎ হাসি ও হস্তের সঙ্কেত মনুষ্যকে আশ্বাস ও অভয়দান-তৎপর। এ মূর্ত্তির সহিত গ্রীক দেবতার তুলনাই হইতে পারে না। গ্রীক দেবতার প্রাণ নাই। এ মূর্ত্তিতে প্রাণ বর্ত্তমান। গ্রীক শিল্পে এরূপ দৃষ্টান্ত একটিও নাই। দুঃখের বিষয় আমাদের ঘরে এরূপ আদর্শ থাকিতে আমরা তাহা পরিত্যাগ করিয়া ইউরোপে আদর্শ খুঁজিতে যাই।

আমাদের শিল্পিরা দেব-দেবীর যে মূর্ত্তি কল্পনা করিয়াছেন তাহা মনুষ্য-কল্পনার চরম সামাবর্ত্তিনা।

সরস্বতী, জ্ঞান, বিদ্যা ও সঙ্গীতের অধিষ্ঠাত্রীদেবী সুতরাং তিনি শুভ্রবর্ণা, শুভ্রবস্ত্রাবৃতা শ্বেত সরোজবাসিনী এবং বীণা ও পুস্তকধারিণী। শ্বেতবর্ণ ও শ্বেতপদ্ম পবিত্রতা ও যশঃ-সৌরভজ্ঞাপক। হিন্দু-সঙ্গীতের সর্ব্বোৎকৃষ্ট যন্ত্র বীণা সঙ্গীতশাস্ত্রের পরিচায়ক এবং পুস্তক বিদ্যা ও জ্ঞানের রূপক। বিদ্যা, জ্ঞান ও সঙ্গীত সততই নবীন, সুন্দর ও আনন্দদায়ক। সুতরাং সরস্বতী হাস্যময়ী, সুন্দরী ষোড়শী রমণী।

আধুনিক ইউরোপীয় শিল্পী এই মূর্ত্তির কল্পনা করিতে হইলে বোধ হয়, থিয়েটার হইতে কোন রমণীকে ভাড়া করিয়া আনিয়া পুস্তকাগারের ভিতর পিয়ানোর ধারে বসাইয়া ছবি তুলিতেন

মনুষ্য-কল্পনা কতদূর অগ্রসর হইতে পারে তাহা আমাদের সঙ্গীতের রাগ-রাগিণীর মূর্ত্তি দেখিলেই অনুমান হয়। সঙ্গীত শুনিবার জিনিষ, দেখিবার নহে, কিন্তু তথাপি আমাদের ঋষিরা ইহার শ্রেণী-বিভাগ করিয়াই ছাড়েন নাই। ইহাদের মূর্ত্তি-কল্পনা ও পরস্পরের সম্বন্ধ পর্য্যন্ত নির্ণয় করিয়াছেন। কোন রাগ গীত হইলে শ্রোতার মনে যে ভাবের উদয় হয়, তাহাকে সেইরূপ মূর্ত্তি দেওয়া হইয়াছে। ভৈরবী করুণ রাগিণী; সুতরাং তিনি শুক্লবসনা রোদনপরায়ণা অসাধারণ সৌন্দর্য্যশালিনী রমণী। আর একটি মূর্ত্তির প্রতি লক্ষ্য করুন, একথা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে। যে সময় কামান-বন্দুক ছিল না, সেই সময়ে ভগবানের শক্তির কল্পনা করিতে হইলে সিংহবাহিনী দশ হস্তে বিবিধ আয়ুধধারিণী, অজ্ঞান ও অরাতিরূপ অসুর নিধনকারিণী—ভক্তের প্রতি বরাভয়দায়িনী, জ্ঞান ও বিদ্যারূপিণী সরস্বতী, সম্পদরূপিণী লক্ষ্মী, বল ও শৌর্য্যরূপী কার্ত্তিক ও সিদ্ধিরূপী গণেশের জননী হাস্যময়ী দুর্গা-মূর্ত্তি ভিন্ন মনুষ্য-কল্পনায় আর কি হইতে পারে? শিল্প, কবিত্ব, দর্শন সমস্তই এই মূর্ত্তিতে একাধারে বর্ত্তমান। এই মূর্ত্তি জাতি ও ধর্ম্মনির্ব্বিশেষে সকলেরই সাধনার বস্তু।

ভারত-শিল্পীরকৃত দেব-দেবাদিগের হস্ত-পদাদির সংখ্যা ও শরীরের বর্ণ অস্বাভাবিক বলিয়া ইউরোপীয়গণ উপহাস করিয়া থাকেন। হস্তাদির সংখ্যা-বিষয়ে কৈফিয়ৎ উপরেই দেওয়া হইয়াছে। প্রয়োগেরও ঐ উদ্দেশ্য। অসীম পরমব্রহ্মের বর্ণ কল্পনা করিতে হইলে, অসীম নভোমণ্ডলের নীল-বর্ণ ব্যতীত অন্য কোন্ বর্ণ হইতে পারে?

আমাদের শিল্পীর প্রস্তুত মূর্ত্তির শরীরে মাংসপেশী ইত্যাদির অভাব দেখিয়া ইউরোপীয়েরা স্থির করিয়াছেন যে, ভারত-শিল্পীরা শারীরবিদ্যা জানিত না। আধুনিক কৃষ্ণনগরের শিল্পীর প্রস্তুত পুতুল অনেকে দেখিয়াছেন। সকলেই স্বীকার করেন যে, তাহাদের শারীরবিদ্যা জ্ঞান

আছে এবং ঐ সব পুতুল আদর করিয়া সাহেবরা কিনিয়া থাকেন। কিন্তু ঐ শিল্পীর প্রস্তুত দেবমূর্ত্তি সম্পূর্ণ বিভিন্ন বস্তু। পুতুল ইউরোপীয় প্রথায় স্বভাবের অনুকরণ। দেবমূর্ত্তি তাহা নহে। আমাদের আর একটি বিষয় ইউরোপীয়েরা মোটেই সহ্য করিতে পারেন না, সেটি আমাদের সভ্যতার প্রাচীনতা। এখন ক্রমেই আবিষ্কার হইতেছে যে, আমাদের সভ্যতা রোম ও গ্রীসের তুলনায় অত্যন্ত আধুনিক। চিরকাল শুনিয়া আসিতেছি যে, বিক্রমাদিত্য নামে এক বিদ্যোৎসাহী রাজা ৫৭ শতাব্দীতে ছিলেন, কিন্তু এখন কোন কোন ইউরোপীয় ঐতিহাসিক প্রমাণ করিতেছেন যে, বিক্রমাদিত্য নামে কোন রাজা ছিলেন না। কালিদাসকে আমরা বিক্রমাদিত্যের সমসাময়িক জানি, কিন্তু এখন প্রমাণ হইতেছে যে, তিনি ষষ্ঠ হইতে অষ্টম খৃষ্টাব্দীর লোক। কোন দিন শুনিব যে তিনি সিপাহী-বিদ্রোহের কিছু পূর্ব্বে ছিলেন, অথবা ছিলেনই না এবং শকুন্তলা জারমান পুস্তকের অনুবাদ মাত্র। এইরূপ বেদ, পুরাণ, মহাভারত ইত্যাদির কাল ক্রমেই অগ্রসর হইয়া আসিতেছে। সম্প্রতি Historian's History of the world মুদ্রিত হইয়াছে, তাহাতে পৃথিবীর সমস্ত জাতির ইতিহাস আছে। বিজ্ঞাপনে মুগ্ধ হইয়া প্রচুর অর্থব্যয় করিয়া একখানি ক্রয় করিলাম। দেখিলাম গ্রীক, রোম, ফ্রান্স, ইংলণ্ড প্রভৃতিকে ৩।৪ খণ্ডে স্থান দেওয়া হইয়াছে আর ভারতবর্ষ কুচা-নৈবেদ্যের মধ্যে পড়িয়াছে। মোটে কয়েক পৃষ্ঠা, তাহারও অর্দ্ধেক ভারত-সভ্যতার আধুনিকতা প্রমাণের জন্য। ভারত-সভ্যতা আলেকজেণ্ডারের আগমনের পরে উৎপন্ন, কারণ তাহার পূর্ব্বে গ্রীক ঐতিহাসিকেরা এ বিষয়ে কিছু লিখেন নাই। খৃষ্ট পূর্ব্ব ১ম শতাব্দীর পূর্ব্বে ভারতবাসী ইষ্টক-প্রস্তরাদির দ্বারা গৃহ-নির্ম্মাণ করিতে জানিতেন না, কারণ এরূপ কোন গৃহের নিদর্শন পাওয়া যায় না। অদ্ভুত যুক্তি, ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ প্রমাণা-

ভাবাৎ। আমরা বলি খৃষ্টপূর্ব্ব বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্ব হইতে আমাদের সভ্যতা ও কলাবিদ্যা চলিয়া আসিতেছে।

প্রায় ৫ সহস্র বৎসর পূর্ব্বে কলিযুগোৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া পঞ্জিকাকারেরা নির্দ্ধারণ করেন এবং তাহার বহু পূর্ব্বে আমাদের সভ্যতার উৎপত্তি এই কথা আমরা বলি। ইউরোপ হাসিয়া বলেন, ঈশ্বর তখন পৃথিবীই সৃষ্টি করেন নাই।

প্রাচীন মিসর সম্বন্ধেও ইউরোপের এই ধারণা ছিল। কিন্তু এখন ক্রমে ক্রমে খৃঃ পূঃ ৬০০০ বৎসর পর্য্যন্ত মিসরের ইতিহাস গঠিত হইয়াছে। ভারতসম্বন্ধে আপত্তি "তোমাদের ইতিহাস নাই।"

আমাদের দেশের ইতিহাস আমাদের রাজার ইতিহাস। তাহা ভাটমুখে থাকিত। তাঁহাদের কীর্ত্তিকলাপ এবং তাঁহাদের প্রস্তুত মন্দিরাদি ও তাঁহাদের ইতিহাস, যে রাজা কীর্ত্তিমান্ লোকপরম্পরায় তাঁহার নাম জাগাইয়া রাখিত। তাজমহল অপেক্ষা সাজাহানের আর কি উৎকৃষ্ট ইতিহাস হইতে পারে? তদ্রূপ বিপুল অর্থব্যয়ে ও পুরুষানুক্রমের চেষ্টায় প্রস্তুত স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্য-শিল্পের নিদর্শন এক একটি মন্দির কি সামান্য ইতিহাস? তখন কে জানিত যে, ভাষার উপর দিয়া এত ঝড় বহিয়া যাইবে? কে জানিত যে এত স্থায়ী ইতিহাসও টিকিবে না?

আর আমাদের নিজের ইতিহাস? আমাদের নিত্য অনুষ্ঠেয় ধর্ম্মকর্ম্মে সপ্তপুরুষের নাম আবৃত্তি করিতে হয়। তাহার পূর্ব্বের ইতিহাস আমাদের ঘটক-মুখে। তাহার পূর্ব্বের ইতিহাস আমাদের সাহিত্য, দর্শন, ন্যায়, পুরাণ ও শিল্প। তাহারও পূর্ব্বের ইতিহাস আবশ্যক হইলে ভারদ্বাজ, আঙ্গিরস, বার্হস্পত্য, প্রবরস্য এই নশ্বর ও ক্ষণস্থায়ী জগতে, ইহার অধিক ইতিহাসে আমাদের আবশ্যক কি?

আর অন্য যে ইতিহাস আমাদের আছে তাহাই বা বিশ্বাস হয় কই?

কাশ্মীরের "রাজ-তরঙ্গিণী" আছে। নেপালের ইতিহাস আছে। শেষোক্ত ইতিহাস খৃঃ পূঃ ৩০০০ বৎসর হইতে ধারাবাহিকরূপে লিখিত। সুতরাং তাহা অবিশ্বাস্য।

খৃষ্টজন্মের বহুশতাব্দী পূর্ব্বে প্রাচীন মিসরের ইতিহাসে ভারতজাত পণ্য ও শিল্পদ্রব্যের উল্লেখ দেখা যায়। প্রাচীন ফিনিসীয়, গ্রীস ও রোমেও ভারতশিল্প আদরে গৃহীত হইত। কিন্তু ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা বলেন, এই বাণিজ্য-ব্যাপারে ভারত কেবল গৌণরূপে সম্পর্কিত ছিলেন। কারণ ভারতীয়েরা নাবিক ছিলেন না। এটা নেহাৎ গায়ের জোরের কথা। কালিদাসের "বাঙ্গাল নৌ সাবনর্নি" কথাটি না হয় কাব্য বলিয়া উড়াইয়া দিলাম, কিন্তু যে ভারতের সেগুণ কাষ্ঠনির্ম্মিত অর্ণবপোত ২০০ বৎসর পূর্ব্বেও পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট পোত বলিয়া বিবেচিত হইত এবং ইউরোপ আগ্রহের সহিত ক্রয় করিতেন, যে ভারত সুদূর Java ও Cambodia উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছেন, যে ভারত চীন, জাপান প্রভৃতি দেশে ধর্ম্মের সহিত সভ্যতা ও শিল্প বিতরণ করিয়াছে সেই ভারতীয়েরা নাবিক ছিলেন না ইহা বড়ই আশ্চর্য্যের কথা।

ভারত-শিল্পের প্রাচীনত্বসম্বন্ধেও ইউরোপীয়দিগের এই মত। ২০০ খৃঃ পূর্ব্বের আগে ভারতে কোনরূপ শিল্প ছিল ইহা তাঁহারা স্বীকার করিতে চান না, কারণ তাহার কোন নিদর্শন নাই। ইঁহাদের মতে বড়বদুরের শিল্প ৭ম হইতে ১০ খৃষ্টাব্দের, কাম্বোডিয়ার শিল্প ৫ম খৃষ্টাব্দের, অজন্তার শিল্প ২য় খৃঃ.পূঃ হইতে ৯ম খৃষ্টাব্দের এবং সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন বারহুত, Elephanta ও এলোরার শিল্প অশোকের সময়ের ২৫০ খৃঃ পূঃ। সুতরাং ইহার পূর্ব্বে ভারতে কোন শিল্প ছিল না।

বাৎসায়নকৃত কামসূত্র নামক গ্রন্থে প্রাচীন ভারতে চতুঃষষ্টিকলা-বিবরণ পাঠ করিলে জানা যায় যে. ঐ সময়ে ভারতে শিল্পের কত উন্নতি

হইয়াছিল। সঙ্গীত, বাদ্য, নৃত্য, সূচীকর্ম্ম, নাটকাভিনয়, খনিজ, অস্ত্রবিদ্যা, ভাস্করবিদ্যা, চিত্রবিদ্যা, ইন্দ্রজালবিদ্যা, উদ্যান-রচনা ইত্যাদি বহু বিষয়ের উল্লেখ ঐ গ্রন্থে দেখা যায়। এই গ্রন্থ খৃঃ পূঃ ৪র্থ শতাব্দীতে প্রণীত হইয়াছিল বলিয়া অনুমান হয়; সুতরাং তাহার বহুপূর্ব্ব হইতেই এই সমস্ত বিদ্যা ভারতে প্রচলিত ছিল। রামায়ণ, মহাভারত ও প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য ও অন্যান্য গ্রন্থেও এই সমস্ত শিল্পের উল্লেখ দেখা যায়।

শুক্রাচার্য্যের শিল্পশাস্ত্রে তাম্রনির্ম্মিত শিল্পই স্থায়িত্ববিষয়ে সর্ব্বোৎকৃষ্ট। প্রস্তরখোদিত অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট। পটাঙ্কিত চিত্র তদপেক্ষাও অস্থায়ী এবং গৃহগাত্রাঙ্কিত চিত্র সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। এই সমস্ত শ্রেণীর শিল্পের মধ্যে কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধ ২০০০ বৎসরের দ্বিতীয় ও ও চতুর্থ শ্রেণীর শিল্পই এখনও বর্ত্তমান। কিন্তু প্রথম ও তৃতীয় শ্রেণীর পুরাতন শিল্প আমরা দেখিতে পাই না। ইহার কারণ কি? উক্ত শ্রেণীর প্রাচীন শিল্প গেল কোথায়? ভারতের ইতিহাসকে জিজ্ঞাসা করিলে বোধ হয় ইহার কিছু উত্তর পাওয়া যাইতে পারে। প্রসিদ্ধ সোমনাথের মন্দির যেখানে গিয়াছে, ইহারাও সেইখানে।

এই প্রবন্ধের প্রথমেই যে ইংরাজ-পণ্ডিতের মত উদ্ধৃত করা হইয়াছে, তিনি একটি মহা ভুল করিয়াছেন। তাঁহার মতে গ্রীক-প্রভাজাত গান্ধার-শিল্পই ভারতের সর্ব্বোৎকৃষ্ট খোদিত শিল্প। ইউরোপীয় আদর্শ অনুসারে ইহা সত্য হইতে পারে। কিন্তু আমাদের আদর্শ তাহা নহে। গান্ধার-শিল্পে, গঠন-পরিপাট্য এবং অবয়বের সৌন্দর্য্য আছে সত্য, কিন্তু তাহাতে ভারতশিল্পের প্রাণ নাই। ইহা অপেক্ষা Elephanta, সাঞ্চি, ইলোরা ও Combodiaর শিল্প যথেষ্ট উন্নত। কিন্তু ভারতের সর্ব্বোৎকৃষ্ট শিল্পের অনুসন্ধান করিতে হইলে অজন্তা ও বরুবদুরে যাইতে হইবে। অজন্তা-শিল্পীদিগের কার্য্যকুশলতা ও পারদক্ষতা ইউরোপীয়েরাও অস্বীকার করিতে

পারেন না। অতি কঠিন ও দুরূহ বক্ররেখাসকল অতি দক্ষতার সহিত একটানে অঙ্কিত করা হইয়াছে। এখানকার শিল্পের সৌন্দর্য্য তাহাদের নিতান্ত সরলতা, মহৎভাব-ব্যঞ্জকতা ও আড়ম্বরশূন্যতা। মুসলমানগণের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের খোদিত শিল্পের লোপ পাইল। কারণ এই শিল্প তাহাদের ধর্ম্মশাস্ত্রের বিরোধী। আকবরপ্রমুখ উদারস্বভাব মুসলমান নরপতিদিগের সময়ে চিত্রবিদ্যা কিঞ্চিৎ আশ্রয় পাইয়াছিল। কিন্তু মুসলমানদিগের আড়ম্বরপ্রিয়তার প্রতিধ্বনি শিল্পে গিয়া পৌঁছিল। তাহার ফলে অজন্তার সরলতা ও গভীরতার পরিকীর্ত্তিত চিত্রবিদ্যা সূক্ষ্ম কারুকার্য্য হইয়া উঠিল।

মুসলমানগণ খোদিতলিপি নষ্ট করিয়াছেন বটে, কিন্তু সঙ্গীতশাস্ত্রকে আশ্রয় দিয়াছিলেন, এবং সেই ফলে এখনও সঙ্গীতের কিছু কিছু বর্ত্তমান আছে।

ইউরোপীয়দিগের স্বভাবের সহিত আমাদের স্বভাবের যতখানি প্রভেদ, এই উভয় জাতির সঙ্গীতেও ততখানি প্রভেদ। ইউরোপীয় ঐক্যতান-বাদনে Harmonyর অপূর্ব্ব সমাবেশ। কিন্তু আমাদের রাগরাগিণী melodyর পরাকাষ্ঠা এবং তাহা ইউরোপীয় সঙ্গীতে নাই। ইউরোপীয় সঙ্গীত যুদ্ধযাত্রী সৈনিকের উৎসাহদাতা।

আমাদের সঙ্গীত ধ্যানরত যোগীর সহায়কারী। ইউরোপীয় সঙ্গীত—আলোকমালামণ্ডিত ও মনুষ্য কোলাহলপূর্ণ ধনীর প্রাসাদ। আমাদের সঙ্গীত—নির্জ্জন তীরস্থ চন্দ্রালোক-উদ্ভাসিত দেবমন্দির। অধুনা আমরা ইউরোপীয় রুচি অনুসরণ করিয়া আমাদের এই অমূল্য সঙ্গীতকে ত্যাগ করিতে বসিয়াছি, এবং উৎসব-রাত্রে সানাই, বীণা, কানেড়া, বাগেশ্রী ইত্যাদি উঠাইয়া দিয়া প্রচুর অর্থব্যয়পূর্ব্বক বিলাতী ব্যাণ্ড আনিয়া বর্ব্বরতার পরিচয় দিতেছি। এখন ধ্রুপদ আমাদের ভাল লাগে না।

থিয়েটারের গানই আমাদের প্রিয়। বীণা, সেতার, এস্‌রাজের পরিবর্ত্তে হারমোনিয়ম ও গ্রামোফোন আমাদের ঘরে ঘরে বর্ত্তমান। সৌভাগ্যক্রমে ইউরোপের দৃষ্টি এখন আমাদের সঙ্গীতের দিকে পড়িতেছে। ইউরোপে Certificate পাইলে বোধ হয়, আমাদের সঙ্গীতকে আমরা পুনরায় আদর করিব।

ইউরোপীয়দিগের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের চিত্রবিদ্যার যেটুকু অবশেষ ছিল তাহাও যাইতে বসিয়াছে। ইউরোপীয় রুচির অনুসরণ করিয়া আমাদের শিল্পের প্রাণটুকু বাদ দিয়া তৎপরিবর্ত্তে তাহাতে বিলাতী চাকচিক্য ঢুকাইতেছি এবং ভূরি ভূরি অর্থব্যয় করিয়া প্রাণহীন চাকচিক্যশালী ইউরোপীয় ছবি আনিয়া ঘর বোঝাই করিতেছি। ইউরোপীয় আদর্শের প্রভাব রবিবর্ম্মার চিত্র দেখিলেই অনুমিত হইবে। ইহার চিত্রে গঠন-পারিপাট্য-শারীরবিজ্ঞান ও বর্ণবিন্যাসের ছটা আছে—কিন্তু অজন্তা-শিল্পের প্রাণ ইহাতে নাই; দৃষ্টান্তস্বরূপ ইহার চিত্রিত অশোকবনে সীতার সহিত অবনীন্দ্রনাথ অজিতকুমারের সীতার এবং ইহার চিত্রিত সমুদ্র-শাসন ও হরধনুর্ভঙ্গের রামমূর্ত্তির সহিত নন্দলাল বসুর অহল্যা-উদ্ধারের রামের তুলনা করিলেই প্রতীয়মান হইবে। অজন্তাশিল্পের প্রাণ ও আধ্যাত্মিকতা ইহার চিত্রে নাই। ইহার চিত্রিত লক্ষ্মীকে পদ্মের উপর হইতে নামাইয়া আনিয়া অতিরিক্ত হাত দুইখানিকে ছাটিয়া দিলে নবাবপুরের সুন্দরী নর্ত্তকী বলিয়া পরিচয় দেওয়া যাইতে পারে।

আমাদের শিল্প পুনর্জ্জীবিত করিতে হইলে ইউরোপীয়দিগের কুসংস্কার দূর করিতে হইবে এবং তাঁহাদের মতানুসরণকারী আমাদের নিজের অজ্ঞতা দূর করিতে হইবে। হীরক ও কাচখণ্ডের প্রভেদ তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া দিতে হইবে। দেশের লোকের রুচি মার্জ্জিত করিতে হইবে এবং বরবদুর ও অজন্তা হইতে শিল্পের প্রাণ সঞ্চয় করিতে হইবে। সম্প্রতি

অবনীন্দ্রনাথপ্রমুখ শিল্পিগণ যে ক্ষীণ আশার প্রদীপ জ্বালিয়াছেন, তাহা পোষণ করিতে এবং ঝটিকাঘাত হইতে রক্ষা করিতে হইবে।

শিল্প জাতীয় বস্তু, সুতরাং জাতীয় সহানুভূতি ও সমবেত চেষ্টা ভিন্ন ইহার সাফল্য নাই।

শ্রীভুজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

শ্রীচন্দ্র-দেবের নবাবিষ্কৃত তাম্রশাসন।

[রামপাল-লিপি]

প্রশস্তি-পরিচয়।

(বঙ্গের বর্ম্মরাজবংশের ও সেনরাজবংশের রাজধানী বিক্রমপুর-অঞ্চলে মধ্যযুগের বঙ্গেতিহাস-সঙ্কলনোপযোগী তথ্যানুসন্ধানের প্রয়োজন অনুভব করিয়া, বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতি আমাকে [বর্ত্তমান সালের গ্রীষ্মাবকাশে] পূর্ব্ববঙ্গে পরিভ্রমণ করিতে উপদেশ দান করিয়াছিলেন। সেই উপদেশ-ক্রমে আমি রাজসাহী হইতে জন্মভূমি ঢাকা-নগরীতে আসিয়া, বিগত ২৯শে এপ্রিল [১৬ই বৈশাখ] তারিখে, কতিপয় বন্ধুসহ তথ্যানুসন্ধানে বহির্গত হই।) ঢাকা জেলার অন্তঃপাতী মুন্সিগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত পঞ্চসার-গ্রামনিবাসী শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও তদীয়ানুজ শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়দ্বয়ের নিকট শুনিতে পাই যে, সেই গ্রামনিবাসী "যদুনাথ বণিক্যের বাড়ীতে বহুবৎসর যাবৎ একখণ্ড তাম্র-শাসন যত্ন-সহকারে রক্ষিত

আবিষ্কার-কাহিনী।

হইতেছে,—এ পর্য্যন্ত কেহই তাহার পাঠোদ্ধার করিতে সমর্থ হন নাই"। (এই সন্ধান লাভ করিয়া, আমরা বণিক্য-বাড়ীতে গিয়া, বরেন্দ্রানুসন্ধান-সমিতির পক্ষ হইতে তাম্র-ফলকখানি ক্রয় করিয়া আনিয়াছি। যদুনাথের নিকট শুনিয়াছি যে, প্রায় ৭৫।৭৬ বৎসর পূর্ব্বে, ইতিহাস-প্রসিদ্ধ রামপাল-নামক স্থানে কোন এক মুসলমান মৃত্তিকাখনন করিবার সময় এই তাম্রপট্ট প্রাপ্ত হইয়া, যদুনাথের পিতা, স্বর্গীয় জগদ্বন্ধু বণিক্যকে প্রদান করিয়াছিল। জগদ্বন্ধু প্রায় ৪৫।৪৬ বৎসর ইহা নিজ-গৃহে সযত্নে রক্ষা করিয়া, পরলোক-প্রাপ্ত হইলে, তদীয় পুত্র যদুনাথ বিগত ৩০ বৎসর যাবৎ পিতৃদেবের উত্তরা-ধিকার-সূত্রে প্রাপ্ত এই তাম্র-শাসনখানি ভক্তি-ভাবে রক্ষা করিয়া আসি-তেছিল।) ইহা এখন বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতি কর্তৃক সযত্নে রক্ষিত হইতেছে।

বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতি আমার উপরে এই তাম্র-শাসনের পাঠোদ্ধারের ভার ন্যস্ত করায় মূল শাসন হইতে যেরূপভাবে পাঠোদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছি, তাহাই বিদ্বৎ-সমাজের গোচরার্থ প্রকাশিত হইল। (কাল-প্রভাবে তাম্র-ফলকের কোনও অনিষ্ট না হইয়া থাকিলেও স্থানে স্থানে পাঠোদ্ধারে অত্যন্ত ক্লেশ পাইতে হইয়াছে। তাহার কারণ এই যে, [প্রায় ৩।৪ বৎসর পূর্ব্বে অক্ষর-পাঠের সুবিধা হইবে মনে করিয়া,] যদুনাথ তাম্র-দ্রাব অর্থাৎ (Nitric acid) প্রয়োগপূর্ব্বক তাম্র-ফলকের উভয়পার্শ্ব সংঘর্ষণ করিয়া কোন কোন স্থানের অক্ষর-বিলোপের সহায়তা করিয়াছিল।)

পাঠোদ্ধার-কাহিনী।

পাঠোদ্ধার-সাধন করিয়া, আমাকে ব্যাখ্যা-কার্য্যেও হস্তক্ষেপ করিতে হইয়াছে। (এই শাসনে রাজ-বংশ-বিবৃতি-বিজ্ঞাপক আটটি শ্লোক আছে। ফরিদপুর জেলার অন্তঃপাতী ইদিলপুর-নিবাসী কোনও জমীদারের গৃহে অদ্যাপি একখানি তাম্র-শাসন অপঠিত অবস্থায় বর্ত্তমান আছে। স্বর্গীয়

গঙ্গামোহন লস্কর এম, এ, তাহার যে, সংক্ষিপ্ত বিবরণ রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা "ঢাকা-রিভিউ" পত্রিকায় [১৯১২ সালের অক্টোবর সংখ্যায়] শ্রীযুক্ত জে, টি, র‍্যাঙ্কিন সাহেব মহোদয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। লস্কর মহাশয়ের ক্ষুদ্র টীকাকার প্রবন্ধ-পাঠে জানা গিয়াছে যে, তিনি ইদিলপুরের তাম্র-শাসনখানির ছাপ-মাত্রই আনিতে পারিয়াছিলেন; মূল-ফলকখণ্ড সত্বাধিকারীর নিকট হইতে কোন প্রকারেই হস্ত-গত করিতে পারেন নাই।

ব্যাখ্যা-কাহিনী।

ইদিলপুরের-শাসনের প্রতিগ্রহীতা ও উৎসৃষ্ট ভূমি পৃথক্। এই উভয় শাসনের লিপি-পংক্তিও সম-সংখ্যক নহে। শ্লোকাবলী যদি উভয়ত্র একরূপ হয়, তাহা হইলে স্বর্গীয় গঙ্গামোহন ইদিলপুর-শাসনের শ্লোক-মর্ম্ম নিজ প্রবন্ধে যে ভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহা সর্ব্বাংশে শুদ্ধ হয় নাই। দানাদেশ-কারী রাজার নামোদ্ধারেও তাঁহার কিঞ্চিৎ প্রমাদ পরিলক্ষিত হইবে। তিনি "শ্রীচন্দ্রদেবকে" "চন্দ্র-দেব" বলিয়া লিখিয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমান তাম্র-শাসনে রাজার নাম "শ্রীচন্দ্র" বলিয়া তিনবার উল্লিখিত আছে,—এবং রাজার পিতা "ত্রৈলোক্যচন্দ্র" পিতামহ "সুবর্ণচন্দ্র" ও প্রপিতামহ "পূর্ণচন্দ্রের, নামকরণ-প্রণালীর আলোচনা করিলেই বুঝিতে পারা যায়,—রাজার নাম "চন্দ্রদেব" না হইয়া, অন্য কোনও শব্দ উপপদরূপে লইয়াই গঠিত হইয়া থাকিবে। এই তাম্রশাসনে যে সকল রাজপাদোপজীবির নামোল্লেখ আছে, তাহাদের অধিকাংশের নিয়োগ "ভোজবর্ম্ম-দেবের বেলাব-লিপি" * "বল্লাল সেনদেবের নবাবিষ্কৃত তাম্র-শাসন" † শীর্ষক প্রবন্ধ-দ্বয়ে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। বঙ্গরাজগণের প্রদত্ত তাম্র শাসনে উল্লিখিত অন্যান্য রাজকর্ম্মচারিগণের নামের সহিত তিনটি নূতন নামও পাওয়া গিয়াছে;—তন্মধ্যে "মণ্ডল-পতি" ও "সর্ব্বাধিকৃত" শব্দ-

* সাহিত্য—শ্রাবণ ও ভাদ্র সংখ্যা। ১৩১৯ বঙ্গাব্দ

† সাহিত্য—অগ্রহায়ণ সংখ্যা। ১৩১৮ সন

দ্বয় "মহামাণ্ডলিক ঈশ্বর ঘোষের" * এবং "হরিবর্ম্ম-দেবের তাম্রশাসনেও †
দেখিতে পাওয়া গিয়াছে, এবং "শৌল্কিল" শব্দটিও পাল-পৃথ্বীপালগণের
তাম্র-শাসনে পরিদৃষ্ট হইয়াছে। যে স্থানে ভূমি উৎসৃষ্ট হইয়াছে বলিয়া
তাম্র-শাসনে উল্লিখিত আছে, সেই স্থানটির কোন সন্ধান লাভ করিতে
পারি নাই ; এবং প্রতিগ্রহীতার কোনও বংশধর অদ্যাপি বিদ্যমান আছেন
কি না, তাহাও অবগত হইতে পারি নাই। ব্যাখ্যা-কার্য্যে যেখানে
অন্যান্য শাসনাদির সাহায্য লইয়াছি, তাহা যথাস্থানে উল্লিখিত হইয়াছে।

এই তাম্র-শাসনের আয়তন ৯½ × ৮ ইঞ্চ। ইহার শীর্ষদেশে [মধ্য-
স্থলে] একটি রাজ-মুদ্রা সংযুক্ত হয়। তন্মধ্যে "শ্রী-শ্রীচন্দ্র দেবঃ" এই নামটি
উৎকীর্ণ রহিয়াছে। রাজার নামের উপর বৌদ্ধ-মত-বিজ্ঞাপক "ধর্ম্ম-চক্র-
মুদ্রা" ; ধর্ম্মচক্রের উভয় পার্শ্বে সমাসীন দুইটি মৃগ-মূর্ত্তি। রাজার নামের
নিম্নভাগে, [মধ্যস্থলে] অর্দ্ধচন্দ্র-চিহ্ন ;—তাহার উভয়-পার্শ্বে ও নিম্নভাগে
ফুল-পাতার সাজ। এই রাজবংশ চন্দ্রবংশীয় ছিল বলিয়াই, রাজকীয় মুদ্রার
অর্দ্ধচন্দ্রমূর্ত্তির লাঞ্ছনসংযুক্ত হইয়া থাকিবে। বলা বাহুল্য, পাল-রাজগণের
তাম্র-শাসনেও উভয় পার্শ্বে মৃগ-মূর্ত্তি-লাঞ্ছিত এই প্রকার "ধর্ম্ম-চক্র-মুদ্রা"
সংযুক্ত আছে। এই তাম্র-শাসনে প্রথম পৃষ্ঠায় ২৮ পংক্তিতে এবং দ্বিতীয়
পৃষ্ঠায় ১২ পংক্তিতে পদ্য-গদ্য-ময় সংস্কৃত-ভাষা-রচিত

লিপি-পরিচয় :

দান-লিপি উৎকীর্ণ আছে। প্রথম পৃষ্ঠায় ১৩ পংক্তি
পর্য্যন্ত আটটি শ্লোকে রাজ-কবি নিজ প্রভুর বংশ-বর্ণনা করিয়াছেন ;—
তৎপর ৩৪ পংক্তি পর্য্যন্ত লিপির গদ্যাংশ, এবং সর্ব্বশেষে ধর্ম্মানুশংসী শ্লোক-
পঞ্চক।) তাম্র-শাসন-সম্পাদনসম্বন্ধে যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতায় যে শাস্ত্রীয়

---

* সাহিত্য—বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা। ১৩২০ বঙ্গাব্দ।

† "বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস"—দ্বিতীয় ভাগ, ২১৫ পৃষ্ঠা।

প্রমাণ উল্লিখিত আছে, তাহা হইতে জানা যায় যে,—রাজা [স্ব-হস্ত-কাল-সম্পন্নং শাসনং কারয়েৎ স্থিরম্"] তাম্র-শাসনে নিজ স্বাক্ষর ও সন-তারিখ সংযুক্ত করিবেন;—কিন্তু, এই তাম্র-শাসনে সন-তারিখ সন্নিবিষ্ট হয় নাই, এবং রাজার কিংবা তাঁহার কোন প্রধান কর্ম্মচারীর স্বাক্ষরও ইহাতে সংযুক্ত দেখা যায় না। লিপিকরের ও শিল্পীর নামোল্লেখের অভাবও পরিদৃষ্ট হইতেছে। (যে অক্ষরে এই তাম্র-শাসন উৎকীর্ণ হইয়াছে, তাহা দ্বাদশ-শতাব্দীর প্রথম ভাগের বঙ্গাক্ষর বলিয়া প্রতিভাত হয়। সুকৌশলে উৎকীর্ণ হইলেও, স্থানে স্থানে লিপিকরের বা শিল্পীর অসাবধানতায় কিছু কিছু ভ্রম-প্রমাদ সংঘটিত হইয়াছে। সেইগুলি যথাস্থানে প্রশস্তি-পাঠের পাদ-টীকায় প্রদর্শিত হইয়াছে।) [৪র্থ, ২১, ৩১, পংক্তি] কোন কোন স্থানে অবগ্রহ-চিহ্ন ব্যবহৃত হইয়াছে, কোন কোন স্থানে হয় নাই [১ম, ৭ম; ৩০শ পংক্তি] রেফ-সংযোগে য, হ প্রভৃতি কতিপয় বর্ণ ভিন্ন প্রায় অনেক ব্যঞ্জন-বর্ণেরই দ্বিত্ব সাধিত হইয়াছে। (এই তাম্র-শাসন রামপাল-নামক স্থানে আবিষ্কৃত হইয়াছিল বলিয়া, ইহা "রামপাল-লিপি" নামে অভিহিত হইল।)

বিক্রমপুরসমাবাসিত-জয়স্কন্ধাবার হইতে, ধর্ম্মচক্র-মুদ্রা-সংযুক্ত এই তাম্রশাসন সম্পাদিত করাইয়া চন্দ্রবংশীয় পরম-সৌগত, মহারাজাধিরাজ—শ্রীমত্ত্রৈলোক্যচন্দ্র দেব—পাদানুধ্যাত, পরমেশ্বর, পরম-ভট্টারক, মহারাজাধিরাজ শ্রীমান্ শ্রীচন্দ্রদেব [১৫—১৬ পংক্তি], মরকর গুপ্তের প্রপৌত্র, বরাহ গুপ্তের পৌত্র, সুমঙ্গল গুপ্তের পুত্র, শান্তি-বারিক পীতবাস গুপ্ত-শর্ম্মাকে, [ভগবান্ বুদ্ধ-ভট্টারককে উদ্দেশ করিয়া] মাতা পিতার ও নিজের পুণ্য ও যশোবৃদ্ধির নিমিত্ত [২৬—৩১ পংক্তি], সমস্ত রাজ-পাদোপজীবী ও অন্যান্য প্রজাবর্গকে বিজ্ঞাপিত করিয়া, যাবচ্চন্দ্রসূর্য্য ও ক্ষিতি-সমকাল

লিপি-বিবরণ। পর্য্যন্ত, যথাবিধি উদক-স্পর্শ-পূর্ব্বক, পৌণ্ড্র-ভুক্তির

অন্তঃপাতী নাঙ্গ-মণ্ডল-স্থিত নেহকাষ্ঠি গ্রামে পাটক-পরিমিত ভূমিদান করিয়াছিলেন।

এই নবাবিষ্কৃত তাম্র-শাসন হইতে আমরা কি কি ঐতিহাসিক তথ্য প্রাপ্ত হইতে পারি, তাহার কিঞ্চিৎ বিচার আবশ্যক। লিপি-প্রারম্ভে [প্রথম শ্লোকে] রাজ-কবি, বুদ্ধ-ধর্ম্ম-সংঘৎ—এই "ত্রিরত্নের"—উল্লেখ করিয়া, রাজবংশের বৌদ্ধমতানুরক্তির পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। বংশ-বিবৃতি-বিজ্ঞাপক দ্বিতীয় শ্লোকে উল্লিখিত হইয়াছে যে,—চন্দ্রবংশে পূর্ণচন্দ্র নামক কোন সুপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়া, পৃথিবীতে খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। চন্দ্রবংশে জন্ম বলিয়া এই অভিনব রাজবংশীয়গণ ক্ষত্রিয় ছিলেন,—এইরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। পূর্ণচন্দ্র কোনও স্থানের রাজা ছিলেন বলিয়া উল্লেখ নাই; তিনি একজন বীরমাত্র ছিলেন; ইহাই দ্বিতীয় শ্লোকের আভাস। তৃতীয় ও চতুর্থ শ্লোকে পূর্ণচন্দ্রের পুত্র সুবর্ণ-চন্দ্রের উৎপত্তি ও নামকরণকাহিনী সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে। পঞ্চম শ্লোকে কিছু ঐতিহাসিক তথ্যের সন্ধান প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে। সুবর্ণচন্দ্রের পুত্র অশেষ গুণ-বিভূষিত বলিয়া ত্রৈলোক্যে ত্রৈলোক্যচন্দ্রনামে বিদিত হইয়াছিলেন। তিনি "হরিকেল"—রাজলক্ষ্মীর আধার-রূপে চন্দ্র-দ্বীপে 'নৃপতি' হইয়াছিলেন। এই 'হরিকেল' শব্দটি বঙ্গ-দেশেরই নামান্তর। "বঙ্গাস্তু হরিকেলীয়াঃ" হেমচন্দ্রের এই বাক্যই ইহার প্রমাণ। বর্ত্তমান খুলনা, বাখরগঞ্জ ও ফরিদপুরের অংশ-বিশেষ লইয়াই সেকালের 'চন্দ্র-দ্বীপ' দক্ষিণে সাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই স্থানই আবার পরবর্ত্তীকালে [মোগল-সাম্রাজ্যে] বাকলা-চন্দ্রদ্বীপ নামেও কথিত হইয়াছিল। 'দিগ্বিজয়-প্রকাশ-বিবৃতি" নামক গ্রন্থে বাকলা-চন্দ্রদ্বীপের ভৌগোলিক বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। চন্দ্রদ্বীপের কুলীন কায়স্থ বলিয়া এক শ্রেণীর কায়স্থ এখনও কৌলীন্য-মর্য্যাদা লাভ করিতেছেন। ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্লোকে চন্দ্রদ্বীপাধিপতি

ত্রৈলোক্যচন্দ্রের শ্রীকাঞ্চনা-নাম্নী পত্নীর গর্ভে রাজযোগ-মুহূর্ত্তে শ্রীচন্দ্রের জন্ম-বৃত্তান্ত বিবৃত হইয়াছে। ত্রৈলোক্যচন্দ্রের ভার্য্যাকে রাজকবি 'প্রিয়া' মাত্র বলিয়াই নিরস্ত হইয়াছেন, 'মহিষী' বলেন নাই। এই কারণে এবং ত্রৈলোক্যচন্দ্রের 'নৃপতি' মাত্র উপাধি দর্শনে, মনে হয়,—তিনি কোন প্রবল-পরাক্রমশালী রাজাধিরাজের সামন্ত-শ্রেণীভুক্ত হইয়া, 'নৃপতি' উপাধি লইয়াই চন্দ্রদ্বীপ—শাসন করিতেছিলেন। তাঁহারা পুনঃ শ্রীচন্দ্র ভবিষ্যতে 'রাজা' হইবেন, ইহাই জ্যোতিষিকগণ তাঁহার জন্মসময়ে সূচিত করিয়াছিলেন। অষ্টম শ্লোকেও আমরা কিছু ঐতিহাসিক তথ্যের সন্ধান প্রাপ্ত হইতে পারি। এই শ্রীচন্দ্র সতত বিবুধ-মণ্ডল পরিবেষ্টিত থাকিয়া, এবং দেশকে একচ্ছত্রাধিপত্যে বিভূষিত করিয়া, অরাতি-কুলকে কারা-নিবদ্ধ করিয়া, আত্ম-যশে দিঙ্মণ্ডল সৌরভযুক্ত করিয়াছিলেন। বৌদ্ধ শ্রীচন্দ্র বিক্রমপুর-স্থিত রাজধানী হইতে ব্রাহ্মণকে ভূমিদান করিয়াছিলেন। সর্ব্ববর্ণের উন্নতিতেই দেশের উন্নতি,—সে কালের রাজগণ ইহা বুঝিতেন, নচেৎ বৌদ্ধ-নরপতি শ্রীচন্দ্র ব্রাহ্মণকে ভূমিদান করিবেন কেন? বিক্রম-পুরের শ্রীচন্দ্রের রাজধানী ছিল, ইহাতে তিনি বঙ্গপতি ছিলেন এই কথা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে! বিক্রমপুরে শ্রীচন্দ্রই মধ্যযুগের বৌদ্ধ-নরপতি বলিয়া প্রতিভাত। শ্রীচন্দ্রের পর তাঁহার বংশধর অন্য কেহ বঙ্গ-রাজ ছিলেন কি না তাহা বর্ত্তমান অবস্থায় [অন্য কোন প্রমাণ না থাকায়] নিঃসন্দেহে বলা যায় না।

এখন জিজ্ঞাস্য কোন্ সময়ে, কিরূপ ঘটনা-চক্রে, ত্রৈলোক্যচন্দ্র চন্দ্র-দ্বীপে 'নৃপতি' হইয়াছিলেন, কোন্ সময়ে কিরূপ ঘটনা-চক্রে তৎপুত্র শ্রীচন্দ্র বঙ্গে রাজ্য-স্থাপন করিয়া বিক্রমপুর হইতে শাসন-দণ্ড পরিচালনা করিয়া-ছিলেন, এবং কোন্ সময়ে, কিরূপ ঘটনা-চক্রেই বা এই অভিনব চন্দ্রবংশীয় বৌদ্ধনরপতির [বা নরপতিগণের ?] রাজ্য-পতন সংঘটিত হইয়াছিল ?—

এই সকল প্রশ্ন ঐতিহাসিক সমস্যার আধার। লিপি-কাল বিচার ও সমসাময়িক অন্যান্য ঘটনার সমালোচনা করিয়া এই সমস্যার যথাযোগ্য মীমাংসা করা যাইতে পারে না। অক্ষর-হিসাবে এই লিপির স্থান দ্বাদশ-শতাব্দীর প্রথমভাগে। এই শাসনের 'ত', 'ন' ও 'ম' বর্ম্মবংশীয় ভোজবর্ম্মদেবের বেলাব-লিপি ও হরিবর্ম্মদেবের মন্ত্রী ভট্ট-ভবদেবের প্রশস্তির 'ত', 'ন' ও 'ম' এর অনুরূপ। কিন্তু আলোচ্য শাসনে 'প' এবং 'ষ' কিছু বেশী আধুনিক। 'র' বিজয়সেনদেবের দেবপাড়া-লিপির অনুরূপ। বেলাব-লিপিতে ও ভট্ট-ভবদেবের ভুবনেশ্বর প্রশস্তিতে অবগ্রহ-চিহ্ন আদৌ ব্যবহৃত হয় নাই। কিন্তু শ্রীচন্দ্রের শাসনে কোন কোন স্থানে অবগ্রহ-চিহ্ন ব্যবহৃত হইয়াছে, কোন কোন স্থানে হয় নাই। এই সমস্ত কারণে এই লিপির কাল যেন বর্ম্মরাজগণের লিপিকালের অব্যবহিত পরে, এবং সেন-রাজগণের লিপিকালের অব্যবহিত পূর্ব্বে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে, অর্থাৎ সেনরাজ বিজয়সেনদেবের বিক্রমপুর অধিকারের পূর্ব্বে এবং বর্ম্মরাজ হরিবর্ম্মদেবের পুত্রের রাজ্যনাশের পরেই, কোনও সুযোগে চন্দ্রদ্বীপাধিপতি ত্রৈলোক্যচন্দ্রের পুত্র শ্রীচন্দ্র বিক্রমপুরে স্বাতন্ত্র্য অবলম্বনপূর্ব্বক কিছুকালের জন্য এক অভিনব বৌদ্ধরাজ্য সংস্থাপিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। বিক্রমপুরে যে সমস্ত বৌদ্ধমূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইতেছে তাহা মধ্যযুগের এই কালেরই পরিচয় প্রদান করে। গত বৎসর বেলাব-লিপির সাহায্যে আমরা বিক্রমপুরের বর্ম্মরাজগণের অভ্যুত্থানের কথা কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছি যে, ভোজবর্ম্মদেব এবং তৎপরবর্ত্তী বর্ম্মরাজগণ শেষ-পাল-রাজগণের সময়েই বিক্রমপুর হইতে বঙ্গে রাজ্য-শাসন করিতেন। এদিকে দ্বাদশ-শতাব্দীর প্রথম ভাগে রামপালদেবের তনুত্যাগের পর তৎপুত্র* কুমারপাল-দেব বরেন্দ্রভূমিতে [রামাবতী-নগর

* গৌড়-রাজমালা ৫১-৫৩ পৃষ্ঠা।

হইতে] রাজ্যশাসন করিতেছিলেন। কুমারপালদেবের সময় হইতেই পাল-সাম্রাজ্যের বন্ধন বিঘটিত হইয়া আসিতেছিল। কুমারপালদেবের প্রধান সহায় ছিলেন তাঁহার সচিব ও সেনাপতি বৈদ্যদেব। এই সময়ে রাজ্যে বিদ্রোহ উপস্থিত হইলে, বৈদ্যদেবই "অনুত্তর-বঙ্গে" অর্থাৎ দক্ষিণ বঙ্গে, নৌ-বল লইয়া বিদ্রোহ-দমনে সমর্থ হইয়াছিলেন, এই ঐতিহাসিক তথ্য আমরা তদীয় [কমৌলিতে প্রাপ্ত] † তাম্রশাসনে উল্লিখিত দেখিতে পাই। বৈদ্যদেবকর্তৃক এই দক্ষিণ বঙ্গের বিদ্রোহ-বহ্নি নির্ব্বাপিত হইলেই হয়ত পালরাজ সর্ব্বগুণ-বিমণ্ডিত বৌদ্ধ ত্রৈলোক্যচন্দ্রকে উপযুক্ত পাত্র মনে করিয়া, চন্দ্রদ্বীপের সামন্তরূপে নিযুক্ত করিয়া 'নৃপতি' উপাধিতে বিভূষিত করিয়া থাকিবেন। এই বিদ্রোহ সময়েই হয়ত চন্দ্রদ্বীপ বঙ্গ-রাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল; এবং এই সময় হইতেই হয়ত বর্ম্মরাজগণের দুর্দ্দিন উপস্থিত হইয়া থাকিবে। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, রাজকবি ত্রৈলোক্যচন্দ্রকে হরিকেল-(বঙ্গ) রাজলক্ষ্মীর আধার বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এই সময়েই ভট্ট-ভবদেব-মন্ত্র-নিয়ন্ত্রিত হরিবর্ম্মা বা তদাত্মজ [অজ্ঞাত-নামা রাজার] অধিকার হইতে বঙ্গ-রাজ্যের অন্তর্গত চন্দ্রদ্বীপ হস্তচ্যুত হইয়াছে। তৎপর বৈদ্যদেব যেমন ‡ কামরূপে তিগ্মদেবকে সিংহাসন-ভ্রষ্ট করিয়া স্বাতন্ত্র্যাবলম্বন করিয়াছিলেন, সেইরূপ বোধ হয়, পালরাজগণের ও বর্ম্মরাজগণের দুর্ব্বলাবস্থা অবলোকন করিয়া, ত্রৈলোক্য-চন্দ্র-পুত্র শ্রীচন্দ্রও বর্ম্মবংশীয় শেষ নরপতিকে কোন কারণে সিংহাসন-ভ্রষ্ট করিয়া, স্বয়ং 'পরমেশ্বর-ভট্টারক মহারাজাধিরাজ' উপাধি গ্রহণ করিয়া বঙ্গে সার্ব্বভৌম নরপতি সাজিয়া বসিয়াছিলেন। অথবা বর্ম্মরাজ্য অন্য কোনও কারণে উন্মূলিত হইলে, শ্রীচন্দ্রই বঙ্গে একচ্ছত্রাধিপত্য বিস্তৃত

† গৌড়-লেখমালা ১৩০ পৃষ্ঠা।
‡ গৌড়লেখমালা ১৩১ পৃষ্ঠা।

করিয়া ও শত্রুকুলকে কারানিবদ্ধ করিয়া, বিক্রমপুর হইতে শাসন পরিচালনা করিয়াছিলেন। আলোচ্য শাসনের অষ্টম শ্লোকে এইরূপ ঐতিহাসিক তথ্য ইঙ্গিতে সূচিত হইয়া থাকিবে। অপরদিকে এই সময়েই বিজয়সেন পাল-সাম্রাজ্যের দুরবস্থা ও দুর্ব্বলতা দেখিয়া, বরেন্দ্রীতে রাজ্য পাতিবার উপক্রম করিতেছিলেন; এবং পরে এই বিজয়সেন কর্ত্তৃকই হয়ত বৌদ্ধ-শ্রীচন্দ্রের সংস্থাপিত রাজ্যের বিনাশ সাধিত হইয়া থাকিবে। বিজয়সেন যে বিক্রমপুরের রাজধানী হইতে দানাদেশ করিয়াছিলেন, এই সংবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, মহাশয় এক প্রবন্ধে প্রকাশিত করিয়াছিলেন। লিপিখানি বিজয়সেনদেবের একত্রিংশদ্বর্ষীয় লিপি বলিয়া শুনিতে পাওয়া যাইতেছে।

সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে যে, যখন বরেন্দ্রীতে কুমার-পালদেব এবং বঙ্গে হরিবর্ম্মদেব ও তদীয় পুত্র সিংহাসনারূঢ় ছিলেন, এবং বিজয়সেন গৌড়ে রাজ্য-স্থাপনের সুযোগ অন্বেষণ করিতেছিলেন ও কুমার পালদেবের দক্ষিণ-বাহুরূপী প্রধান সচিব বৈদ্যদেব তিগ্মদেবকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া কামরূপে স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিয়াছিলেন, তখনই চন্দ্রদ্বীপ-নৃপতি ত্রৈলোক্যচন্দ্রের পুত্র শ্রীচন্দ্রও বর্ম্মরাজকে বিতাড়িত করিয়া অথবা অন্য কারণে বর্ম্মরাজের নাশ ঘটিলে পর, বঙ্গে স্বাতন্ত্র্যাবলম্বনপূর্ব্বক বিক্রমপুর-রাজধানী হইতে দেশ-শাসন করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। এই সিদ্ধান্ত সর্ব্বাংশসমর্থিত হইবে কি না তাহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে না। যতদিন অনুকূল ও প্রবল প্রমাণ না প্রাপ্ত হওয়া যাইবে, তত দিন এই ভাবের অনুমান-মূলক সিদ্ধান্ত প্রচারিত না করিয়া উপায় নাই। পরবর্ত্তী প্রমাণের বলে পূর্ব্ববর্ত্তী এইরূপ সিদ্ধান্ত-নিচয় পরিবর্ত্তিত হইতেছে ও হইবেই।

শ্রীরাধাগোবিন্দ বসাক।

---

৭ প্রবাসী শ্রাবণ সংখ্যা ১৩১৯ বঙ্গাব্দ।

বাণগড়

সে অনেক দিনের কথা। তখন আমার ১৮ বৎসর বয়স। আমি এই দিনাজপুর সহরেই বাস করিতাম। ঐতিহাসিক গবেষণার একটা প্রবল ইচ্ছা সেই সময় হইতেই আমার মনে জাগিয়াছিল। আমি তখন হইতেই প্রাচীনকালের ইতিহাস সম্বন্ধে আলোচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম। বাণগড়ের কথা এই সময় প্রথম আমার কর্ণগোচর হয়। তখন অনুসন্ধানে জানিতে পারিয়াছিলাম, দিনাজপুরের মাননীয় বর্ত্তমান শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজা বাহাদুরের পূর্ব্বপুরুষ রাজা রামনাথ রায় বাহাদুর একটি কন্যাদায়গ্রস্ত ব্রাহ্মণের নিকট, সর্ব্বপ্রথম, এই বাড়ীতে বহু অর্থ থাকা শুনিতে পাইয়াছিলেন এবং সেই অর্থ যে তাঁহার প্রাপ্য, তাহাও সেই ব্রাহ্মণ বলিয়াছিলেন। তাহার পরে তিনি বাণগড় খনন করাইয়াছিলেন। শুনিতে পাওয়া যায়, রাজা-বাহাদুর ঐ স্থানে অনেক অর্থ পাইয়াছিলেন— আর পাইয়াছিলেন কতকগুলি প্রস্তর। এখনও তাহা রাজবাড়ীতে আছে। প্রস্তরগুলি দেখিতে বড়ই ইচ্ছা হইল। রাজবাড়ীতে গিয়া দেখিলাম। দুইটি প্রস্তরের কথা আজ পর্য্যন্ত ভুলিতে পারি নাই। একটি রাজবাড়ীর অভ্যন্তরস্থিত একটি দ্বারে সংলগ্ন চৌকাট। "চৌকাট" শুনিয়া কেহ মনে করিবেন না যে, ইহা কাষ্ঠনির্ম্মিত। চৌকাটটি প্রস্তরনির্ম্মিত। অন্য নাম না পাইয়া, "কাঁটালের আমসত্বের" ন্যায়, চৌকাট শব্দই ব্যবহার করিলাম। এরূপ কারুকার্য্যময় প্রস্তরের চৌকাট আমি আর দেখি নাই। তার পর গোটা বত্রিশটি বৎসর জলের মত এই জীবনের উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে, এ পর্য্যন্ত ঐরূপ শিল্প-নৈপুণ্যের পরিচয় আর পাই নাই। সুতরাং উহাকে শিল্প-নৈপুণ্যের পরাকাষ্ঠা বলিতে পারি।

আমি দক্ষিণ-বরেন্দ্রবাসী। আমার বাসস্থান হইতে উত্তর বরেন্দ্রস্থিত বাণগড় বহুদূরে অবস্থিত হইলেও আমি আমার দেশের জিনিষ বলিয়া দাবী করিতে পারি। এমন শিল্পীও একদিন বরেন্দ্র দেশে ছিল, যাহার তুলনা পৃথিবীর কোথায়ও মিলে না। এ কথা মনে হইলে, এই শুষ্ক রক্ত-বর্ণ মৃত্তিকাবিশিষ্ট অহল্যাদেবীর কনিষ্ঠাভগিনী বরেন্দ্রে বাস করিয়াও মন আনন্দরসে আপ্লুত হয়। জীবন চিরস্থায়ী নহে, কিন্তু কীর্ত্তি চিরস্থায়ী না হইলেও বহুদিন-বহুযুগ স্থায়ী। তাই ৯৫০ বৎসর পূর্ব্বের এই কীর্ত্তি আজিও নয়ন ভরিয়া দেখিতে পাইতেছি। আমি কালের অনন্ত ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিলেও আমার কত অধস্তন পুরুষ ইহা দেখিতে পাইবে।

দ্বিতীয়টি বাগানে রক্ষিত "প্রস্তরস্তম্ভ"। তাহাতে দেবনাগরাক্ষরে খোদিত একটি লিপি দেখিয়াছিলাম, কিন্তু তখন পড়িতে পারিয়াছিলাম না। শুনিয়াছিলাম—ম্যাজিষ্ট্রেট ওয়েষ্টমেকট সাহেব ইহার পাঠোদ্ধার করিয়াছেন। সে পাঠ আমি তখন পাই নাই, পাইবার চেষ্টাও করি নাই। তখন এই পর্য্যন্ত জানিতে পারিয়াছিলাম যে, "বাণ নামক অসুর রাজা এই গড় নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এখানেই শ্রীকৃষ্ণের পৌত্রের সহিত বাণরাজ কন্যা উষার বিবাহ হইয়াছিল। স্তম্ভটিতে যে লিপি লিখিত আছে তাহার অর্থ এই—

"আনন্দে বিদ্যাধরগণ স্বর্গলোকে যাঁহার দুর্দ্দমনীয় শত্রুসৈন্য দমনে দক্ষতা এবং দানকালে যাচকের গুণগ্রাহীতার বিষয় গান করিতেছেন, কাম্বোজান্বয়জ সেই গৌড়পতি কুঞ্জর-ঘটা (৮৮৮) বর্ষে ইন্দু মৌলির (শিবের) এই পৃথিবীর ভূষণ মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন১।"

এই বাণগড়ের বিষয় আলোচনা করিতে বসিয়া বাণরাজার যে ইতি-হাস পাইয়াছি, অদ্য তাহাই আপনাদিগকে শুনাইব।

১) গৌড়রাজমালা ৩৫ পৃষ্ঠা।

(১) রাজসাহী সহরের পশ্চিমে দক্ষিণবরেন্দ্রের অন্তর্গত খেতুরের নিকট দেওপাড়া গ্রামে প্রদ্যুম্নেশ্বরের মন্দিরের চিহ্ন ও পদুম সহর নামক একটি দীঘি আছে। বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির মতে ইহা সেনবংশীয় রাজা বিজয়সেনের কীর্ত্তি। প্রদ্যুম্নেশ্বরমন্দিরে যে প্রস্তরলিপি সংলগ্ন ছিল, তাহা হইতেও জানা যায়, সেই মন্দির বিজয়সেন কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছে।

অনুসন্ধান-সমিতির বহুপূর্ব্বে লিখিত প্রাচীন বারেন্দ্রকুল-পঞ্জিকায় লিখিত আছে, "বরিন্দা নামক স্থানে (রাজসাহীর পশ্চিমে) প্রদ্যুম্ন নামক ব্যক্তির নামানুসারে প্রদ্যুম্নেশ্বর নামধেয় হরিহরমূর্ত্তি স্থাপিত ও বরেন্দ্রশূর কর্ত্তৃক তদীয় শাসিত দেশ বরেন্দ্র আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে।" ২

বারেন্দ্র-কুল-পঞ্জিকায় শূরবংশীয় তিনজন রাজার নাম পাওয়া যায়—ধরাশূরের পুত্র প্রদ্যুম্নশূর ও বরেন্দ্রশূর এবং প্রদ্যুম্নশূরের পুত্র অনুশূর। রাঢ়ীয় কুলপঞ্জিকায় ধরাশূর ও তৎপুত্র রণশূরের নাম আছে, ইঁহাদের নাম নাই। ইহাতে বুঝা যায় যে, ইহারা কেবল বরেন্দ্রেই রাজত্ব করিয়াছেন, রাঢ় দেশের সহিত ইঁহাদের কোন সম্পর্ক ছিল না। আজকাল কুলপঞ্জিকার প্রমাণ গ্রাহ্যযোগ্য নহে বলিয়া অনেকেই মত প্রকাশ করিয়াছেন, তজ্জন্য আমরা কুলপঞ্জিকার প্রমাণ গ্রহণ না করিয়া আলোচনা করিব।

(২) দেওপাড়ার পদুমসহর দীঘির প্রকৃত নাম প্রদ্যুম্নসরঃ বা প্রদ্যুম্ন সরোবর। কালে অশিক্ষিত লোকের মুখে "পদুমসহর" হইয়া গিয়াছে। প্রদ্যুম্নেশ্বর বিগ্রহ স্থাপন ও প্রদ্যুম্ন সরোবর খনন একজনেরই কীর্ত্তি, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই দুই কীর্ত্তি বিজয়সেন অপেক্ষা প্রদ্যুম্ন নামক কোন ব্যক্তির স্থাপিত বলিয়া ধরিলে নিতান্ত অসঙ্গত হয় না।

(২) বিশ্বকোষ "বারেন্দ্র শব্দ"।

বিজয় সেনের স্থাপিত হইলে "বিজয়েশ্বর" বা "হরিহর" নাম হইত, দীঘির নাম বিজয় সরোবর হইত। অনুসন্ধান সমিতির মতে এই দেওপাড়া হইতে ৭ মাইল দূরে বিজয়নগর নামক স্থানে বিজয়সেনের রাজধানী ছিল। সুতরাং স্বীয় রাজধানীতে এই প্রকাণ্ড মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া বিগ্রহ স্থাপন ও দীর্ঘিকা খনন না করিয়া ৭ মাইল দূরে বিজয় সেন এই কীর্ত্তি কেন স্থাপন করিয়াছিলেন তাহা ভাবিয়া দেখিলে স্পষ্টই বুঝা যায়, ইহা তাঁহার নিজ কীর্ত্তি নহে। প্রদ্যুম্নেশ্বর মূর্ত্তি অপর কর্ত্তৃক এই স্থানে যে মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহা বিজয়সেনের সময় ভগ্ন বা জীর্ণ হইয়াছিল, বিজয়সেন সুবৃহৎ প্রস্তরমন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া তন্মধ্যে ঐ মূর্ত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন। অতএব প্রদ্যুম্ন নামক ব্যক্তির অস্তিত্ব যদি এই চিহ্নদ্বারা ধরা যায় তবে তাহা নিশ্চয়ই বিজ্ঞানবিরুদ্ধ হইবে না।

এক্ষণে বারেন্দ্র-কুলপঞ্জিকানুসারে আমরা এই প্রদ্যুম্নকে প্রদ্যুম্নশূর বলিয়া ধরিতে পারি। ইনিই বরেন্দ্রদেশে রাজত্ব স্থাপন করিয়াছিলেন। ইঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতার নাম বরেন্দ্রশূর এবং পুত্রের নাম অনুশূর।

তিব্বতদেশীয় পর্য্যটক লামা তারানাথের (ইনি বাঙ্গালী) ইতিহাস এক্ষণে বিজ্ঞানসম্মত প্রমাণ স্বরূপে গ্রাহ্য হইয়াছে। ইহাতে ১৮ জন পাল-রাজার নাম আছে, তন্মধ্যে বাণপাল একজন। আইন আকবরীতে ১০ জন পালরাজার নাম আছে, তাহাতে বাণপাল নাম নাই। তাম্রশাসনে আমরা ১৮ জন রাজার নাম পাইয়াছি, তন্মধ্যে "বাণপাল" নাম নাই। তারানাথের মতে বাণপাল পুনর্ভবানদী তীরে দেবকোটে রাজত্ব করিতেন। সুতরাং এই বাণপালই বাণগড়নির্ম্মাতা কাম্বোজান্বয়জ গৌড়পতি তাহাতে সন্দেহ নাই। অসুরগণ শিবের ভক্ত। বাণপালও শিবের ভক্ত ছিলেন, তাই তাঁহার নাম বাণাশূর বলে। ৮৮৮ শক বা ৯৬৬ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে তিনি বঙ্গদেশ জয় করিয়াছিলেন।

পুরাণে লিখিত আছে—"শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র, প্রদ্যুম্নের পুত্র অনিরুদ্ধকে স্বপ্নে দেখিয়া বাণরাজকন্যা উষা তৎপ্রতি আসক্ত হইয়াছিলেন। সখী চিত্রলেখা অনেক সুন্দর পুরুষের চিত্র অঙ্কিত করিয়া দেখাইল। তন্মধ্যে অনিরুদ্ধের চিত্র দেখিয়া উষা তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন। চিত্রলেখা যেরূপেই হউক, গোপনে অনিরুদ্ধকে আনিয়া দিলেন। অনিরুদ্ধ উষার সঙ্গে অন্তঃপুরে গোপনে বাস করিতেছে শুনিয়া বাণরাজা তাঁহাকে কারা-বদ্ধ করিলেন। কৃষ্ণ, বলরাম, প্রদ্যুম্ন প্রভৃতি বাণপুরীতে আসিয়া তাঁহার সহিত যুদ্ধকরতঃ অনিরুদ্ধকে উদ্ধার করিলেন। উষার সহিত তাঁহার বিবাহ হইল।"

লোকে এই বাণগড়কেই সেই বাণরাজার পুরী বলে। কেহ কেহ আসামের অন্তর্গত তেজপুরকেও বাণপুরী বলেন। বরেন্দ্রদেশের এই বাণগড় যে সে বাণপুরী নহে, তাহা নিশ্চয়।

রাজেন্দ্র চোলের শিলালিপিতে রণশূরের নাম আছে। ১০২০ খৃষ্টাব্দে রাজেন্দ্র চোলের নিকট রণশূর পরাজিত হইয়াছিলেন। সুতরাং ১০২০—৬৬=৫৪ বৎসর পূর্ব্বে যে রণশূরের পিতা বা রণশূর রাজত্ব করিতেন তাহাতে সন্দেহ নাই। সুতরাং রণশূরের ভ্রাতা প্রদ্যুম্নশূর যে সে সময় ছিলেন এবং তিনি যে বাণরাজার সমসাময়িক তাহাতেও সন্দেহ হইতে পারে না।

প্রদ্যুম্নশূরের পুত্র অনুশূরের প্রকৃত নাম অনিরুদ্ধশূর। প্রদ্যুম্নশূর, অনিরুদ্ধশূর এবং বাণরাজার নাম একসঙ্গে এক সময়ে দেখিয়া স্পষ্টই বুঝা যায় যে, এই সময় উষাহরণ পালার পুনরভিনয় উত্তরবরেন্দ্রে হইয়াছিল। অনিরুদ্ধ হয়ত উষার সৌন্দর্য্য-বৃত্তান্ত লোকমুখে শুনিয়া বাণরাজপুরীতে আসিয়াছিলেন। উষা তাঁহাকে দেখিয়া সখির সাহায্যে অন্তঃপুরে লইয়া গিয়া গোপনে রাখিয়াছিলেন। উষার পিতা বাণ এই ঘটনা অবগত

হইয়া অনিরুদ্ধকে কারাবদ্ধ করেন। প্রদ্যুম্নশূর এই সংবাদ পাইয়া সৈন্য-সামন্তসহ পুত্রকে উদ্ধারার্থ বরেন্দ্রদেশে আগমন করেন। প্রদ্যুম্নশূরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা এই যুদ্ধে সেনাপতি ছিলেন। তাঁহার বাহুবলে বাণরাজা পরাজিত হইয়াছিলেন এবং উষার সহিত অনিরুদ্ধের বিবাহ হইয়াছিল। প্রদ্যুম্নশূর যুদ্ধের পরে জ্যেষ্ঠভ্রাতার অস্তিত্ব হেতু দেশে না গিয়া দক্ষিণ-বরেন্দ্র অধিকারকরতঃ তথায় রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। প্রদ্যুম্ন-শূরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা এই উপলক্ষে বরেন্দ্রশূর নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

শ্রীবিনোদবিহারী রায়।

দিনাজপুরের কতিপয় ঐতিহাসিক স্থানের বিবরণ।

বর্ত্তমান জেলা দিনাজপুর পুরাকালের অপেক্ষা এখন অনেক খর্ব্বাকৃতি হইয়াছে। ইংরেজ-শাসনের প্রথমাবস্থায় ও মোসলমান রাজত্বের সময় সমগ্র আধুনিক মালদহ জেলা এই দিনাজপুরের সামিল ছিল। পালরাজ-গণের উন্নতির চরম সীমার সময় দিনাজপুরের আয়তন কত বৃহৎ ছিল তাহা জানিবার কোনও উপায় নাই। সেনরাজগণের তাম্রশাসনে যে পৌণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তির উল্লেখ পাওয়া যায় তাহার সীমা সমগ্র রাজসাহী বিভাগ ও ঢাকা জেলার কতকাংশ ইহার অন্তর্গত ছিল বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। পালরাজগণের রাজধানী কোথায় ছিল, তাহার বা কি নাম ছিল, সে কথার উত্তর আজ পর্য্যন্ত ইতিহাস দিতে সমর্থ হন নাই। সেন-

রাজগণ যে গৌড়ে প্রথম রাজধানী স্থাপন করিয়া কীর্ত্তিকলাপে সমগ্র আর্য্যসমাজে গৌড়ের নাম ও গৌরব প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, ঐতিহাসিক-গণ একথা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেন। রাজা আদিশূর এই ভূমিতে রাজত্ব করিয়া বৌদ্ধপ্লাবিত হিন্দুধর্ম্ম রক্ষা করিবার জন্য পাঁচজন বেদপারগ ব্রাহ্মণ ও পাঁচজন কায়স্থ কান্যকুব্জ হইতে আনয়ন করিয়াছিলেন বলিয়া এতদ্দেশীয় ব্রাহ্মণকায়স্থগণের কুলপঞ্জিকায় লিখিত আছে এবং ব্রাহ্মণ-গণের মুখে মুখে আবহমানকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। ব্রাহ্মণগণ "গৌড়ে" আগমন করিয়াছিলেন। তাঁহারা সুরসরিৎবিধৌত মনোজ্ঞ গৌড়ে আসিয়াছিলেন বলিয়া কুলপঞ্জিকাকারগণ লিখিয়া গিয়াছেন। এই গৌড় একটি দেশ বা নগর, সে কথা কেহই বলেন নাই। বৃহৎ সংহিতা-কার জ্যোতিষ কার্য্যসৌকর্য্যার্থে ভারতবর্ষকে যে কয়েকটি ভাগে বা দেশে বিভক্ত করিয়াছেন, তাহার মধ্যে "গৌড়" একটি। তিনি "গৌড়" অর্থে একজাতীয় লোক ধরিয়া তাহাদের অধ্যুসিত দেশের নাম গৌড় বলিয়াছেন। পালরাজগণ আপনাদিগকে "গৌড়েশ্বর" বলিয়া অভিহিত করিতেন। পরবর্ত্তী সেনরাজগণের উপাধিও কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তনের সহিত গৌড়েশ্বরই ছিল। অধ্যাপক ব্লকৃম্যান সাহেবের মত মোসলমানেরা লক্ষ্মৌতি নামে যে প্রদেশ অধিকার করেন তাহাই বৃহৎসংহিতার "গৌড়"। কুলপঞ্জিকাকারগণ "বসুকর্ম্মাঙ্গিকে শকে গৌড়ে বিপ্রাঃ সমাগতাঃ" বলিয়া বঙ্গে ব্রাহ্মণাগমনের কাল নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাহা হইলে ধরিতে হইবে ৬৬৮ শকে অর্থাৎ ৭৪৬ খৃষ্টাব্দে রাজা আদিশূর গৌড়ে রাজত্ব করিতেছিলেন। পালবংশের প্রতিষ্ঠাতা ভূপাল বা গোপাল সমগ্র প্রজাশক্তির দ্বারা মনোনীত হইয়া রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র ধর্ম্মপালের সময় হইতে পালরাজশক্তি দিগ্বিজয়াদি করিয়া রাজ্য বৃদ্ধি করিতে আরম্ভ করে। রাজা ধর্ম্মপাল ধর্ম্মযুদ্ধে বিধর্ম্মীর হস্তে

নিহত হন বলিয়া তাম্রশাসনে জানা যায়। কুলপঞ্জিকাকারগণ আদিশূর কি ভাবে রাজা হন, তাহার আভাসও ব্রাহ্মণ-আগমনের সঙ্গে সঙ্গে এই ভাবে দিয়াছেন।—

তত্রাদিশূরং শূরবংশসিংহঃ বিজিত্বা বৌদ্ধং নৃপালবংশং।
সশাস গৌড়ং দিতিজান্ বিজিত যথা ইন্দ্রস্ত্রিদিবান্ সশাস॥

ইহা হইতে বোধ বা অনুমান হয় যে, আদিশূর বৌদ্ধরাজা ধর্ম্মপালকে পরাজয় করিয়া গৌড়ে শূরবংশের সিংহাসন স্থাপন করিয়াছিলেন। আজও লোকে গঙ্গারামপুর থানার নিকটে একটি বৃহৎ জঙ্গল দেখাইয়া বলিয়া থাকে এখানে আদিশূরের বাড়ী ছিল। মালদহ জেলার মধ্যেও এই প্রকার জনপ্রবাদে আর একটি স্থানও পাওয়া যায়। আদিশূরের কোনও তাম্রশাসন পাওয়া যায় নাই। কোনও সমসাময়িক কবিও তাঁহার কাব্যে আদিশূরের কোনও কথা লিখিয়া যান নাই ইত্যাদি বৈজ্ঞানিকভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া ঐতিহাসিকগণ আদিশূরের অস্তিত্ব উড়াইয়া দিয়া ঠাকুর মার রূপকথা বলিয়া প্রমাণ করিতেছেন। আমরা কুলপঞ্জিকা অনুসন্ধান করিয়া আরও দেখিয়াছি, আদিশূর আনীত পঞ্চব্রাহ্মণের মধ্যে ভট্ট-নারায়ণের পুত্র "আদিগাঁঞি ওঝা রাজা ধর্ম্মপালের নিকট হইতে ধামসার" গ্রাম শাসন প্রাপ্ত হন। সেইজন্য ব্রাহ্মণগণ তাঁহাকে আদিগাঁঞি বলিয়া অভিহিত করেন। তাঁহার পূর্ব্বে কোনও ব্রাহ্মণ আর শাসন গ্রহণ করিয়াছিলেন না। আদিশূর ও ধর্ম্মপাল সমসাময়িক রাজা ছিলেন। আজ পর্য্যন্ত ঐতিহাসিকগণ পালরাজগণের সময় একবাক্যে স্থির করিতে পারেন নাই। তবে সকলেই বলেন রাজা ধর্ম্মপাল ৭১৫—৭৪৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে রাজত্ব করিতেছিলেন। ঐতিহাসিকগণের এই সময়ের সহিত কুল-পঞ্জিকারগণের কোনও বিরোধ দেখা যায় না। প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় কায়স্থ-পত্রিকায় নানা যুক্তি ও প্রমাণ দ্বারা

পৌণ্ড্রবর্দ্ধনরাজ জয়ন্তকেই আদিশূর বলিয়া স্থির করিয়াছেন। কোনও কোনও ঐতিহাসিক, চৈনিক ভ্রমণকারী হৌয়েন্‌ৎসং তাঁহার উত্তরবঙ্গ-ভ্রমণবৃত্তান্তে রাজমহল বা কঙ্কজল হইতে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন পর্য্যন্ত ভূভাগে কোনও রাজার নাম না করায়, অনুমান করেন যে, এ প্রদেশে সে সময়ে কোনও রাজা ছিল না। কামরূপরাজকুমার ভাস্করবর্ম্মা একমাত্র রাজা ছিলেন। কুলপঞ্জিকায় সপ্তজন শূররাজের নাম পাওয়া যায়। এই বংশের শেষ রাজা রণশূর রাজা রাজেন্দ্রচোলের তিরুমলয়গিরিলিপি হইতে জানা যায় রাঢ়-দেশের রাজা রণশূরকে তিনি পরাজয় করেন। ঐতিহাসিকগণ রাজেন্দ্র চোলের এই বঙ্গদেশ আক্রমণকাল ১০১২-১৩ খৃষ্টাব্দ স্থির করিয়াছেন। দাক্ষিণাত্য হইতে এই সময় সেনরাজগণের আদিপুরুষ বীরসেন বঙ্গে আগমন করিয়া উত্তরবঙ্গে আপনার আধিপত্য স্থাপন করিয়া সেনরাজ-গণের রাজত্বের সূচনা করেন। শূররাজগণ এই সময় হইতে আপনাদের আধিপত্য হইতে বিচ্যুত হইয়াছিলেন। উদীয়মান পাল ও সেনরাজশক্তির নিকট পরাজিত হইয়া শূররাজগণ রাজলক্ষ্মীভ্রষ্ট হইয়া ঝাড়খণ্ডের জঙ্গলে বিলয়প্রাপ্ত হইয়াছেন।

দিনাজপুরের প্রাচীন কীর্ত্তি অনেক আছে। তন্মধ্যে বাণনগর পৌরাণিক স্মৃতিবিজড়িত। প্রবাদ এই যে, এখানে বাণরাজার বাড়ী ছিল। কেহ কেহ এই কথার প্রতিবাদ করিয়া বলিয়া থাকেন, বাণরাজার বাড়ী "শোণিতপুরে" ছিল। শোণিতপুর আধুনিক তেজপুরের নাম। তেজ-পুর আসাম প্রদেশে। উষা অনিরুদ্ধের নাম হিন্দুর নিকট পরিচিত। উষাদেবী বাণরাজার কন্যা। অনিরুদ্ধ শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র। বাণরাজার অমতে উষাদেবী অনিরুদ্ধকে বিবাহ করেন। উষাদেবীর গৃহে অনিরুদ্ধকে পাইয়া বাণরাজা বন্দী করেন। দেবর্ষি নারদ এই সংবাদ দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণকে দেন। শ্রীকৃষ্ণ উষা ও অনিরুদ্ধকে দ্বারকায় পাঠাইয়া দেওয়ায়

জন্য অনুরোধ করেন। বাণাসুর সে কথায় কর্ণপাত করে না। ফলে উভয়পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ বাধিয়া যায়। বাণরাজা শৈব ছিলেন। তাঁহার সাহায্যকল্পে সদাশিব স্বয়ং সমরে অবতীর্ণ হন। মহাদেব "শিব-জ্বরের" সৃষ্টি করিয়া কৃষ্ণ সৈন্যের মধ্যে মহামারী উপস্থিত করেন। শ্রীকৃষ্ণও কালাজ্বরের সৃষ্টি করিয়া শিবরক্ষিত বাণসৈন্যের ধ্বংস সাধন করিতে প্রবৃত্ত হন। এই ভাবে যুদ্ধ চলিয়া বাণ রাজার পরাজয় হয়। শ্রীকৃষ্ণ উষা ও অনিরুদ্ধকে লইয়া স্বদেশে প্রস্থান করেন। ইহাই ত্রেতাযুগের বিষ্ণু-পুরাণের কাহিনী। ইহার মধ্যে আমরা কালাজ্বরের উৎপত্তি কথা পাই-তেছি। এই জ্বর এক সময়ে সমগ্র উত্তরবঙ্গের ধ্বংস সাধন করিয়া এখন আসামে সংহার মূর্ত্তি ধরিয়া বিরাজমান আছে।

যে গ্রামে বাণনগর বা গড় অবস্থিত, তাহা রাজীবপুর মৌজার অন্ত-র্গত। দিনাজপুর হইতে গঙ্গারামপুর থানাভিমুখে একটি রাস্তা গিয়াছে। এই রাস্তা ধরিয়া ১৫ মাইল দক্ষিণ দিকে যাইলে "বাণরাজার বাড়ী" পাওয়া যায়। শিবখাড়ী নামে একটি ক্ষুদ্র নালা এখান হইতে পুনর্ভবা নদীর সহিত মিলিত আছে। প্রাকৃতিক দৃশ্যের বিচার করিলে এই নালাটিকে পুনর্ভবা নদীর পুরাতন খাদ বলিয়া বিশ্বাস হয়। এই নালার উপর কাষ্ঠ-নির্ম্মিত সেতু আছে। এই কাষ্ঠ-সেতুর বাম পার্শ্বে একটি মন্দির দেখিতে পাওয়া যায়। মন্দিরটি বিরূপাক্ষশিবের নামে অভিহিত। জনশ্রুতিতে জানিতে পারা যায় যে, রাজা রামনাথ এই মন্দির প্রতিষ্ঠিত করিয়া এখানে শিবস্থাপন করেন। মন্দিরে এখন আর শিবলিঙ্গ নাই। কেবলমাত্র গৌরীপাঠ থাকায় বুঝিতে পারা যায়, লিঙ্গের উপরিভাগ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। কি প্রকারে এই লিঙ্গটি ভাঙ্গিয়া গেল তাহা কেহ বলিতে পারে না। এই মন্দিরের সেবাকার্য্যের জন্য দিনাজপুররাজ তিন শত টাকা বার্ষিক আয়ের নিষ্কর ভূমি দান করিয়াছেন। এখানে বুকানন (Buchanann) প্রস্তর-

নির্ম্মিত বৃষাদি পাইয়া দিনাজপুরে প্রেরণ করেন। তাহা অদ্যাবধি রঙ্গপুর কালেক্টরীর প্রাঙ্গণে অনাদৃতাবস্থায় পড়িয়া আছে। এই মন্দিরের পশ্চাতে কিছু দূরে মোসলমানদিগের একটি দরগা আছে ঃ দরগার চিহ্নমাত্র এখন কেবল দেখিতে পাওয়া যায়। এই দরগার কিছু পশ্চাতে সুলশাহের দরগা। এই দারগার দক্ষিণে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুইটি পুকুর আছে। নাম "অমৃতকুণ্ড" ও "মরণ-কুণ্ড"। এই সমস্ত দেখিয়া অনুমান হয় এখানে হিন্দু দেব-দেবীর মন্দির ছিল। মোসলমান বিজয়ের পর হিন্দু-মন্দির ভগ্ন হইয়া তাহার স্থানে মোসলমান দরগা বা মস্‌জেদ নির্ম্মাণ হইয়াছিল। ধর্ম্মপ্রাণ দিনাজপুররাজ বহু শতাব্দীর পর আবার স্বধর্ম্মের উন্নতিকল্পে এই স্থানে বিরূপাক্ষের মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিয়া অতীত গৌরবের স্মৃতি রক্ষা করিয়াছেন।

একটি বড় পুকুরের ধারে বহুস্থান ব্যাপিয়া একটি জঙ্গলাকীর্ণ স্তূপ আছে এই স্তূপ বহু অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষ বলিয়া বোধ হয়। লোকে এই বিশাল অরণ্যানীসঙ্কুল স্তূপ দেখাইয়া বলিয়া থাকে এইখানে বাণরাজার বাড়ী ছিল। ইহার চতুর্দ্দিকে আজও পরিখা-চিহ্ন বিদ্যমান আছে। উত্তর-দিকে যে পরিখা বা গড়খাই আছে তাহাতে এখনও জল থাকে। পুনর্ভবা নদীর পূর্ব্বতীরে এই রাজবাড়ী অবস্থিত। নদীর পশ্চিমতীরে রাজবাড়ী তুল্য উচ্চ অপর একটি স্তূপ আছে। লোকে এই ধ্বংসাবশিষ্ট মৃত্তিকাবৃত ইষ্টকরাশি দেখাইয়া বলিয়া থাকে, ইহাই উষাদেবীর বাড়ী। উষা দেবীর বাড়ীর কিছু দূরে নারায়ণপুর গ্রাম। এই গ্রামেও আর একটি ধ্বংসাবশিষ্ট বাড়ীর চিহ্ন আছে। এই বাড়ীর চারিদিকের দেওয়াল আজও দাঁড়াইয়া থাকিয়া অতীতের সাক্ষ্য দিতেছে। ইষ্টারণ ইণ্ডিয়া নামক গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগে বুকানন বলিয়াছেন যে, এই দালানের গঠন-প্রণালী সুলতান গিয়াস-উদ্দীনের কবরের মত। ইহার প্রস্তর আদি বাণ নগরের ধ্বংসাবশেষ

হইতে আনীত বলিয়া অনুমান হয়। এই বাড়ীর নিকটেই পীর বাহাউদ্দীনের আস্তানা। পীরের আস্তানার ছাদ নাই। পীর সাহেবের "আস্তানা" নারায়ণপুরের অট্টালিকার মাল-মসল্লা দিয়া প্রস্তুত হইয়াছিল।

বাণ নগরের গড়ের মধ্যে বহুকাল হইল একখানি তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে। তাম্রশাসনখানি অনেক দিন পর্য্যন্ত একজন জমিদারের নিকট ছিল। শিক্ষা বিভাগের ৺গিরিধারী বসু মহাশয় ইহার একটি ছাপ লইয়া আসিয়াটিক সোসাইটীতে পাঠাইয়া দেন। আসিয়াটিক সোসাইটীর পত্রিকায় তাহা প্রকাশিত হইয়াছিল। তাম্রশাসনখানিতে বিগ্রহপালের পুত্র প্রথম মহীপাল দেব গঙ্গাস্নান করিয়া ব্রাহ্মণকে ভূমি দান করিয়াছেন। এই তাম্রশাসনখানিতে বিলাসপুর জয়স্কন্ধাবার হইতে পৌণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তির অন্তঃপাতী ভূমি দান করা হইয়াছে।

বাণ রাজার গড় হইতে দিনাজপুর রাজবাড়ীতে একটি পাথরের স্তম্ভ লইয়া যাওয়া হইয়াছে। রাজবাড়ীর বহিরঙ্গনের বাগানের মধ্যে স্তম্ভটি প্রোথিত আছে। স্তম্ভটির গাত্রে খোদিত লিপি আছে। কাম্বোজবংশীয় কোন নরপতি শিব-মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া স্তম্ভগাত্রে সেই কথা লিখিয়া রাখিয়াছেন। এই নরপতি আপনার নাম গোপন রাখিয়া "গৌড়পতি" বলিয়া আত্মপরিচয় মাত্র দিয়াছেন। গন্ধর্ব্বগণ যে বংশের যশো-গৌরব গান করিয়া থাকে, যিনি অরিন্দম, যাঁহার নিকট অর্থীগণ কখনও বিফল মনোরথ হয় না, সেই রাজা বিশ্ব-সৌন্দর্য্য এই মন্দির ৮৮৮ সংবতে নির্ম্মাণ করিয়া দেবাদিদেব মহাদেবের নামে উৎসর্গ করিয়া আত্মবংশের ও নিজের গুণানুকীর্ত্তন করিয়াছেন। "কুঞ্জরঘটা বর্ষেণ" বলিয়া সময় দেওয়া আছে। কুঞ্জর অর্থে দিগ্‌হস্তী অর্থাৎ ৮, আর ঘট অর্থে তিন ধরিয়া পণ্ডিতগণ ৮৮৮ ধরিয়া লইয়াছেন। সংবৎ খৃষ্টাব্দের ৫৭ বৎসর পূর্ব্বে মহারাজ বিক্রমাদিত্য কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। এই হিসাবানুযায়ী ৮৩১ খৃষ্টাব্দে কাম্বোজাধিপ

এই গৌড়পতি বর্ত্তমান ছিলেন। মহামতি ওয়েষ্ট মেকটের মতে কাম্বোজ দেশ আধুনিক গাজনী প্রদেশের উত্তরে অবস্থিত। গাজনী আফগানিস্থানের একটি প্রদেশ। দেবপাল দেবের এক তাম্রশাসন হইতে জানিতে পারা যায় যে, তিনি কাম্বোজদেশ জয় করিয়াছিলেন। সেকালে কাম্বোজদেশীয় অশ্বের বড় খ্যাতি ছিল। রামায়ণ-পাঠে অবগত হওয়া যায়, রাজা দশরথের কাম্বোজ দেশীয় অনেক অশ্ব ছিল। কাম্বোজ দেশ পুরাণ প্রসিদ্ধ। এই দেশ হইতে পালরাজগণ কি বঙ্গদেশে আসিয়া আপন আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিলেন? ইতিহাস আজ এ কথার উত্তর দিতে অসমর্থ। আধুনিক ঐতিহাসিকের মধ্যে কেহ কেহ বলেন এই কাম্বোজান্বয় দ্বারা বঙ্গে মাহিষ্য-আধিপত্য সূচিত হইয়াছে। মাহিষ্য নরপতির নাম আজ পর্য্যন্ত একটিও আমরা উত্তরবঙ্গে খুঁজিয়া পাই নাই। ক্ষত্রিয় পিতা বৈশ্যা মাতার সন্তান মাহিষ্য জাতি বলিয়া অভিহিত। আধুনিক কৈবর্ত্ত জাতি লোক-গণনায় বা আদম-সুমারীতে "মাহিষ্য" বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন এবং তাহারা এখন আপনাদিগকে মাহিষ্য বলিয়াই পরিচয় দিয়া থাকেন। মহাভারত পাঠে জানা যায় যে, ধৃতরাষ্ট্রাত্মজ বৈশ্যাপুত্র যুযুৎসু পাণ্ডবগণের মহাপ্রস্থানের পর পরীক্ষিতের রক্ষক ও রাজ্যপালক হইয়াছিলেন কিন্তু কোথায়ও তাহাকে মাহিষ্য বলিয়া মহাভারতকার উল্লেখ করেন নাই। মহামতি হাণ্টার সাহেব (W. W. Hu) তমলুকের কৈবর্ত্ত-নরপতি সম্বন্ধে নিম্নলিখিত মত প্রকটিত করিয়াছেন ;—

"The earliest Kings of Tamlook belonged to the peacock dynasty, and were Kshatriya by caste. The last of this line died childless ; At his death the throne was usurped by a powerful aboriginal chief named Katu Bhuiya who was the founder of the line of kaibartas or "Fisher Kings" of Tamlook. Kaibarta

kings are originally considered to be descendants of the aboriginal Bhuiyas......the present kaibarta Raja is the 25th in descent from the founder [Imperial Gazeteer of India Vol IX, page 425.]

এই প্রচ্ছন্ন কাম্বোজরাজ অনার্য্যসম্ভূত বলিয়া কি আপনার নাম গোপন রাখিয়াছেন অথবা বৌদ্ধ নরপতি কোনও পালরাজা শিব-মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া আপন ধর্ম্মমতের বিরোধী বলিয়া আপন নাম প্রকাশ করেন নাই। এ প্রশ্নের মীমাংসা এখন হওয়া সুকঠিন।

বাণ নগরের অতি নিকটে মোসলমান সুলতানগণের আদি রাজধানী দেবকোট অবস্থিত। দেবকোট গঙ্গারামপুর থানা হইতেও বেশী দূরে নহে। দেবকোট বলিয়া এখন আর কোনও গ্রাম নাই। প্রাচীন কীর্ত্তির স্মৃতি এখন দেবকোট পরগণার নামে জড়িত আছে। বঙ্গবিজেতা বকতিয়ার খিলিজি দেবকোটে রাজধানী স্থাপন করিয়া বসবাস করিয়াছিলেন। এখান হইতে আলিমেচের প্রদর্শিত পথে বিপুল বাহিনী লইয়া মহম্মদ বকতিয়ার খিলিজি কামরূপ বিজয়-উদ্দেশ্যে বহির্গত হইয়াছিলেন। কামরূপ বিজয়ে হতাশ হইয়া মহম্মদ বকতিয়ার খিলিজি অশেষ দুর্গতি ভোগ করিয়া দেবকোটে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। এখানে বকতিয়ার যখন রোগশয্যায় ম্রিয়মাণ, সেই সময়ে আলিমর্দ্দন খিলিজীর শাণিত তরবারীর আঘাতে তাঁহার জীবনের শেষ হয়। মহম্মদ বকতিয়ার খিলিজির প্রতিনিধি শেরাণ মহম্মদ বকতিয়ারের এই হত্যা-ব্যাপারের প্রতিশোধ লইয়া আলিমর্দ্দন খিলিজীকে হত করেন। শেরাণ বঙ্গের সুলতান হইয়া আপনার স্বাধীনতা প্রচার করেন। সুলতান আলতামাস তখন দিল্লীশ্বর। শেরাণকে দমন করিবার জন্য তিনি হিসামউদ্দীনকে প্রেরণ করেন। হিসামউদ্দীন শেরাণকে পরাজয় করিয়া আপন আধিপত্য বঙ্গে প্রতিষ্ঠিত করেন। শেরাণ এই সংঘর্ষে নিহত

হইয়াছিলেন। হিসামউদ্দীন বঙ্গে প্রতিষ্ঠিত হইয়া আপনার স্বাধীনতা প্রচার করেন। তিনি সুলতান গিয়াসউদ্দীন নাম গ্রহণ করিয়া স্বীয় নামে "দেবকোট" হইতে মুদ্রা প্রচার করেন। সুলতান গিয়াসউদ্দীনের মুদ্রার পূর্ব্বে বঙ্গে আর কোনও মুদ্রা টাঁকশাল হইতে বাহির হয় নাই। সুতরাং "দেবকোট"ই বাঙ্গালার প্রথম টাঁকশাল বলিতে হইবে।

দেবকোটে সর্ব্ব প্রথম মোসলমান মসজেদ নির্ম্মিত হইয়াছিল। এখানকার ধ্বংসাবশেষগুলি বিশেষ করিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিলে স্পষ্ট প্রতীতি হয়, রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হইলে যে ভাবে নগর স্থাপন করিতে হয়, তাহার কিছুরই অভাব ছিল না। ওয়েষ্টমেকট সাহেব বাহাদুর এখান হইতে নিম্নলিখিত প্রস্তর-লিপিগুলি সংগ্রহ করিয়াছিলেন :—

১। সুলতান কৈকুশ শাহের সময়ের একখানা ৬৯৭ হিঃ
২। " সেকন্দর শাহের " " ৭৬৫ হিঃ
৩। " মুজাফর শাহের " " ৮৯৬ হিঃ
৪। " হোশেন শাহের " " ৯১৮ হিঃ

কালীকান্ত রায় নামক একজন শিক্ষা-বিভাগের কর্ম্মচারী মৌলানা আতার কবর হইতে এক খানি প্রস্তর-লিপি লইয়া যান। সেখানির আর আজ পর্য্যন্ত সন্ধান হয় নাই।

দেবকোটের নিকটেই দমদমা গ্রাম। দমদমা পুনর্ভবা নদীর তীরে। মোসলমান-বিজয়ের পর এখানে একটি দুর্গ নির্ম্মিত হইয়া সেনা-নিবাস স্থাপিত হইয়াছিল। দমদমা বাণগড় হইতে অতি নিকটে অবস্থিত। এখানকার দুর্গাদির ধ্বংসাবশেষ দেখিলে প্রতীতি হয়, মোসলমান সেনা-নিবাস অতি দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া এখানে ছিল। দমদমায় সেনাপতি জাফর খাঁ সুলতান কৈকুশের সময় ১২৯৭ খৃষ্টাব্দে একটি মসজেদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

দেওতলা গ্রাম—দিনাজপুর-মালদহ রাস্তার ধারে অবস্থিত। দেবকোট বা বাণনগর হইতে বড় বেশী দূরে নহে। এখানে একটি পুরাতন মসজেদ-গাত্রে বাবা আদম শাহের নামাঙ্কিত সুলতান বাবরক শাহের রাজত্ব-কালের ৮৬৫ হিঃ সনের এক প্রস্তর-লিপি আছে। এখানকার প্রকৃত নাম "দেবস্থল"। এখানে বহু হিন্দু মন্দিরাদি ও দেবমূর্ত্তি ছিল। মন্দির-গুলি বিজয়ী মোসলমান কর্ত্তৃক বিলুপ্ত হইয়া মসজেদ-আকারে পরিণত হইয়াছিল। দেবমূর্ত্তিগুলি আসনভ্রষ্ট ও অঙ্গাদির বিকার প্রাপ্ত হইয়া লোক-চক্ষুর অন্তরালে গিয়াছে। এই স্থান এক বিষ্ণু-মন্দিরের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। অনেক প্রত্নতত্ত্ববিদের বর্ণনায় বিষ্ণু-মূর্ত্তির সম্বন্ধে অনেক কথা জানিতে পারা যায়। হিন্দুধর্ম্মের অতীত গৌরব হৃদয়ে ধরিয়া জঙ্গলাকীর্ণ হইয়া দিনাজপুর-মালদহের অর্দ্ধ-পথে সরকারী রাস্তার ধারে পড়িয়া আছে। দেবকোট, দমদমা, দেবস্থল, বাণগড়েরই ভিন্ন-ভিন্নাংশের নাম মাত্র। বাণগড়েই রাজধানী স্থাপন করিয়া মোসলমান সুলতান বা শাসনকর্ত্তাগণ শাসনদণ্ড পরিচালনা করিয়াছিলেন। এমন অবস্থায় বোধ হয়, সে সময়েও বাণগড়ের সমৃদ্ধি ছিল এবং দুর্গ-প্রাকারাদি সুদৃঢ় অবস্থায় থাকায় নবাগত বিজয়িগণও আত্মরক্ষার উৎকৃষ্ট স্থান বিবেচনায় এইখানে থাকিয়া ভিন্ন ভিন্ন স্থানে আপতিত হইয়া রাজ্য বৃদ্ধি করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। পুনর্ভবা নদীর বাম তীরে বাণগড় দুই মাইল ভূমি জুড়িয়া পতিত আছে। দিনাজপুর হইতে মালদহ পর্য্যন্ত যে পথ গিয়াছে, তাহার ১৬ মাইল হইতে আরম্ভ হইয়া ১৮ মাইল পর্য্যন্ত পথ ব্যাপিয়া বাণগড়ের ধ্বংসাবশেষ জঙ্গলে পরিণত হইয়া আছে। সুলতান গিয়াসউদ্দীন এখানে ১২০৮ হইতে ১২২৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। গিয়াসউদ্দীন এখান হইতে গৌড় পর্য্যন্ত একটি শাহী পথ এরূপভাবে নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন যে, বর্ষার সময় বন্যার জলপ্লাবন হইতে দেশরক্ষার প্রকৃষ্ট উপায় বা "সেতু-

বন্ধ” হইয়াছিল। ঐতিহাসিকগণ মুক্তকণ্ঠে গিয়াসউদ্দীনের এই কার্য্যের প্রশংসা করিয়াছেন। দেবকোটের ধ্বংসাবশেষের বর্ত্তমান আয়তন প্রায় অর্দ্ধ মাইল হইবে। দেবকোটের উত্তরের দুর্গ-প্রাকারাদির পশ্চিমে একটি মস্‌জেদের ধ্বংসাবশেষ আছে। এই মস্‌জেদ নির্ম্মাতার নাম প্রবাদে সা বোখারী বলিয়া জানা যায়। একটি পুরাতন দেব-মন্দির ভঙ্গ করিয়া তাহার উপর এই মসজেদ নির্ম্মিত হইয়াছে। পুনর্ভবা নদীর অপর তীরে বাহাউদ্দীন পীরের দরগা আছে। ১৭ মাইল স্তম্ভ হইতে একটি রাস্তা দুইটি বিশাল দীর্ঘিকা পর্য্যন্ত গিয়াছে। দীঘি দুইটির নাম কালাদীঘি ও ধলদীঘি। কালাদীঘি এক মাইল দীর্ঘে ও প্রস্থে পোয়া মাইল হইবে। কথিত আছে কালা রাণী নামে বাণরাজার এক রাণী ছিলেন। তিনি এই দীঘি খনন করাইয়াছিলেন বলিয়া আজও লোকে কালা-দীঘি বলিয়া থাকে। দীর্ঘ-প্রস্থে দীঘি দুইটিই সমান হইবে। দমদমা হইতে এই দীঘিদ্বয়ের দূরত্ব এক মাইল হইবে। “ধল” দীঘির পাহাড়ের উপর পবিত্রাত্মা মৌলানা আতার মস্‌জেদ আছে। মৌলানা আতার সময় নিরূপণ করা কঠিন। তবে এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে, এই সাধুপুরুষ সুলতান সেকন্দার শাহের সময়ে জীবিত ছিলেন। সেকন্দার শাহের এক-খানা প্রস্তর-লিপিতে জানিতে পারা যায় যে, মৌলানা আতা মস্‌জেদ আরম্ভ করিয়া সুসম্পন্ন করিতে পারেন নাই। সুলতান সেকন্দার শাহ ১৩৬৮ খৃষ্টাব্দে মস্‌জেদটি সমাপ্ত করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ এই মসজেদটি মৌলানা আতার সমাধি-মন্দির। এই মস্‌জেদের অপর পার্শ্বে একটি কবর আজও দেখিতে পাওয়া যায়। এই মসজেদের দেওয়াল প্রস্থে চারি হাত হইবে। মসজেদের মধ্যের দেওয়াল-গাত্রে হাতী ঘোড়ার চিত্র খোদিত আছে। এখান হইতে তিন মাইল দক্ষিণে গঙ্গারামপুর গ্রাম। এখানেই পূর্ব্বে গঙ্গারামপুর থানা ছিল।

পত্নীতলা এখন একটি পুলিশের থানা। পুরাকালে ইহার আশে-পাশে নানা সমৃদ্ধিশালী গ্রাম ছিল। বৌদ্ধ পালরাজগণের পুরাতন কীর্ত্তি এখানে অনুসন্ধান করিলে যথেষ্ট পাওয়া যায়। বর্ত্তমান পুলিশ-ষ্টেসনের নিকট দিনাজপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট ওয়েষ্টমেকট সাহেব বাহাদুর একটি প্রস্তরনির্ম্মিত বৌদ্ধ-চৈত্য প্রাপ্ত হইয়া দিনাজপুর সদরে আনয়ন করিয়াছিলেন। তাহার পর আর সে চৈত্যটির কোনও সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না। প্রাচীন কীর্ত্তির স্মৃতি-চিহ্নগুলি এই প্রকারে অপসারিত হইয়া ঐতিহাসিক চিহ্নগুলি ক্রমশঃ বিলুপ্ত হইতেছে।

এই থানার অন্তর্গত "বাদাল" গ্রামে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানীর একটি বাণিজ্য-কুঠি ছিল। এই কুঠিগুলির সেকালের নাম ছিল "আড়ঙ্গ" বা আড়ং। এখনও লোকে যেখানে বহু লোকের সমাবেশ হয় অথবা খরিদ-বিক্রয়ের জন্য বহু জিনিষপত্রের আমদানী হইয়া থাকে, তাহাকে মেলা বা আড়ং বলিয়া থাকে। ১৭৪৪ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানীর আড়ঙ্গে যে সকল টাকা-কড়ি পাঠানর হিসাব-পত্র দেখা যায়, তাহাতে বাদালের কুঠিতে একবার আড়াই লক্ষ টাকা পাঠানর কথা লেখা আছে (Vide Long's selection page 240).। বাদাল সে সময়ে রেশমের কারবার জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। এখন যেমন বাদালে যাইতে হইলে বড়ই বিপদে পড়িতে হয়, সে সময় আত্রাই ও যমুনা নদী দিয়া নৌকাপথে যাতায়াত ও বাণিজ্যাদির সুবিধা ছিল। এখানে ঐতিহাসিক ও ভাষাবিদ্ উইলকিন্স সাহেব ফ্যাক্‌টার বা সিবিলিয়ানরূপে বহুদিন কুঠীর অধ্যক্ষ ছিলেন। তাঁহার অবস্থিতির সময়ে বাদাল একটি নগর ছিল। এখন জঙ্গলাকীর্ণ হইয়া ভগ্ন স্তূপরাশিরূপে পতিত আছে। উইলকিন্স সাহেব মঙ্গলবাড়ীর হাটের নিকট একটি বিলের ধারে রামগুরব মিশ্রের গরুড়-স্তম্ভলিপি আবিষ্কার করিয়া আসিয়াটিক্ সোসাইটির পত্রিকার

প্রথমভাগে প্রকাশ করেন। উইলকিন্স সাহেব যখন স্তম্ভটি দেখিতে পাইয়াছিলেন, সে সময়ে স্তম্ভটির উপরিভাগ হইতে তক্ষকনাগসহ গরুড়-মূর্ত্তি ভাঙ্গিয়া পড়িয়া স্তম্ভটি একটা মৃত নারিকেল বৃক্ষের মত দাঁড়াইয়া-ছিল। রামগুরব মিশ্র নারায়ণপালের প্রধান অমাত্য ছিলেন। শাণ্ডিল্য-বংশসম্ভূত ভট্টগুরব মিশ্র এই স্তম্ভের গাত্রে ২৮টি সংস্কৃত শ্লোকে আত্ম-বংশের গুণকীর্ত্তনপ্রসঙ্গে পালরাজ ধর্ম্মপাল, দেবপাল, সুরপাল ও নারায়ণপাল দেবের নানা চরিত্র-কথা প্রকটিত করিয়া গিয়াছেন। এই গরুড়-স্তম্ভের দক্ষিণে একটা বড় জঙ্গল আছে। লোকে এই জঙ্গলমধ্যে "দেওয়ান বাড়ী" ছিল বলিয়া প্রকাশ করে। স্তম্ভের অতি নিকটে এক মন্দির মধ্যে হরগৌরীর প্রতিমা আছে। হরগৌরী "বাভ্রবী কায়া" ভিন্ন আর কিছুই নহে। এই শ্রীমূর্ত্তির এখনও সেবা-পূজা হইয়া থাকে। পূজার ভোগের বরাদ্দ মাত্র সোয়া সের চাউল। একজন মোসলমান এই সেবা-পূজার অধ্যক্ষ। স্তম্ভের নিকট দেওয়ান-বাড়ী থাকায় আমাদের বিশ্বাস এখানে রামগুরব মিশ্রের ভদ্রাসন বাড়ী ছিল। এই দেওয়ান-বাড়ীর জঙ্গলের মধ্যে দীর্ঘিকা, পুষ্করিণী ও পুরাতন অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষ এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। মন্ত্রী কথার প্রচলিত শব্দ দেওয়ান, আধুনিক "মেনেজার" শব্দবাচক। মন্ত্রীব বাড়ীই দেওয়ান-বাড়ী হইয়াছে বলিয়া আমাদের অনুমান। দেওয়ান-বাড়ীর আরও কিছু দুরে দক্ষিণ দিকে "ধুরইলের মাঠ"। এই প্রান্তর মধ্যে বহু সরোবর ও ভগ্নাবশেষ দেবমন্দির বর্ত্তমান আছে। ধুরইল অতিক্রম করিলে একটি গ্রাম পাওয়া যায়। সে গ্রামের নাম শিবপুর। এই শিবপুর গ্রামের মধ্যে একটি পিপুল বৃক্ষের মূলে গজারূঢ়া দশভুজা মূর্ত্তি আছেন। আমরা সিংহবাহিনী দশভূজা মূর্ত্তিই দেখিয়াছি। গজারূঢ়া দশভূজা-মূর্ত্তি এখানে এই নূতন দেখিয়াছিলাম। দশভুজা-মূর্ত্তির নিকটেই

জঙ্গলে কারুকার্য্যসমন্বিত একখানা সূর্য্যমূর্ত্তি পতিত আছে। প্রতি বৎসর বাসন্তী পূজার সময় শিবপুরে এই গজারূঢ়া দশভুজার পূজা উপলক্ষে একটি মেলা বসিয়া থাকে। মেলার জন্যই শিবপুর এখন জনসমাজে পরিচিত।

যমুনা নদীর তীরে রামগুরব মিশ্রের গরুড়-স্তম্ভের চারি ক্রোশ দক্ষিণ-পশ্চিমে বৌদ্ধধর্ম্মের স্মৃতি-স্তম্ভস্বরূপ যোগীভবন অবস্থিত। রেভেনিউ-সারভের মানচিত্রে যোগীস্তম্ভ বলিয়া লেখা আছে। ইহার নিকটে আত্রাই নদীর পুরাতন খাদ ঘুকশী বিলের ধারে প্রাচীনকালে যে একটি সমৃদ্ধিশালী জনপদ বিদ্যমান ছিল তাহার চিহ্ন আছে। আত্রাই নদীর কুক্ষিগত হওয়া আরম্ভ হইলে লোকে বোধ হয় এই স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। এই যোগীস্তম্ভে একটি প্রবাদ আছে যে, সুরঙ্গ পথে এই ভবন বগুড়া জেলার যোগীভবনের সঙ্গে সংযুক্ত আছে। যোগী-ভবন এখন "কাণ-ফাঁড়া" যোগী জাতির অধিকারে। ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে যেমন পৈতা না হইলে এক পংক্তিতে ভোজন করিতে পারে না, এই যুগীদের মধ্যেও "কাণ-ফাঁড়া" না হইলে পংক্তি-ভোজনে অধিকার হয় না। যোগী-স্তম্ভটি ৪ হাত দীর্ঘ-প্রস্থে হইবে। স্তম্ভের মধ্যে অর্দ্ধলুপ্ত একটি শিবলিঙ্গ আছে। এরূপ লিঙ্গ সচরাচর কোথায়ও দেখিতে পাওয়া যায় না। ব্রহ্মলিঙ্গমূর্ত্তি পঞ্চমুখ কিন্তু এখানে চতুর্ম্মুখ আছে। মন্দিরের প্রবেশ-দ্বারে উভয়দিকে বেদির উপর তুলসী ও ত্রিশূল আছে। মন্দিরের বাহিরে একখানা বিষ্ণুমূর্ত্তি পড়িয়া আছে। অর্দ্ধশায়িতাবস্থায় পাষাণ-নির্ম্মিত রমণীমূর্ত্তির পার্শ্বে একটি শিশু খেলা করিতেছে। মূর্ত্তিটি ভগ্ন। এই প্রকার একটি মূর্ত্তি আমরা বগুড়া কশবায় দেখিয়াছিলাম। এখানে যমুনাদেবীর একটি মন্দির আছে। মন্দিরটি একটি ভগ্ন স্তূপের উপর নির্ম্মিত। এই ভগ্ন স্তূপের নাম দেবপালরাজার "সমাধি ভবন"।

লোকে এই স্থানকে দেবপাল রাজার রাজধানী বলিয়া থাকে। বৈশাখ মাসের শুক্লপক্ষে এই স্থানে দেবপাল রাজার নামে পূজা হইয়া থাকে।

যোগীভবনের যোগীরা অতিথিপরায়ণ। দেবসম্পত্তি অতি সামান্য মাত্র। যোগীদের মুখে জানা যায় যে, এই গুম্ফমধ্যে গোরক্ষনাথ তপস্যা করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। তাহারা বলে স্তম্ভের মধ্যে তাঁহার আসনস্থান বর্ত্তমান আছে। সিদ্ধ গোরক্ষনাথের শিষ্য বলিয়া যোগীগণ দাবী করিয়া থাকেন। এই যোগীগণ সাধারণে "যুগী" বলিয়া অভিহিত। যমুনাদেবীকে স্থানীয় লোকে বিমলাদেবী বলিয়া থাকে। এই দেবী দেবপাল রাজার কন্যা। তাঁহার দেবত্বপ্রাপ্তির কোনও প্রবাদ আমরা সংগ্রহ করিতে পারি নাই। বিমলাদেবীর রীতিমত পূজার্চ্চনা হইয়া থাকে।

যোগী গুম্ফের দুই ক্রোশ দক্ষিণে একটি প্রাচীন জনপদের ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। এই গ্রামের নাম "অমরী" বা "আমাই"। গ্রামখানি পূর্ব্ব-পশ্চিমে একমাইল দীর্ঘ হইবে। গ্রামে বহু পুরাতন পুষ্করিণী আছে। এখানে কারুকার্য্যখচিত বহুপ্রকার ইষ্টক ও ভগ্ন দেবমূর্ত্তি এখানে-ওখানে পড়িয়া আছে। স্থানীয় লোকদিগকে জিজ্ঞাসাবাদে কোনও প্রকার প্রবাদবাক্য প্রচলিত থাকা জানিতে পারা যায় নাই।

বৃন্দাবন গ্রাম—অমরীর এক ক্রোশ উত্তর-পশ্চিমে। এই গ্রামও অতি প্রাচীন। এখানে একটি পিপুল গাছের তলায় অনেকগুলি ভগ্ন দেবমূর্ত্তি ও কারুকার্য্যখচিত ইষ্টকাদি স্তূপাকারে পড়িয়া আছে। এই ভগ্নমূর্ত্তিরাশি আলোড়িত করিয়া আমরা একখানা নাতিদীর্ঘ নাতিহ্রস্ব প্রস্তর-ফলকে আটটি স্ত্রীমূর্ত্তি খোদিত দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়াছিলাম। নিকটে একজন বৃদ্ধ দাঁড়াইয়া আমাদের কার্য্যকলাপ দেখিতে-

ছিলেন। আমরা মূর্ত্তিখানি কি জিজ্ঞাসায় আমাদিগকে বৃদ্ধ বলিলেন, "অষ্টসখীর মূর্ত্তি" এই বৃন্দাবন গ্রামে পূজা হইত বলিয়া গ্রামের নাম বৃন্দাবন। দুরন্ত কালাপাহাড়ের আক্রমণে যে সকল দেবমূর্ত্তি অস্পৃশ্য হইয়াছিল, তাহাই এখানে স্তূপাকারে পড়িয়া আছে।" আমরা "বৃন্দাবনের" সম্বন্ধে আর কোন ও জনপ্রবাদ জানিতে পারি নাই।

কাদীপুর গ্রামের নিকট শিবতলা নামে এক স্থান আছে। এখানে একটি বিরাট পিপুল গাছের শিকড়ের সহিত দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ হইয়া একখানা বিষ্ণুমূর্ত্তি আছে। মূর্ত্তিখানি প্রায় সোয়া দুই হাত উচ্চ হইবে। পাদদেশে দেবনাগরঅক্ষরে কি লেখা আছে। আমরা তাহার শেষ দুইটি কথা মাত্র পাঠ করিতে পারিয়াছিলাম "মাধবায় নমঃ নমঃ।" এই গ্রামে চৈত্র মাসের শুক্লা-দশমীর দিন প্রতিবৎসর একটি মেলা বসিয়া থাকে।

আত্রাইনদীর তীরে "ঘাটনগর" নামে একটি পুরাতন গ্রাম আছে। ঘাটনগর পত্নীতলা থানা হইতে দক্ষিণ-পশ্চিম ছয় ক্রোশ দূরে হইবে। প্রাচীন কীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ এখানে যথেষ্ট আছে। এখন কেবল কারুকার্য্যসমন্বিত ইষ্টকাদি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্তাবস্থায় পড়িয়া আছে দেখা যায়। এখানে একটি মোসলমানসমাধি-মন্দির আছে। সমাধির ছাদ নাই, কেবল প্রাচীরমাত্র অতি জীর্ণাবস্থায় খাড়া আছে। মন্দিরের মালমসল্লা পুরাতন হিন্দু-মন্দির হইতে সংগৃহীত বলিয়া বোধ হয়। প্রাচীন মোসলমানদিগকে জিজ্ঞাসা করায় তাহারা বলে যে, এইটি শেরাণের "কবর"। ইতিহাসপ্রসিদ্ধ বকতিয়ার খিলিজীর সেনাপতি "শেরাণ" কি এইস্থানে সমাধিপ্রাপ্ত হইয়া জগতের শেষ দিনের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। ইতিহাস পাঠে অবগত হওয়া যায়, শেরাণের কবর উত্তরবঙ্গে আছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ পর্য্যন্ত তাহার স্থান নির্ণয় হইল না। এই সমাধির

নিকটে ছোট বড় অনেকগুলি পুষ্করিণী আছে। সেগুলি উত্তর-দক্ষিণে লম্বা বলিয়া হিন্দু-কীর্ত্তির নিদর্শন নিঃসন্দেহে ঠিক করিতে পারা যায়। শেরাণের সমাধির দক্ষিণ একক্রোশ দূরে একটি জমিদারী কাছারী আছে। কাছারী ঘরের দেওয়ালের সহিত একখণ্ড দীর্ঘ প্রস্তরে তিনটি দেবমূর্ত্তি উৎকার্ণ আছে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও সূর্য্য বলিয়া প্রতীতি জন্মে। প্রাচীনকালে হিন্দু ত্রিমূর্ত্তি ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও সূর্য্য ছিলেন। দেবাদিদেব মহাদেব জোর করিয়া সূর্য্যকে তাড়াইয়া দিয়া তাঁহার স্থানে আপনি অধিষ্ঠান হইয়াছেন। কাছারীতে রজনীযোগে বিদেশী অপরিচিত ভদ্রলোকের স্থান হয় না। অতিথি-সৎকার তো অতি দূরের কথা। ঘাটনগর এই স্থানের নাম কেন যে হইল, অনেক অনুসন্ধানে আমরা জানিতে পারি নাই।

রেণেলের মানচিত্রের ১১৯ পৃষ্ঠায় দেখিতে পাওয়া যায়, ঘাটনগরের ৪ ক্রোশ উত্তর "দীবার" গ্রাম। এই গ্রামে একটি বড় দীঘি আছে। ব্লকম্যান সাহেব তাঁহার বিবরণে লিখিয়াছেন—ধীবর নামে কোনও এক রাজা সহস্র বৎসর পূর্ব্বে এই দীঘিকা খোদিত করিয়াছিলেন, দেবপালের নামই ধীবর হইয়াছে কিনা বলা যায় না। এই দীঘির মধ্যে একটি স্তম্ভ আছে। জল হইতে স্তম্ভটি আটহস্ত উচ্চ হইবে। দীঘিকার জলও সাত হাত হইবে। ধরিতে গেলে মোট ১৫ হাত স্তম্ভটি দীর্ঘ হইবে। স্তম্ভটির গাত্রে কোনও খোদিতলিপি নাই। জলের ভিতর পাদদেশে আছে কিনা বলা যায় না। আজ পর্য্যন্ত কেহই স্তম্ভটির মূলদেশ দেখিবার চেষ্টা করেন নাই। পুরাতত্ত্ব-বিদ্‌গণ অনুমান করেন যে, ইহা একটি অশোকস্তম্ভ। দীঘির পাহাড় ও বকচরাদি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিলে স্পষ্ট অনুমান হয়, দীঘিটি বেশী দিনের হইলেও অশোকের সময়ের নহে। স্থানীয় লোকেও

এই জল মগ্ন স্তম্ভের সম্বন্ধে কোনও কথা বলিতে পারে না। ক্যানিংহাম ও বুকাননও এই স্তম্ভসম্বন্ধে কোনও মতামত প্রকাশ করিতে পারেন নাই। মনে বড়ই কৌতুহল হয়, এই স্তম্ভের পাদমূলে কি ঐতিহাসিক তত্ত্ব নিহিত আছে? বাঙ্গালার দুর্ভাগ্য এমন একটি ঐতিহাসিক চিহ্নের বিশ্লেষণ করিবার কাহারও আগ্রহ নাই। সামান্য ব্যয়ে একটা জল শোষণ করা এঞ্জিন বা চীনাকল বসাইতে পারিলে একার্য্য অতি সহজে সুসম্পন্ন হইতে পারে।

মহীপাল দীঘি দিনাজপুর হইতে ১৫ মাইল দূরে মালদহ-দিনাজপুর পথের নিকট অবস্থিত। পালরাজ মহীপাল এই দীঘি খনন করাইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নামে দীঘির নাম হইয়াছে। প্রবাদ যে ব্রহ্মহত্যা পাপ হইতে উদ্ধার প্রাপ্তির মানসে পালরাজ এই সাগরতুল্য জলাশয় খনন করান। মহীপাল দীঘির সন্নিকটেই মহীপুর ও মহীগ্রাম নামে দুইটি গ্রামের অস্তিত্ব থাকিয়া আজও মহীপালের নাম অতীতের বিস্মৃতি হইতে রক্ষা করিতেছে। যে পরগণার মধ্যে মহীপাল দীঘি অবস্থিত, তাহার নাম "মহীনগর"। সম্ভবতঃ এই মহানগরই রাজা মহীপালের রাজধানী ছিল।

মহীপাল দীঘির সন্নিকটে টমাস্ নামে একজন ইংরেজ বণিক একটি বাণিজ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। মালদহের ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানীর কুঠীর অধ্যক্ষ জর্জ উডনী টমাসকে ১৭৯৩ সনে নীলের কারবারের জন্য এখানে প্রেরণ করেন। টমাস সাহেব চিকিৎসাব্যবসায়ী ও খৃষ্ট-ধর্ম্ম-প্রচারক ছিলেন। এখানে থাকিয়া তিনি ধর্ম্ম-প্রচারকের কার্য্য ও রোগীদিগকে নীরোগ করিবার চেষ্টাই করিয়াছেন। টমাস সাহেবের নীলকুঠির ধ্বংসাবশেষ এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। ফারনেনডেস বলিয়া একজন পর্টুগিজ বণিক এই অঞ্চলে ছিলেন। তিনি

কেরী ও টমাস সাহেবের প্রচার-কার্য্যে সর্ব্ব প্রকার সাহায্য করিতেন। এখানে জনপ্রবাদে জানিতে পারা যায় যে, পালরাজ মহীপালের স্থিরপাল ও বসন্তপাল নামে দুইটি পুত্র ছিল। বৌদ্ধ-বারাণসী জগৎসিংহের স্তূপের মধ্যে প্রাপ্ত খোদিত লিপি হইতে জানিতে পারা যায় যে, মহারাজ মহীপাল আটটি পবিত্র স্থানের ধ্বংসাবশেষ হইতে প্রস্তর সংগ্রহ করিয়া এই গন্ধ কুঠী নির্ম্মাণ করেন। এই কার্য্য ১০৮৩ সংবতে ১১ পৌষ বসন্তপালের অনুজ স্থিরপাল কর্ত্তৃক শেষ হইয়াছিল।

"কৃতবন্তৌ চ নদীনাং অষ্ট মহাস্থান শৈলগঞ্জকুটীং।
এতাঃ শ্রীস্থিরপাল বসন্তপালানুজং শ্রীমান্॥"

এই লিপি হইতে স্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে, বসন্তপাল ও স্থিরপাল ১০৮৩ সংবতে বর্ত্তমান ছিলেন। পালরাজগণের বংশাবলী আজ পর্য্যন্ত যতদূর লিখিত হইয়াছে, তাহাতে বসন্তপাল ও স্থিরপালের নাম মহীপালের পুত্র বলিয়া স্থান পায় নাই।

মহীপাল দীঘির দুই ক্রোশ পূর্ব্বভাগে আমগাছী গ্রাম। পরগণা সুলতানপুরের মধ্যে আমগাছী মৌজা। ১৮০৬ খৃঃ আমগাছীর একটি স্তূপের নিকটে একজন কৃষকের হল-তাড়নায় একখানা তাম্রশাসন আবিষ্কার হয়। শাসনখানি বিগ্রহপালদেবের। রাজমহিষী মহাভারত শ্রবণ করিয়া পাঠক ব্রাহ্মণকে ভূমিদান করিতেছেন। প্রসঙ্গক্রমে পাল-রাজগণের বংশাবলীও প্রকীর্ত্তিত হইয়াছে।

দিনাজপুর হইতে ৩৬ মাইল দক্ষিণে যাইলে আতাপুর গ্রাম পাওয়া যায়। এই গ্রাম মৌলানা "আতার" নামে হইয়াছে বলিয়া অনুমান হয়। এখানে জঙ্গলাকীর্ণ বহুদূর ব্যাপিয়া একটি ভগ্ন স্তূপ আছে। লোকে এখানে ঊষাপালের বাড়ী ছিল বলিয়া দেখাইয়া থাকে। আজ পর্য্যন্ত পাল নরপতিদিগের নামের তালিকার মধ্যে এই ঊষাপালের

নাম স্থান পায় নাই। শাহ নিমাই ফকীরের সমাধি এখানে বর্ত্তমান আছে। উষাপালের বাড়ী ভাঙ্গিয়া ইষ্টক-প্রস্তরাদি আনিয়া এই ফকির সাহেবের সমাধি-মন্দির প্রস্তুত হইয়াছিল। সমাধি-স্তম্ভের একটির গাত্রে চারিটি ব্যাঘ্রমূর্ত্তি অঙ্কিত আছে।

বাদালাকুঠীর এক ক্রোশ দক্ষিণে বহুস্থান ব্যাপিয়া একটি স্তূপ জঙ্গলাকীর্ণাবস্থায় আছে। লোকে বলে, এখানে চন্দ্রপাল ও মহীপাল রাজার বাড়ী ছিল। চন্দ্রপাল কে? তাহার সম্বন্ধে আজ পর্য্যন্ত কিছু জানিতে পারা যায় নাই। চন্দ্রপাল যে পালবংশীয় কোনও নরপতি ছিলেন তাহারও প্রমাণ নাই। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেকগুলি স্তূপ আছে, সে গুলির সম্বন্ধে কোনও জনশ্রুতি আমরা অবগত হইতে পারি নাই।

গঙ্গারামপুরের ধলদীঘির মেলা প্রসিদ্ধ। এখানে প্রতি সন মাঘ মাসে একটি মেলা বসে। পুরাতন কাগজ পত্রানুসন্ধানে জানা যায়, ১৫১২ খৃষ্টাব্দে মুজাফরাবাদের উজির ও ফিরোজাবাদের কোটাল বাহাদুর কর্তৃক ধল-দীঘির মেলা স্থাপিত হইয়াছিল। ফিরোজাবাদে প্রথম টাঁকশাল স্থাপিত হইয়াছিল। ফিরোজাবাদ আধুনিক পাণ্ডুয়ার নাম। সুলতান তৃতীয় ফিরোজ শাহের আক্রমণের পর এই নগরের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। মুজাফরবাদ আধুনিক সুবর্ণগ্রামের নিকট অবস্থিত ছিল। এখানেও টাঁকশাল ছিল।

পতিরাম থানার অনতিদূরে একটি প্রকাণ্ড দীঘি আছে। লোক-প্রবাদে জানা যায়, এই দীঘি পালবংশীয় নরপতি উষাপাল খনন করাইয়া প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতিষ্ঠাকালে বটেশ্বর ভট্ট নামক জনৈক ব্রাহ্মণকে দান করেন। এখন এই দীঘির জল বেশ নির্ম্মল আছে। পার্শ্ববর্ত্তী জনপদের বিশেষ উপকার সাধিত হইতেছে।

গঙ্গারামপুর থানার প্রধান পুরাকীর্ত্তি "তপন দীঘি"। সাধারণ

লোকে এই দীঘিটি সেনরাজ-কীর্ত্তি বলিয়া প্রকাশ করিয়া থাকে। মুরশিদাবাদের সাগর-দীঘি, দিনাজপুরের মহীপাল দীঘি আয়তনে তপন-দীঘি হইতে অনেক ছোট। সংস্কারাভাবে এই বিরাট দীর্ঘিকা জঙ্গলাকীর্ণ হইয়া ক্রমশঃ শুকাইয়া যাইতেছে। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে এখানে অপর একটি পুকুর খননকালে একখানা তাম্রশাসন পাওয়া যায়। তাম্রশাসন খানি সেনরাজ লক্ষ্মণ সেনদেবের প্রদত্ত ভূমিদানপত্র। তাম্রশাসনখানি তপন দীঘির তাম্রশাসন বলিয়া পরিচিত। ইহার পাঠোদ্ধার পণ্ডিতকুলচূড়ামণি ৺মহেশচন্দ্র তর্কচূড়ামণি করেন এবং উকিল ৺গোপালচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় ইহার ইংরাজী তরজমা করিয়া এসিয়াটিক সোসাইটীর পত্রিকায় প্রকাশ করেন। এই তাম্রশাসন পাঠে জানিতে পারা যায় যে, সেনরাজগণ হিন্দু হইলেও বুদ্ধবিহারী দেবতা-নিচয়ের প্রতি ভক্তিহীন ছিলেন না। এই তপন দীঘির শাসনে সেনরাজ লক্ষ্মণ সেন "বিল্লহিষ্টী" গ্রাম ব্রাহ্মণকে দান করেন। এই বিল্লহিষ্টী যে কোথায় তাহার ঠিকানা হয় নাই, তাহার অস্তিত্ব আছে কিনা জানিবার উপায় নাই। গৌড়াগত পঞ্চ ব্রাহ্মণের আদিশূর-প্রদত্ত পঞ্চ গ্রামেরও কোনও অস্তিত্ব আজ কাল নাই। দেশের নাম, গ্রামের নাম, নদ-নদীর নাম প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তনে সময়ের শাসনে নবভাবে কোথায়ও গঠিত হইয়াছে, কোথাও বা একবারে বিলুপ্ত হইয়াছে। সুতরাং প্রাচীন কালের কথা এখন বলা বিষম সমস্যার ব্যাপার।

দিনাজপুর ও পূর্ণিয়া জেলার সীমান্তবর্ত্তীস্থানে নাগর নদীর কূলে "তাজপুর" গ্রাম। নাগর নদী বগুড়া জেলার মধ্যে করতোয়ানদীর সঙ্গে সম্মিলিত হইয়াছে। পলাশীর যুদ্ধের পর ইংরেজ-শাসন প্রতিষ্ঠার সময়ে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানী এখানে একটি সুদৃঢ় দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া-ছিলেন। এখনও দুর্গটির ভগ্নাবশেষ বর্ত্তমান থাকিয়া অতীতের স্মৃতি-

রক্ষা করিতেছে। এখানে কোম্পানীর অনেকগুলি সৈন্য রাজ্যরক্ষা ও উত্তরবঙ্গের জমিদারগণের নিকট কর আদায়ের জন্য অবস্থিতি করিত।

দিনাজপুরের প্রসিদ্ধ মেলা মেকমর্দ্দন রাণীসঙ্কুল থানার অন্তর্গত ভবানীপুর গ্রামে অবস্থিত। ঠাকুর গাঁ মহকুমার অধীন রাণীসঙ্কুল থানা নাগর নদীর তীরে। মেকমর্দ্দনের মত মেলা বাঙ্গালায় আর ছিল না। যে বৎসর বঙ্গদেশে প্লেগ দেখা দিয়াছিল, সেই অবধি মেক-মর্দ্দন মেলা দেশরক্ষার জন্য সরকার বাহাদুর ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলেন। এই মেলা চৈত্র মাসের শেষ সপ্তাহে আরম্ভ হইয়া বৈশাখ মাসের ১০।১৫ দিন পর্য্যন্ত থাকিত। ভূটান, নেপাল, পূর্ণিয়া, বাবাণসী, পাটনা, ও বঙ্গদেশের সকল জেলা হইতে ব্যবসায়ীগণ নানাবিধ পণ্যদ্রব্য লইয়া এই মেলায় আগমন করিত। হাতা, ঘোড়া ও গবাদি বহুতর পশ্বাদির আমদানী হইত। এই মেলায় ৩০০০ হাজার ঘোড়া, ৩০০০০ ত্রিশহাজার গবাদি বিক্রয় হইত। বহুলক্ষ টাকার জিনিসপত্র বিক্রয় করিয়া মহাজনেরা লাভবান হইতেন। এখানে মেকমর্দ্দন শাহের সমাধি বা দরগা আছে। দরগায় ছিন্নি না দেওয়া পর্য্যন্ত ব্যবসায়ীরা দোকান পাতিতে পারিতেন না।

পার্ব্বতীপুর রেল-ষ্টেসনের উত্তরে পার্ব্বতীপুর বন্দরের নিকট পার্ব্বতীর "পাঠ" আছে। প্রবাদ যে, পার্ব্বতী এখানে তপস্যা করিয়া দেবাদিদেব মহাদেবকে স্বামীরূপে প্রাপ্ত হন। পার্ব্বতীপুরের তিন ক্রোশ উত্তরে করতোয়া নদীর ধারে একটি বৃহৎ স্তূপ আছে। মহা-স্থানের শিলাদেবীর ঘাটের ন্যায় নদীবক্ষ হইতে অনেকটা স্থান বাঁধিয়া উঠান আছে। এই বাঁধা স্থানে আজও ইষ্টকনির্ম্মিত সোপানাবলী দেখিতে পাওয়া যায়। প্রবাদ, এখানে "হিরা-জিরা" নামে দুইভগ্নী রাজ-বেশ্যার বাড়ী ছিল। উত্তরবঙ্গের আদি গীতি গোপীচন্দ্র রাজার গীতে

পাওয়া যায় যে, এখানে রাজা গোপীচন্দ্র বেশ্যা হিরার কুহকে আবদ্ধ হইয়া অতি হেয়ভাবে দিনযাপন করিতেছিলেন। পরে তাঁহার গুরু "হাড়ীসিদ্ধা" তাঁহাকে এখান হইতে উদ্ধার করিয়া লইয়া যান। রাজা গোপীচন্দ্রের মাতার নাম ময়নাবতী। এই ময়নামতীর সহিত রাজা ধর্ম্মপালের রাজ্য লইয়া বিবাদ হইয়া ঘোরতর সংগ্রাম হইয়াছিল। যুদ্ধ তিস্তা নদীর তীরে সংঘটিত হয়। সেই যুদ্ধে রাজা ধর্ম্মপালের পতন হয়। রাজা ধর্ম্মপালের গড় ও রাণী ময়নামতীর গড় দেওনাই নদীর তীরে রঙ্গপুর জেলার জলঢাকা থানার অন্তর্গত ধর্ম্মপাল ও আটিবাড়ী গ্রামে আজও বর্ত্তমান আছে। রাজা গোপীচন্দ্র বাইশদণ্ডের রাজা অর্থাৎ বাইশদণ্ড কাল মধ্যে যত দূর পথ হাঁটিয়া যাইতে পারা যায়, সেই পরিমাণ ভূখণ্ডের রাজা ছিলেন। পার্ব্বতীপুরের দুই ক্রোশ উত্তর-পূর্ব্বে একটা গড়ের মত প্রায় একক্রোশ ব্যাপিয়া অর্দ্ধজঙ্গলাবৃত স্থান আছে। এই স্থানকে লোকে কীচকপুর বলে। মহাভারতের বিরাট রাজার শ্যালক কীচকের সহিত এই স্থান সংযুক্ত করিবার মানসে লোকে ইহাকে কীচক রাজার বাড়ী ছিল বলিয়া থাকে। কীচক বলিয়া কোনও রাজা থাকুক বা না থাকুক আমরা "কীচক" নামে এক পরস্ব-লুণ্ঠনকারী দস্যু-জাতির সন্ধান পাইয়াছি। এই জাতি এখন আর রঙ্গপুর-দিনাজপুরের মধ্যে বসবাস করে না। পূর্ণিয়া জেলার মধ্যে এখন কীচকেরা আছে। অল্প দিন হইল, দস্যুতা আদি অপরাধ করার জন্য এই জাতির অধিকাংশ লোক বিচার-আদালত কর্ত্তৃক নির্ব্বাসিত হইয়া দ্বীপান্তরে গিয়াছে। সম্ভবতঃ এই দস্যু-জাতির পূর্ব্ব-বাস এখানে ছিল। ইংরাজ-শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হইলে এই প্রদেশ হইতে দস্যু-ভয় প্রশমিত হইলে দস্যুগণ এই অঞ্চল ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে। কীচকপুর এখন একবারে জনশূন্য। ইহার এক ক্রোশের মধ্যে লোকের বসবাস নাই। বিশাল

প্রান্তর মধ্যে পূর্ণিয়া, দিনাজপুর, রঙ্গপুর পথ-মধ্যে কীচকগণ নির্ভয়ে বাস করিয়া পথিকের সর্ব্বনাশ করিত। লোকে সন্ধ্যার পর এখানে আসিতে বা থাকিতে বড় ভয় পাইয়া থাকে। একটা পুরাতন পুকুরের পার্শ্বে একটি ভগ্ন মন্দির এখনও বর্ত্তমান আছে। লোকে বলে এখানে কীচকের "কালী" ছিল। কালিকাদেবীর নরবলি দিয়া পূজা হইত। ইতস্ততঃ অনুসন্ধান করিয়া আমরা কীচকের কালিকামূর্ত্তির কোনও সন্ধান পাই নাই। এই কীচকপুর এখন উত্তরবঙ্গ-রেলপথের ধারে পড়িয়াছে। রেল-গাড়ীতে বসিয়া বসিয়া এই স্থান বেশ দেখা যাইতে পারে।

দিনাজপুর জেলার ঘোড়াঘাট একটি প্রাচীন প্রসিদ্ধ স্থান। জনশ্রুতি প্রকাশ করে যে, এখানে বিরাট রাজার অশ্বশালা ছিল। অশ্বগণ করতোয়া নদীর যে ঘাটে জলপান করিত, তাহার নাম ঘোড়াঘাট। ইহার অনতি-দূরে বিরাট রাজার বাড়ী। তাহার ভগ্নাবশেষ এখনও বর্ত্তমান আছে। সে স্থানের নামও "রাজা বিরাট"। বিরাটে বৈশাখ মাস ব্যাপিয়া একটি মেলা বসিয়া থাকে। এখানে করতোয়া নদী রঙ্গপুর, দিনাজপুর জেলার সীমারূপে প্রবাহিত। সুলতান নশরৎ খাঁর সময়ে ঘোড়াঘাট রাজা নীলাম্বরের রাজ্যভুক্ত ছিল। এই নীলাম্বরের রঙ্গপুর জেলার মধ্যে করতোয়া তটে একটি সুদৃঢ় দুর্গ ছিল। দুর্গের নাম ছিল "কাঁটাদুয়ার"। নীলাম্বর আসাম-কামতাপুরের শেষ রাজা। আসামের সীমায় রঙ্গমতীতে মোগল-পাঠান রাজত্বকালে একটি সেনানিবাস ছিল। সেই সেনানিবাস রাঙ্গামাটী হইতে উঠাইয়া আনিয়া ঘোড়াঘাটে স্থাপন করা হয়। দুইটি প্রবল শক্তির এক স্থানে উপস্থিতিতে পরস্পর সংঘর্ষ বাধে। সুলতান মহম্মদ শাহের রাজত্বকালে এই পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। শাহ ইশমাইল গাজি যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া ছলনাপূর্ব্বক কাঁটা-দুয়ার দুর্গ অধিকার করেন। কিন্তু শেষ যুদ্ধে বিজয়ী হইয়াও নিজে হত হইয়া সহিদ হইয়াছিলেন। ঘোড়া-

ঘাটের এক পুরাতন জীর্ণ মসজেদের নিকট একখানা শিলালিপি পাওয়া গিয়াছিল। তাহার পাঠ-উদ্ধারে জানা গিয়াছিল যে, মহমদ সাহের পুত্র মহমদ হোসেন তাহার পুত্র জয়নুদ্দীন ১১৫৩ হিঃ ঘোড়াঘাটের ফৌজদার ছিলেন। তিনি মসজেদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ১১৫৩ হিঃ সন বাঙ্গালা ১১৪৩ সালের সমান। পলাশী-যুদ্ধের এক বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে জয়নুউদ্দীন এই মসজেদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। মোগল-সাম্রাজ্যের তালিকায় ঘোড়াঘাট একটি সরকার। আইন-ই-আকবরীতে ঘোড়াঘাট সরকারের আয় প্রায় পঁচিশ লক্ষ টাকা নির্দ্দিষ্ট আছে। এই সরকার হইতে অশ্বারোহী ও পদাতিক পঁচিশ হাজার সৈন্য যুদ্ধকালে সরবরাহ করার কথা দেখা যায়। আইন-ই-আকবরী ঘোড়াঘাটের "লটকন্" ফলের বড় প্রশংসা করিয়াছেন। এখনও ঘোড়াঘাটে "লটকন্ পাওয়া যায়। সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে ঘোড়াঘাট হইতে যাবতীয় রাজস্ব-বিভাগ উঠাইয়া ঢাকা বা জাহাঙ্গীরনগরে লইয়া যাওয়া হয়। তদবধি ঘোড়াঘাটের অবনতি আরম্ভ হয়। ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানীর রাজত্বের প্রথমাবস্থায় এখানে একজন কালেক্টার নিযুক্ত হইতেন। এখন ঘোড়াঘাট একটি প্রাচীন নগরের ধ্বংসাবশেষ মাত্র। বাণিজ্যস্থান বলিয়া উত্তরবঙ্গে এখনও প্রসিদ্ধি আছে। ঘোড়াঘাটের দুই ক্রোশ দক্ষিণে "সুরা মসজেদ" গ্রাম। এখানে একটি দীঘির তীরে এক মসজেদ আছে। মসজেদটি যে কতকালের তাহা কেহ বলিতে পারে না। মস্-জেদ-গাত্রে কোনও শিলালিপি নাই। এখানে চতুষ্কোণ ৯ নয় হাত দীর্ঘে ও ৫ পাঁচ হাত প্রস্থে এবং এক হাত পুরু বিরাট একখণ্ড পাথর পড়িয়া আছে। কি প্রকারে যে এই প্রস্তর এখানে আসিল তাহা ঠিক করা সুকঠিন। হিলি ও রঙ্গপুরের পথে এই মসজেদ। নিকটে কোনও নদী নাই। দুই ক্রোশ উত্তর-দক্ষিণে করতোয়া ও তুলসীগঙ্গা নামে

নদী আছে। তুলসীগঙ্গা বর্ত্তমানে একটি সামান্য নালায় পরিণত হইয়াছে।

হেমতাবাদ এক্ষণে দিনাজপুর জেলার একটি পুলিশ-আউট-পোষ্ট। আউট-পোষ্টের অনতিদূরে একটি পুরাতন ইষ্টকের পাহাড় আছে। এই পাহাড়তুল্য স্তূপটি দেখাইয়া স্থানীয় লোকে বলে, এখানে রাজা মহেশের রাজধানী ছিল। এই স্তূপের উপর একটি মোসলমান সমাধি-মন্দির আছে। স্থানীয় লোকে বলে যে, এইটি পীর বজরউদ্দীনের কবর। বজরউদ্দীনের কবরের ছাদ ভাঙ্গিয়া পড়িয়া গিয়াছে। দেওয়ালের কতকাংশ এখনও খাড়া আছে। দরজার কপাট এখনও আছে। নানাবিধ হিন্দু-কারুকার্য্য এই কপাটে অঙ্কিত আছে। হিন্দুর ত্রিমূর্ত্তি এখনও দেখিয়া বুঝিতে পারা যায়। সম্ভবতঃ রাজা মহেশ মোসলমানকর্ত্তৃক আক্রান্ত এবং রাজ্য ও প্রাণ হারাইলে তাঁহারই প্রাসাদের উপর পীর-সাহেবের সমাধি-মন্দির গঠিত হইয়াছিল। বজরউদ্দীন সম্ভবতঃ রাজার সহিত সমরে "সহিদ" হইয়াছিলেন। সুলতান হোসেন শাহের রাজত্ব-কাল ইতিহাসে পাঠ করিলে দেখা যায়, তিনি "কামাচল" রাজ্য জয় করিয়াছিলেন। এই কামাচল রাজা মহেশের রাজ্য বলিয়া ঐতিহাসিকগণ অনুমান করেন।

ম্যাজিষ্ট্রেট ওয়েষ্টমেকট সাহেব দিনাজপুর অবস্থিতিকালে হেমতাবাদ হইতে ১২ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে একটি পুরাতন সুদৃঢ় দুর্গের ভগ্নাবশেষ বা স্তূপ দেখিয়া অনুমান করেন ইহাই "একডালা দুর্গ।" ঐতিহাসিকগণ আজ পর্য্যন্ত ইতিহাসপ্রসিদ্ধ এই "একডালার" অবস্থিতির কোনও সন্ধান পান নাই। ঐতিহাসিকগণ ওয়েষ্টমেকটের এই আবিষ্কার আজ পর্য্যন্ত কেহ গ্রহণ করেন নাই।

বংশীহারী থানার অন্তর্গত টাঙ্গন নদীর তীরে "মদন-বাটী" নামে

গ্রাম। মদন-বাটীর নাম বাঙ্গালা সাহিত্যে বা ইতিহাসে আজ পর্য্যন্ত স্থান পায় নাই। এখানে পুণ্যাত্মা জর্জ্জ উডনী সাহেবের সাহায্যে খৃষ্ট-ধর্ম্ম-প্রচারক কেরী সাহেব নীলের কুঠিয়ালরূপে ব্যাপটিষ্ট-মিশনের কার্য্য আরম্ভ করেন। ক্রমে তাঁহার পশার-প্রতিপত্তি বাড়িয়া গেল। মহামতি কেরী মদনবাটীতে একটি বাঙ্গালা ছাপাখানা স্থাপন করেন। এই ছাপাখানা ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে খোলা হইয়াছিল। ১৭৯৩ খৃঃ বাঙ্গালীর চির-স্মরণীয়। এই সনে মহাত্মা করণওয়ালিশ বাঙ্গালায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করেন। দেবীসিংহের অমানুষিক অত্যাচারে অত্যাচারিত হইয়া উত্তর-বঙ্গের সম্মিলিত প্রজাশক্তি ইজারা-প্রথার প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইয়া রাজরোষ-বহ্নিতে ঝাঁপ দিয়া এই সনে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রাপ্ত হইয়াছিল। মহাত্মা কেরী এখানে সর্ব্বপ্রথম বাইবেলের বঙ্গানুবাদ করিয়া মথিলিখিত সুসমাচার বিনামূল্যে বিতরণ করেন এবং সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গালা সংবাদপত্র (খৃষ্ট-ধর্ম্ম-সংক্রান্ত) বঙ্গদেশে প্রচারিত হয়। "শ্রীরামপুরদর্পণ" সর্ব্ব-প্রথম বাঙ্গালা সংবাদপত্র নহে। ১৮১৮ সনে শ্রীরামপুরদর্পণ প্রচার হয় এবং ১৭৯৩ সনে কেরী সাহেবের "মদনবাটী" হইতে সংবাদপত্র প্রচারিত হয়। এই কেরী সাহেবই শ্রীরামপুর মিশনরী কেরী সাহেব কি না আমরা তাহা অবধারণ করিতে পারি নাই। তবে এই কথা উত্তর বঙ্গের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ হইবার উপযুক্ত।

পুণ্যাত্মা জর্জ্জ উডনী সাহেব মালদহে কোম্পানীর অধ্যক্ষ ছিলেন। গোলাম হোসেন তাঁহারই আশ্রয়ে থাকিয়া "রিয়াজ-উস-সালাতিন" প্রণয়ন করিয়া তাঁহার নাম অমর করিয়া রাখিয়াছেন। যতদিন রিয়াজ-উস-সালাতীনের বঙ্গানুবাদ থাকিবে, ততদিন বাঙ্গালী এই উডনী সাহেবের নাম ভুলিতে পারিবে না। গোলাম হোসেন তাঁহার গ্রন্থসূচনায় উডনী সাহেবের যে প্রশংসা করিয়াছেন, তাঁহার কার্য্যকলাপ দেখিলে তাহা ঠিক

হইয়াছে বলিতে হইবে। জর্জ্জ উডনী বঙ্গদেশেই নশ্বর দেহত্যাগ করিয়া অমরধামে চলিয়া গিয়াছেন। বেঙ্গল অবিটুয়ারী (Bengal obituary) নামক গ্রন্থে উডনী সাহেবের নিম্নলিখিত স্মৃতি-চিহ্ন লেখা আছে :—

"This marble is dedicated by the trustees of the Old church to the memory of George Udny. Esqr, late of the Hon'ble Company's Bengal Civil service, and many a year member of this congregation, whose exertions in the cause of religion generally, and in the circulation of Holy scriptures particularly, will have entitled him to this token of grateful remembrance.

He died in Calcutta, October 24, A D 1830 in the 70th year of his age."

গোলাম হোসেন ১২০২ সনে পারস্যভাষায় রিয়াজ-উস-সালাতিন শেষ করেন। বৎসরাঙ্ক দ্বারা গ্রন্থের নাম হইয়াছে। জৈদপুরনিবাসী উপাধি "ছলিম"। ইহা ভিন্ন অপর আর কোনও পরিচয় উত্তরকালের লোকের জন্য রাখিয়া যান নাই। "জৈদপুরী" কথায় ঐতিহাসিকগণ গোলাম হোসেনকে অযোধ্যায় লইয়া গিয়াছেন। গোলাম হোসেন আপন বংশ মর্য্যাদার অনেক কথাই লিখিয়াছেন। কিন্তু তিনি যে বাঙ্গালী নহেন এমন কথা কোথায়ও বলেন নাই। এই জৈদপুর গ্রাম পূর্ব্বে হেমতাবাদ বিভাগে দিনাজপুর জেলার অন্তর্ভুক্ত ছিল। এখন মালদহ জেলার সামিল হইয়াছে। পাণ্ডুয়ার অতি নিকটেই জৈদপুর গ্রাম এখনও বর্ত্তমান আছে। গোলাম হোসেন বিষয়-কর্ম্ম-উপলক্ষে মালদহেই বাস করিতেন। মালদহ সহর মধ্যে চক-কোরবাণ-আলী নামক স্থানে তাঁহার সমাধি কিয়ামতের জন্য নীরবে অপেক্ষা করিতেছে। ১৮১৭ খৃঃ অব্দে গোলাম হোসেন বাঙ্গালী

নামের চিরকলঙ্ক অপনয়ন করিয়া অমর-ধামে চলিয়া গিয়াছেন। "রিয়াজ-উস-সালাতিনের" অনুকরণে ষ্টুয়ার্ট সাহেব তাঁহার বাঙ্গালার ইতিহাস লিখিয়া অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। এখন আমরা বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কোনও কথা উঠিলে ষ্টুয়ার্ট সাহেবের দোহাই দিয়া থাকি। কিন্তু গোলাম হোসেনের কথা একবারও বলি না। রিয়াজ-উস্-সালাতিন বাঙ্গালা ১৩১২ সনে ময়মনসিংহ-টাঙ্গাইল হইতে শ্রীযুক্ত রামপ্রাণ গুপ্ত মহাশয় ঐতিহাসিক উত্তর-বঙ্গের গৌরব পূজনীয় শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ের সম্পাদকতায় শেষ করিয়া যশস্বী হইয়াছেন।

চিহিল কাজির কবর গোপালগঞ্জ গ্রামের মধ্যে অবস্থিত। দিনাজপুর হইতে দারজিলিং অভিমুখে যে পথ গিয়াছে, সেই পথে চারি মাইল মাত্র যাইলেই চিহিল কাজির কবর দেখিতে পাওয়া যায়। রাস্তার পশ্চিম পার্শ্বে সামান্য দূরে হাঁটিয়া গেলেই সমগ্র সমাধি-মন্দিরটি দেখিতে পাওয়া যায়। এই পীরের সমাধি-মন্দির ৩৪ হাত দীর্ঘে হইবে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, পীর সাহেবের শরীরের দীর্ঘতানুসারেই সমাধি গঠিত হইয়াছিল। এই সমাধি-মন্দিরে একখানা প্রস্তর-লিপি আছে। বারুবের ফৌজদার পীর সাহেবের এই সমাধি-মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। বারুব একটি পরগণার নাম। দিনাজপুর ও পূর্ণিয়ার সীমা জুড়িয়া এই পরগণা এখন পূর্ণিয়ার জেলার সামিল আছে। সুলতান বারবক শাহের রাজত্ব-কালে এই সমাধি-মন্দির ৮৬৫ হিজিরী সনে নির্ম্মিত হইয়াছিল। সমাধি-মন্দিরের গাত্রলিপি আজ পর্য্যন্ত কেহ পাঠ করিতে পারেন নাই। বুকানন হ্যামিল্টন প্রস্তর-লিপির ছাপ লইয়াছিলেন বলিয়া মার্টিনের ইষ্টার্ণ ইণ্ডিয়াতে লিখিত আছে। গোপালগঞ্জের হিন্দু দেব-দেবীর মন্দির ভগ্ন করিয়া পীর সাহেবের সমাধি-মন্দির প্রস্তত হইয়াছিল। পীর সাহেবের কবরের দক্ষিণদিকের পথের পার্শ্বে ভগ্ন শিবলিঙ্গের গৌরী-

পাঠ আজও সংলগ্ন আছে। গোপালগঞ্জের শিবমন্দিরের প্রস্তর আদি ভাঙ্গিয়া আনিয়া ছাঁটিয়া ছুঁটিয়া মসজেদে লাগান হইয়াছে, তাহা খিলানের অবস্থা বিশেষ করিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিলেই যে কেহ বুঝিতে পারিবেন। পীর সাহেবদের দরগা বা মসজেদ যেখানে যেখানে প্রসিদ্ধ হিন্দু দেব-মন্দির ছিল, সেইখানেই হিন্দুধর্ম্মের চিহ্নগুলি বিলুপ্ত করিয়া ইসলাম-ধর্ম্মের পতাকাস্বরূপ মসজেদ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। গোপালগঞ্জে যে কোন্ কোন্ দেব-দেবীর মন্দির ছিল তাহা স্তূপের ইষ্টক ও প্রস্তররাশি দেখিয়া স্থির করা সুকঠিন ব্যাপার। পীর সাহেবের কবরখানার একজন মাতোয়ালী আছেন। তাঁহাকে জিজ্ঞাসাবাদে কোনও কথা জানিতে পারা যায় নাই। অজ্ঞতাবশতঃই হউক আর ইচ্ছা করিয়াই হউক মাতোয়ালী আমাদিগকে কোনও কথা বলেন নাই। মসজেদের আয় বা কত, ব্যয়ই বা কি ওয়াকফের বিধানই বা কি আমরা অনেক চেষ্টায় কিছু জানিতে পারি নাই। গোপালগঞ্জ দিনাজপুর সহরের অতি নিকটে অবস্থিত হইলেও সহরের বড় কেহ এখানে আসেন না। গোপালগঞ্জ এখন অতীতের অন্ধকারে ডুবিয়া আছে।

গছাহার একটি ক্ষুদ্র গ্রাম। দিনাজপুর জেলায় অবস্থিত হইলেও ইহার অবস্থিতি রঙ্গপুর জেলার সৈদপুর থানার নিকটে। গছাহারে নাটোর-রাজবংশের এক শাখা আসিয়া ভদ্রাসন স্থাপন করেন। রঘু-নন্দনের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র দেবীপ্রসাদ নাটোররাজ সংসারে স্থান না পাইয়া অন্যত্র যাইতে বাধ্য হন। দেবীপ্রসাদের বংশধরগণ "মুস্তফি" আখ্যায় এখন গছাহারে বসবাস করিতেছেন। এখানে দ্বাদশটি শিব মন্দিরবেষ্টিত এক ভবানীর মন্দির আছে। মন্দির-গাত্রে যে, ইষ্টকলিপি আছে, তাহা পাঠে জানিতে পারা যায় যে ১৬৬২ শকে অর্থাৎ ১৭৪০ খৃষ্টাব্দে সপুত্র রামশরণ বক্সী ইষ্টদেব সদাশিবের প্রীতির জন্য এই

মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। মন্দিরটিতে নানাবিধ কারুকার্য্য থাকিলেও সংস্কারাভাবে এখন খসিয়া পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে।

কান্তনগর দিনাজপুর রাজার অতুল কীর্ত্তি। পুরাকালে এখানে বিরাটরাজার বাড়ী ছিল। সেই বিরাটরাজের রাজপ্রাসাদের ধ্বংসাবশেষের উপর ৺কান্তজীর মন্দির ঢেঁপ নদীর তটে নির্ম্মিত হইয়াছে। বিরাটদুর্গের ধ্বংসাবশেষ এখনও শ্রীমন্দিরের সন্নিকটে জঙ্গলাকীর্ণ হইয়া আছে। ঢেঁপ নদীর অপর পারে "সনকার হাট"। এখানে পুরাকালে চাঁদ সদাগরের স্ত্রী "সনকা" ক্রয়বিক্রয় করিত। বেহুলার চরিত্র-মাহাত্ম্যে চাঁদ সদাগরের বাড়ী যেখানে সেখানে খুঁজিলে পাওয়া যায়। কান্তজী এখানকার লোকের নিকট প্রত্যক্ষ দেবতা। প্রতি বৎসর ঝুলন সময়ে কান্তজী দিনাজপুর রাজবাড়ী আগমন করেন। সেই উপলক্ষে মেলা হইয়া থাকে। রঙ্গপুর, দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, কুচবিহার, বগুড়া, রাজসাহী, মালদহ জেলা হইতে বহু লোক কান্তজীকে দেখিতে আগমন করিয়া থাকে। এই সময় রাজবাড়ীতে মহামহোৎসব হইয়া থাকে। কান্তনগরের মন্দির বঙ্গবিশ্রুত। প্রবাদ এই যে, রাজা প্রাণনাথ গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমে পবিত্র তীর্থ প্রয়াগে স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া কান্তজীর শ্রীবিগ্রহ প্রাপ্ত হইয়া দিনাজপুর আনয়ন করেন এবং দেবাদেশে কান্তনগরে সেই বিগ্রহ স্থাপিত করিয়া সেবা করিতে আরম্ভ করেন। রাজা প্রাণনাথ কান্তজীর মন্দির আরম্ভ করেন কিন্তু মন্দির সমাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই তাঁহাকে ইহধাম পরিত্যাগ করিতে হয়। ১৭০৪ খৃষ্টাব্দে মন্দিরগঠন-কার্য্য আরম্ভ হইয়া রাজা রামনাথের রাজত্বকালে ১৭৪০ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মাণ-কার্য্য শেষ হয়। রাজা রামনাথ মন্দির-গাত্রে যে খোদিত লিপি রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা পাঠে ১৩৭৪ শকও বুঝা যাইতে পারে যথা ;—

শাকে কোজি কালক্ষিতি পরিগণিতে
ভূমিপ প্রাণনাথঃ।
প্রাসাদঞ্চেতি রম্যং সুরচিত
নবরত্নাখ্যমস্মিন্নকার্ষীৎ॥
রুক্মিণ্যাকান্ত তুষ্টে সমুদিত মনসা
রমানাথেন রাজ্ঞা।
দত্ত কান্তায় কান্তস্ত তু নিজ নগরে
তাত সংকল্পসিদ্ধৈ।

দিনাজপুর নাম কেন হইল, ইহা লইয়া ঐতিহাসিকগণের মধ্যে মত-ভেদ আছে। কেহ বলেন রাজা গণেশের উপপত্নী পুত্র দিনরাজখাঁর নামে দিনাজপুর নাম হইয়াছে। কেহ বলেন, দনৌজা নামে এক রাজা ছিলেন, তাঁহার স্থাপিত রাজধানীর নাম দিনাজপুর। ওয়েষ্টমেকট বলেন, বর্ত্তমান রাজভবন যেখানে আছে, ঐ স্থানের প্রকৃত নাম দিনাজ ছিল। দিনাজ নামে এক ব্যক্তি জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া এখানে গ্রাম বসাইলে স্থানের নাম "দিনাজপুর" হইয়াছে। দিল্লীর সিংহাসনে যে সময়ে সম্রাটরূপে সুলতান ইব্রাহিমলোডি সমাসীন, গৌড়ে যখন সুলতান সমসুদ্দীন রাজদণ্ড পরিচালনা করিতেছিলেন, সেই সময়ে রাজা গণেশ নামে এক হিন্দু রাজা দিনাজপুরে স্বাধীনতার ধ্বজা উড়াইয়া স্বাধীন হিন্দুরাজত্ব স্থাপন করেন। গণেশ ও কংস এই দুই নাম লইয়া সুধী-সমাজে গোলযোগ আছে। কেহ বলেন পারস্যভাষার কাফ্ ও গাফ্ দুই অক্ষরে বড় গোলযোগ হইয়া থাকে। সেইজন্য কংস, গন্স হইয়াছে। বঙ্গভাষায়ও গণেশ রাজা বলিয়া আমরা ঈশান নাগরের অদ্বৈত-বাল্য-লীলাসূত্র দেখিতে পাই :—

"নৃসিংহ সন্ততি বলে লোকে যারে গায়॥

সেই নরসিংহ নারিয়াল বলি খ্যাতি।
সিদ্ধ শ্রোত্রিয়াখ্যা আরু ওঝার সন্ততি॥
যাহার মন্ত্রণা বলে শ্রীগণেশ রাজা।
গৌড়ীয় বাদসা মারি গৌড়ে হ'ল রাজা॥

[অদ্বৈত-বাল্যলীলাসূত্র]

রাজা গণেশের মন্ত্রী নরসিংহ নাড়িয়াল ছিলেন। এই নরসিংহ অদ্বৈত মহাপ্রভুর পিতামহ। বারেন্দ্রব্রাহ্মণ-সমাজে এই নরসিংহ এক মহা উৎপাতের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। একদিন কোন সামাজিক নিমন্ত্রণে ব্রাহ্মণগণ নরসিংহের জন্য অপেক্ষা না করিয়া ভোজনে উপবেশন করেন। নরসিংহ ব্রাহ্মণগণকে কারণ জিজ্ঞাসায় তাঁহারা বলেন যে, তিনি সর্ব্বাপেক্ষা অতি নিকৃষ্ট ব্রাহ্মণ। সুতরাং তাঁহাদের নিকট তিনি সম্মানের পাত্র নহেন জন্য কেহই তাঁহার আগমন অপেক্ষা করেন নাই। নরসিংহ এই অপমানে মর্ম্মাহত হইয়া সামাজিক সম্মানের জন্য সে স্থান হইতে প্রস্থান করেন। সেই সময়ে বারেন্দ্রসমাজের শ্রেষ্ঠ কুলীন মধুমৈত্র ছিলেন। নরসিংহ কৌশলে মধুমৈত্রের সহিত আপন দুহিতার বিবাহ দেন। তৎসূত্রে মধুমৈত্রের সহিত তাঁহার পুত্রগণের বিবাদ হইয়া বারেন্দ্র-সমাজে কাপের সৃষ্টি হয়। রাজা কংস "কাপ" কুলীনের এই বিবাদ মীমাংসা করিয়া দেন। তাহেরপুরের রাজা কংসনারায়ণ অষ্টাদশ শতাব্দীর লোক। তাঁহার এক কন্যার সহিত নাটোররাজ কালুকুমারের বিবাহ হইয়াছিল। সুতরাং ঐতিহাসিক হিন্দুরাজা কংস তাহেরপুররাজ কংস-নারায়ণ নহেন। এ সম্বন্ধে Blochmann তাঁহার contribution to the History and Geography of Bengal নামক প্রবন্ধে নিম্নলিখিত মতামত প্রকাশ করিয়াছেন :—

Raja Kans lived just a hundred years before Chai-

tanya. Raja Kans styled Raja of Bhaturia and Raja Gonesh Raja of Dinajpur. But Bhaturia does not include Dinajpur, for perganah Bhaturia lies far to the south of Dinajpur District, in Rajshahye proper, between Amrool and Bogra. But the name Bhaturia is also used in very entensive sense, and signifies northern Rajshahye proper. It thus formed the part of Barendra, whilst Dinajpur with the northern Districts formed the old division of Nivriti. Now the Barendra Brahmans say that their social clasification was made by one Raja Kansnarayan of Tahirpur in Rajshahye, and as Tahirpur belongs to Bhaturia there is just a possibility that the statement of the Barendra Brahmans may give us a clue and help us to identify the historical Raja Kans Rajshahi only refers to the Raja who was the "Sha". we know however he did not issue coins in his own name. Posthumous coins in the name of Azam Sha, during whose reign Raja Kans rose to influence, and coins in the name of Barid Sha, the latter was issued in the years 812 and 816. A. H."

আইন-ই-আকবরীতে ভাটুরিয়া পরগণার নাম নাই। প্রাচীন কোনও পুঁথি-পাঁজিতে বা মানচিত্রে ভাটুরিয়ার উল্লেখও দেখা যায় না। কেবল মাত্র রেণেল সাহেবের ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দের মানচিত্রে ভাটুরিয়া পরগণার অবস্থিতি দৃষ্ট হয়। রেণেল সাহেব ভাটুরিয়ার পশ্চিম সীমা মহানন্দা ও পুনর্ভবা নদী, দক্ষিণ সীমা পদ্মানদী, পূর্ব্বসীমা করতোয়া নদী এবং উত্তর সীমা দিনাজপুর ও ঘোড়াঘাট বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। আত্রাই নদীর উভয় তীরের যাবতীয় প্রদেশগুলি ব্যাপিয়া ভাটুরিয়ার আয়তন ছিল।

তবকত-ই-আকবরী গ্রন্থে রাজা কংসের রাজত্বের উল্লেখ আছে। রাজা কংস সাত বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। রিয়াজ-উস-সালাতিন কংসের নামই করিয়াছেন। মহামতি ওয়েষ্টমেকট রাজা কংস ও গণেশ একই ব্যক্তি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সম্ভবতঃ রাজা কংস দিনাজপুরে রাজধানী স্থাপন করায় এই গোলযোগ হইয়াছে।

নিজ দিনাজপুরে তান্ত্রিক বৌদ্ধমতের চিহ্ন এখনও আছে। কালী-তলায় মশান-কালীর মন্দিরে আজও ডোমপণ্ডিত মশান কালীর পূজা করিয়া থাকে। এখন এখানকার পুরোহিত জনৈক হাড়িজাতীয় লোক। সাধারণ উপাস্য-দেবতা-মন্দিরের পুরোহিত "হাড়ি" বঙ্গের আর কোনও স্থানে আছে কিনা আমরা অবগত নহি। দিনাজপুরের মহিষর্দ্দিনার মন্দির বহুকালের পুরাতন শক্তিমন্দির। এই মন্দির রাজা বৈদ্যনাথের মহিষী সংস্কার করিয়া দিয়াছিলেন। তাহার পর আর এ মন্দিরে রাজ-দৃষ্টি পতিত হয় নাই। অনন্তশায়ী বিষ্ণুমূর্ত্তি, মহিষমর্দ্দিনী মূর্ত্তি ও বাসুকীর মূর্ত্তির পূজা হইয়া থাকে। মন্দির-প্রাঙ্গণে মহিষারূঢ় যমের মূর্ত্তি ও বরুণ-দেবের মূর্ত্তি অযত্নে পড়িয়া আছে। মহিষমর্দ্দিনীর পূজার ব্যয়াদি দিনাজ-পুররাজ বহন করিয়া থাকেন।

সম্রাট আকবরশাহের রাজত্বকালে বিষ্ণুদত্ত নামে জনৈক উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ প্রাদেশিক কাননগো হইয়া আসিয়া দিনাজপুরে বাস করেন। বিষ্ণুদত্তের পর তাঁহার বংশীয় শ্রীমন্ত চৌধুরী সম্রাট সাহজাহানের রাজত্ব-কালে সুজার অনুগ্রহভাজন হইয়া দিনাজপুরের জমিদারী বন্দোবস্ত করিয়া লন। শ্রীমন্তের দৌহিত্রবংশীয়েরাই এখন তাঁহার উত্তরাধিকারী। মুরসীদকুলীর বন্দোবস্তের সময়ে এই বংশের রামনাথ বর্ত্তমান ছিলেন। ৮৯ পরগণায় দিনাজপুর জমিদারী; ৮৯ পরগণা ৪৬২৯৬৪ টাকা রাজস্বে বন্দোবস্ত হয়।

ইদ্রাকপুর বা বর্দ্ধনকুঠীর জমিদারীর সাতআনা অংশ দিনাজপুরের রাজস্বের সামিল হইয়াছে। বারেন্দ্র-কায়স্থ-ঢাকুর গ্রন্থে পাওয়া যায় :—

তৎপরে কহি এক দেব পরিপাটী।
আর্য্যাবর মণ্ডল বাস কৈল বর্দ্ধনকুটী॥
তার পাত্র ভগবান করিয়া চাতুরী।
রাজা ভগবান হৈতে নিল জমিদারী॥
যবে মানসিংহ রাজা বাঙ্গলাতে আইল।
নয় আনা সাত আনা ভূমি বণ্টন করিল॥

এই ঢাকুরের বর্ণনানুসারে বুঝিতে পারা যায় যে, বর্দ্ধনকুঠীরাজ ভগবানের পাত্রের (মন্ত্রীর) নাম ভগবান ছিল। এই ভগবান চাতুরী করিয়া ভগবানের যাবতীয় জমিদারী আত্মসাৎ করিয়াছিলেন। রাজা মানসিংহ যে সময়ে বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা হইয়া আসিয়াছিলেন, সেই সময়ে তিনি নয় আনা ও সাত আনা অংশে উভয় ভগবানের মধ্যে জমিদারী বিভাগ করিয়া দিয়াছিলেন। রঙ্গপুরের কালেক্টার গুড্‌ল্যাড্ সাহেব বর্দ্ধনকুঠীর জমিদারের যে ইতিহাস লিখিয়া গবর্ণমেণ্টে পাঠান, তাহাতেও ঢাকুরের কথাই সপ্রমাণ হইয়াছে। দেওয়ান ভগবানের কৃত এক বিষ্ণু-মন্দিরের ইষ্টকলিপির নিম্নলিখিত প্রশস্তি দ্বারায় তাঁহার সময় নিরূপণ করা যাইতে পারা যায়। রামপুর গ্রামে রঙ্গপুর জেলার পলাশবাড়ীর থানার মধ্যে এই বিষ্ণু-মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আজও বিদ্যমান আছে ;—

গুণাব্ধি-শরচন্দ্রেণ যুতে শাকে ভবচ্ছিদে।
ভবাব্ধি ভীতো ভগবান দদৌ শ্রীবিষ্ণবেমঠম্॥

১৫২৩ শকে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর এই মঠ নির্ম্মাণ করেন। এই অঙ্ক হইতে আমরা ১৬০১ খৃষ্টাব্দ পাইতেছি। ভগবানের পুত্র হরিরাম। শ্রীমন্তদত্তের কন্যা লীলাবতীর সহিত হরিরামের বিবাহ হয়। হরিরামের

পুত্র রাজা শুকদেব। শ্রীমন্ত চৌধুরী অপুত্রক মরিয়া গেলে তাঁহার দৌহিত্র শুকদেব তাঁহার পরিত্যক্ত বিষয়ের উত্তরাধিকারী হইলে বর্দ্ধন-কুঠীর সাত আনা সম্পত্তি দিনাজপুরের সহিত মিশিয়া যায়। মহারাজ গিরিজানাথ রায়বাহাদুর বিষ্ণুদত্ত হইতে অধস্তন একাদশ পুরুষ ব্যবধান। (Vide Golden Book of India Lethbirdge) রাজা প্রাণনাথ দিনাজপুর জমিদারীর আয়তন বৃদ্ধি করিয়াছিলেন, ঠাকুরগাঁ মহকুমার উত্তরে একজন রাজা ছিলেন। তাঁহার রাজধানী দুর্গাপুর নামক গ্রামে ছিল। রাজা প্রাণনাথ যুদ্ধে তাহাকে পরাজয় করিয়া তাঁহার জমিদারী দিনাজপুরের রাজ্যভুক্ত করিয়া লন। রাজা প্রাণনাথের সময় দুইজন কবি একত্রে "পদ্মাপুরাণ" কাব্য রচনা করেন; কবিদ্বয়ের নাম জগজ্জীবন ঘোষাল ও দ্বিজ কালিদাস। কবিদ্বয় নিম্নলিখিত ভাবে আত্ম-পরিচয় রাখিয়া গিয়াছেন :—

চৌধুরী অনুপরায়, সর্ব্বদেশে জয় গায়,
জয়ানন্দ দ্বিজের নন্দন।
তারপুত্র ঘনশ্যাম, তারপুত্র অনুরাম,
বিরচিল জগত জীবন ॥

(২)

ঘোষাল-ব্রাহ্মণ রাঢ়ী, কোচআ মোড়াত বাড়ী,
প্রাণনাথ নরপতি দেশে।
বন্দিয়া মনসা পায়, জগত-জীবন গায়,
পুরাণ সমাপ্ত তার শেষে ॥

(৩)

গোলকনাথের পদ-পঙ্কজ স্মরণে।
মনসা মঙ্গল দ্বিজ কালিদাস ভণে ॥

কবি কালিদাসের "কালীবিলাস" নামে একখানি কাব্য আছে। কাব্যখানির নাম "দেবী-যুদ্ধ" বলিলেই সহজে বুঝিতে পারা যায়। আজ পর্য্যন্ত গোলকনাথের কোনও সন্ধান করিতে আমরা পারি নাই।

রাজা প্রাণনাথের পর রাজা রামনাথ রাজা হন। রাজস্ব-বিষয়ে রঙ্গপুরের ফৌজদার সৈয়দ মহম্মদ খাঁর সহিত তাঁহার মনোমালিন্য হওয়ায় ফৌজদার দিনাজপুর রাজধানী আক্রমণ করেন। অর্দ্ধপথে রাজসৈন্য ও ফৌজদারসৈন্যের সংঘর্ষ হয়। রাজা রামনাথ মহাবীরত্বের সহিত স্বয়ং সৈন্য পরিচালনা করেন। যুদ্ধে কাহারও জয়পরাজয় হয় না। ফৌজদার অবশেষে রাজা রামনাথের সহিত আপোষে সকল বিবাদ নিষ্পত্তি করিয়া চলিয়া যান। এই বিবাদের ফলে রাজস্বসম্বন্ধে রঙ্গপুরের সহিত দিনাজপুরের সকল সম্বন্ধ বিয়োজিত হয়। রাজা রামনাথ নবাব সরকারে পাঁচ লক্ষ টাকা নজর দিয়া তাঁহার নাম জারি করিয়াছিলেন। রাজা রামনাথ দিল্লী হইতে রাজত্বের সনন্দ পাইয়াছিলেন। রাজা রামনাথের পর বৈদ্যনাথ রাজা হন। তিনি বড়ই স্বধর্ম্মপালক ছিলেন। দিনাজপুর জেলার মধ্যে বহু দেব-মন্দিরের সংস্কার করাইয়াছিলেন। রাজা বৈদ্যনাথের পর রাজা রাধানাথ রাজা হন। তাঁহার নাবালককালে রাজ মাতা রাজ কার্য্য পরিচালনা করিতেন। এই সময় ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর পক্ষ হইতে দেবীসিং দিনাজপুর রাজার দেওয়ান ও অভিভাবক নিযুক্ত হইয়া পূর্ণিয়া হইতে আইসেন। পরে দেবীসিংহই রঙ্গপুর দিনাজপুর রাজস্বের ইজারদার হইয়া নিজ অত্যাচারকাহিনীতে বার্কের বাগ্মিতায় অমর হইয়া গিয়াছেন। রাজা রাধানাথ প্রাপ্তবয়স্ক হইলে যখন শুনিলেন যে, দেবীসিংহের যাবতীয় অত্যাচারের জন্য গবর্ণর হেষ্টিংস্ মহোদয় বিলাতে নির্জ্জিত হইতেছেন, তখন তিনি কালেক্টারের হাত দিয়া তাঁহার নির্দ্দোষিতার প্রমাণ রঙ্গপুর দিনাজপুরের যাবতীয়

জমিদারের দস্তখতযুক্ত এক দরখাস্ত বিলাতে প্রেরণকরেন। রাধানাথের পর হইতেই দিনাজপুর রাজের রাজশক্তি খর্ব্ব হইয়া যায়। রাজা গোবিন্দনাথ ও তৎপুত্র তারকনাথ কেবল মাত্র নামে রাজা ছিলেন। দিল্লীর দরবারে পুরাতন রাজ সনন্দ প্রভৃতি তলপ হইলে রাজবাড়ী হইতে বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী সেগুলি লইয়া নৌকাপথে রওনা হয়। পথে নবদ্বীপের নিকট নৌকাডুবি হওয়ায় সেগুলি নষ্ট হইয়া যায়। তারকনাথের পর মহারাজা বাহাদুর গিরিজানাথ উত্তর বঙ্গের প্রাচীন রাজাসনে উপবিষ্ট হইয়া দিনাজপুর রাজসম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিয়া প্রতিপত্তি স্থাপন করিয়াছেন।

দিনাজপুর রাজবংশের অপর শাখা "রায় সাহেব" নামে খ্যাত। হরিরামের অপর ভ্রাতার নাম হরিনারায়ণ ছিল। ভ্রাতা হরিরাম শ্রীমন্ত দত্ত চৌধুরীর কন্যার পাণিগ্রহণে দিনাজপুর বাস করিলে হরিনারায়ণও ঐ সঙ্গে দিনাজপুর আইসেন। হরিনারায়ণের পৌত্র রামকান্ত হইতে রায়সাহেব বংশের উৎপত্তি। রামকান্ত অসাধারণ কর্ম্মনিষ্ঠ লোক ছিলেন, এবং কার্য্যকুশলতায় অনেক জমিদারী অর্জ্জন করেন। প্রবাদ যে, এক সময় পরমবৈষ্ণব কাশীনাথ মহন্ত তাঁহার অন্তিমদশায় শিষ্য রামকান্তকে তাঁহার যাবতীয় দেবসম্পত্তি দান করিতে চাহিলে রামকান্ত প্রত্যাখ্যান করেন। কাশীনাথের সমাধি রাজবাড়ীর দেবমন্দিরে অবস্থিত আছে এবং এখনও তাহার পূজা ও ভোগ হইয়া থাকে। পরমবৈষ্ণব রামকান্ত দেবসেবা-কার্য্য গ্রহণ না করায় শ্রীমন্ত দত্ত চৌধুরী তাহা গ্রহণ করিয়াছিলেন। রায় রাধাগোবিন্দ রায়সাহেব পরমবৈষ্ণব ও সাধু বলিয়া সর্ব্বত্র পরিচিত।

শ্রীকালীকান্ত বিশ্বাস।

দিনাজপুরের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

ভূমিকা

প্রত্যেক জাতিরই একটি ইতিহাসাতীত অবস্থা আছে। এই যুগের বিবরণ কেবলমাত্র প্রবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রবাদ কেবলমাত্র কল্পিত উপকথা নহে; ইহার ভিতর নিশ্চয়ই কিয়ৎপরিমাণে সত্যের অংশ আছে। রাশীকৃত অসংবদ্ধ প্রবাদ হইতে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ঐতিহাসিক প্রণালীতে সূক্ষ্ম বিচার দ্বারা সত্যকণা আবিষ্কার করা প্রত্যেক ইতিহাস লেখকেরই কর্ত্তব্য কার্য্য। দিনাজপুর সম্বন্ধে যে সব প্রবাদ প্রচলিত আছে, তাহার সত্যাসত্যতা সম্যগ্‌ভাবে নির্দ্ধারণ করিতে পারি নাই।

এই প্রবন্ধ কোন মৌলিকতার দাবী করে না। পুস্তকাদি পাঠ করিয়া যাহা সত্য বলিয়া হৃদয়ঙ্গম করিয়াছি, তাহাই সহজ ভাষায় লিপিবদ্ধ করিতে চেষ্টা করিয়াছি।

সূচনা

কোন সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক বলিয়াছেন—"মুসলমান শাসন প্রবর্ত্তিত হইবার পূর্ব্বকালবর্ত্তী বরেন্দ্র মণ্ডলের ইতিহাসের মধ্যেই সমগ্র বঙ্গবাসীর ইতিহাসে মূল সূত্রের সন্ধান লাভের আশা করা যাইতে পারে।" দিনাজপুর এই প্রাচীন বরেন্দ্র-ভূমির একটি প্রধান অংশ; সুতরাং দিনাজপুরের ইতিহাস সমগ্র বাঙ্গালার ইতিহাসের সহিত দৃঢ়ভাবে সংবদ্ধ। এই দিনাজপুর প্রাচীন হিন্দু স্থপতিবিদ্যার কেন্দ্রভূমি ছিল। আমরা মালদহের হিন্দু ও মুসলমান রাজগণের কীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হই; কিন্তু ইহা আমাদিগের স্মরণ রাখা উচিত যে মালদহের অনেক কীর্ত্তিরত্ন দিনাজপুরের বাণনগরের প্রস্তরাবলী দ্বারা

নির্ম্মিত। সুতরাং স্থপতিবিদ্যার দিক্ হইতেও দিনাজপুরের ইতিহাস বঙ্গবাসীর কৌতূহল-জনক।

ইতিহাসের তিনটি যুগ

ঐতিহাসিক উপাদানের প্রামাণ্য ও অপ্রামাণ্য অনুসারে প্রত্যেক জাতির ইতিহাসকে তিনভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। ইতিহাসের প্রথম ও সর্ব্বনিম্ন অবস্থা পৌরাণিক-যুগ। এই যুগের ইতিহাস শুধু অপ্রমাণিত প্রবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। দ্বিতীয় অবস্থাকে আমরা অর্দ্ধ ঐতিহাসিক-যুগ নামে অভিহিত করিতে পারি। এই যুগের ইতিহাসের প্রধান উপাদান প্রবাদ বাক্য ও তৎসমর্থক স্মৃতিস্তম্ভ, উৎকীর্ণ প্রস্তর-লিপি ও তাম্রশাসন। তৃতীয় অবস্থাতে আমরা প্রকৃত ইতিহাস প্রাপ্ত হই। এই সাধারণ নিয়মানুসারে আমরা দিনাজপুরের ইতিহাসকে বিভক্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছি।

প্রথম অধ্যায়

পৌরাণিক-যুগ

এই যুগের ইতিহাস আলোচনা করিতে গেলে আমাদিগকে শুধু অপ্রমাণিত প্রবাদ-বাক্য ও উপকথার উপর নির্ভর করিতে হইবে। দিনাজপুরে একটি কিংবদন্তী প্রচলিত আছে যে, এই জেলা পূর্ব্বে ভগবান

পরশুরাম

বিষ্ণুর ষষ্ঠাবতার পরশুরামের রাজ্যান্তর্গত ছিল। বগুড়া জেলার মহাস্থানে এই পরশুরামের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত ছিল। তাঁহার পর দিনাজপুরের প্রাচীনত্ব প্রমাণের জন্য কিংবদন্তী, স্রোতস্বতী করতোয়ার উপর তর্পণঘাটকে (নবাবগঞ্জ থানার অধীন) বাল্মীকির নিত্য-নৈমিত্তিক ধর্ম্ম-কার্য্য ও অবগাহনের স্থান বলিয়া

নির্দ্দেশ করিয়াছে; ইহার নিকটবর্ত্তী সীতাকোট্ নামে পরিচিত একটি ইষ্টকের স্তূপকে রাম কর্ত্তৃক নির্ব্বাসন-কালে সীতাদেবীর বাসস্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয়।

বাল্মীকি

তাহার পর আমরা শৈব বলিরাজার সম্বন্ধে অনেক কথা শুনিতে পাই। বিষ্ণুর অষ্টমাবতার কৃষ্ণের সহিত এই বলিরাজার পুত্র সহস্রবাহু মহা-পরাক্রান্ত বাণরাজার এক মহাযুদ্ধ হইয়াছিল, ইহা সকলেই জানেন। ইহা কথিত হইয়া থাকে যে, যুদ্ধের সময় এই জেলা সর্ব্বপ্রথম শিবজ্বর বা ম্যালেরিয়া দ্বারা আক্রান্ত হয়। বর্ত্তমান গঙ্গারাম-পুর থানা এই বাণরাজার কীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ দ্বারা পরিপূর্ণ। পুনর্ভবা নদীর পূর্ব্বতীরস্থ বাণনগর নামক স্থানে একটি নগরের ও তৎসন্নিহিত রাজ-প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ দেখা যায়। কথিত আছে, এই বাণ নগরেই পরাক্রমশালী মহাবীর বাণ বাস করিতেন। বাণ-নগরে অমৃতকুণ্ড ও জীবৎকুণ্ড নামে দুইটি দীর্ঘিকা দেখিতে পাওয়া যায়। এই দীর্ঘিকা দুইটি শিব তাঁহার প্রধান উপাসক বাণকে দান করিয়াছিলেন। কথিত আছে, পূর্ব্বে ইহাদের জলের জীবনী শক্তি বৃদ্ধি ও অমরত্ব প্রদান করিবার ক্ষমতা ছিল। গঙ্গারামপুর থানার দক্ষিণে দ্বিতীয় ও ষষ্ঠ মাইলের মধ্যে যথাক্রমে কালদীঘি ও তপনদীঘি নামক দুইটি দীঘি দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথম দীঘিটি বাণরাজ-মহিষী কালরাণী কর্ত্তৃক ও দ্বিতীয়টি স্বয়ং বাণরাজের আজ্ঞানুসারে খনিত হইয়াছিল। এই বাণরাজার কীর্ত্তি-কলাপের ভগ্নাবশেষ নবাবগঞ্জ থানার জঙ্গলেও দেখিতে পাওয়া যায়। প্রবাদ আছে, তপন-দীঘির পূর্ব্বে করদাহ নামক একটি স্থানে কৃষ্ণ কর্ত্তৃক কর্ত্তিত বাণ-রাজার ৯৯৮টি বাহু দাহ করা হয়।

বাণরাজ

যদিও বর্ত্তমান প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ জয়পুর রাজ্যের সন্নিহিত স্থানকে মৎস্য-

দেশ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন, তথাপি দিনাজপুর মৎস্যদেশ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। দিনাজপুর মৎস্যরাজ বিরাটরাজের উত্তর গো-গৃহ বলিয়া অভিহিত হয়। আজও কান্তনগরে বিরাটরাজ-নির্ম্মিত দুর্গের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। প্রবাদ আছে, এইস্থানে বিরাটরাজা স্বীয় গো-রক্ষার্থ এই দুর্গ ও ঘোড়াঘাটের নিকট অশ্বরক্ষার্থ আর একটি দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ঘোড়াঘাট থানার ৯ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে বিরাটের রাজ-প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। মধ্যম পাণ্ডব মহাবীর ভীম এই দেশে পদার্পণ করিয়াছিলেন বলিয়া একটি প্রবাদ অতিশয় প্রবল আছে। তাহার প্রমাণ-স্বরূপ স্থানীয় লোক সকল বর্ত্তমান পার্ব্বতীপুরের সন্নিহিত একটি স্থানে কতকগুলি কৃষি-কার্য্যের অস্ত্রকে ভীমের অস্ত্র বলিয়া উল্লেখ করে। কান্তনগরের নিকট বীরগঞ্জের পূর্ব্বদিকে শোঙ্কানামক স্থানে চাঁদ-সদাগরের বাসস্থান ছিল বলিয়া একটি প্রবাদ আছে।

বিরাটরাজ

মধ্যম পাণ্ডব ভীম

চাঁদ-সদাগর

দ্বিতীয় অধ্যায়

মধ্য-যুগ—খৃঃ ৪র্থ শতাব্দী হইতে নবম শতাব্দী।

গুপ্তরাজগণ ও তৎকাল-পরবর্ত্তী নৃপতিগণ।

গুপ্ত-রাজগণের সময় হইতেই বঙ্গের ইতিহাসের মধ্য-যুগ আরম্ভ হয়। কিন্তু এই গুপ্ত-রাজগণের কোন কীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ আমরা বরেন্দ্র-ভূমিতে দেখিতে পাই না। তাঁহাদিগের দিগ্বিজয়ের বিবরণ রক্ষার্থ উৎকীর্ণ প্রস্তরলিপি হইতে উক্ত রাজগণ কর্ত্তৃক বঙ্গদেশ অধিকারের কথা জানিতে পারি। ৩২০ খৃষ্টাব্দে মগধে এক মহাসাম্রাজ্য স্থাপিত হইয়াছিল। চন্দ্রগুপ্ত এই সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। তৎপুত্র সমুদ্রগুপ্ত স্বীয় ভুজবলে বঙ্গভূমি

অধিকার করেন। "সমতট (বঙ্গ) ব্যতীত পুণ্ড্র ও রাঢ় প্রভৃতি বাঙ্গালার অপরাপর অংশ সম্ভবতঃ খাস গুপ্তরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল।"

সমুদ্রগুপ্ত

ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগে যশোধর্ম্ম বিষ্ণুবর্দ্ধন হূনগণকে পরাভূত করিয়া অতিশয় পরাক্রমশালী হন। সম্ভবতঃ এই যশোধর্ম্মন গুপ্ত-রাজগণের করদ-রাজ ছিলেন। কিন্তু তিনি স্বীয় বীর্য্যবলে "ব্রহ্মপুত্র (লৌহিত্য) নদের উপকণ্ঠ হইতে আরম্ভ করিয়া কলিঙ্গ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগ" জয় করিয়াছিলেন। এই সকল স্থান জয় করিবার নিমিত্ত তাঁহাকে নিশ্চয়ই বরেন্দ্র ভূমিতে সৈন্য পরিচালনা করিতে হইয়াছিল। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই রাজগণের সময় বরেন্দ্র ভূমির কোন বিশেষ বিবরণ পাই না। ৭৮৪ খৃষ্টাব্দের পর গুর্জ্জরের প্রতিহার-বংশীয় রাজা বৎস-রাজ বঙ্গদেশ অধিকার করেন। এই বৎস-রাজের পরবর্ত্তী পাল রাজগণের সময় হইতেই আমরা সমগ্র বরেন্দ্র ভূমির অনেক বিবরণ জানিতে পারি (১)।

যশোধর্ম্ম বিষ্ণুবর্দ্ধন
ষষ্ঠ শতাব্দী

তৃতীয় অধ্যায়

পালরাজত্ব—সম্ভবতঃ নবম শতাব্দী হইতে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ।

পাল নরপতিগণ।

পালবংশের প্রতিষ্ঠাতা মহারাজ শ্রীগোপালদেব কয়েকটি স্বাধীন নরপতিকে পরাস্ত করিয়া বঙ্গের একচ্ছত্র-অধিপতি হন। এই পালরাজগণ যে বঙ্গের অধিবাসী, তাহাদের জন্মভূমি যে এই বঙ্গদেশ, তাহা আধুনিক ঐতিহাসিকগণ স্থির করিয়া-

শ্রীগোপালদেব

---

(১) আইনী-আকবরীতে লিখিত আছে, পাল নরপতিগণ আদিশূর রাজবংশের ও বল্লাল সেনের রাজবংশের মধ্যবর্ত্তী সময়ে বঙ্গদেশ শাসন করেন।

ছেন। দিনাজপুর জেলায় পত্নীতলা থানার অধীনে মঙ্গলবাড়ী নামক স্থানের নিকট একটি প্রস্তর স্তম্ভে পাল নরপতিগণের বংশ-বিবরণ পাওয়া যায়। এই স্তম্ভটি প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের নিকট "বাদল-স্তম্ভ" বলিয়া পরিচিত। ইহা নিকটস্থ গ্রামবাসিগণের নিকট ভীমের পাণ্টী নামে বিখ্যাত। ইহাতে শূরপাল, নারায়ণপাল ও দেবীপাল প্রভৃতি পালবংশের প্রধান নরপতি-গণের নাম বিশেষ ভাবে উল্লিখিত দেখা যায়। কিন্তু আজ-কাল বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির অক্লান্ত পরিশ্রমে ও যত্নে আমরা আরও অনেক পাল নরপতিগণের বিবরণ পাইয়াছি। ইহার জন্য ঐ সমিতি বঙ্গবাসীর বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র।

মহাবীর শ্রীগোপালের মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র ধর্ম্মপাল পিতৃ-সিংহাসনে আরোহণ করিয়া সার্ব্বভৌম পদ লাভের জন্য যত্ন করেন। ধর্ম্মপালের পুত্র দেবপাল পিতৃ-সিংহাসনে আরোহণ করিয়া পিতা-পিতামহের কীর্ত্তি অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। মহা-রাজ দেবপাল দেবের অধীনেই তাঁহার "বিজয়-সেনানী হেলায় লঙ্কা" জয় করিয়াছিল (১)। দেবপাল দেবের ন্যায় মহাপরাক্রান্ত নরপতির পক্ষে প্রাগ্‌জ্যোতিষপতি ও উৎকলপতিকে পরাজয় করা খুব সহজই হইয়াছিল। দেবপালের পর যথাক্রমে বিগ্রহ-পাল, নারায়ণপাল প্রভৃতি পালবংশীয় রাজন্যবর্গ গৌড়মণ্ডল শাসন করিয়া-ছিলেন। এই পালবংশের নৃপতিগণের মধ্যে মহারাজ শ্রীমহীপালদেবের নামই দিনাজপুরের সহিত বিশেষভাবে জড়িত। "শ্রীমহীপালদেব বাহু-বলে যুদ্ধে সকল বিপক্ষকে নিপাতিত করিয়া অনধিকারী কর্ত্তৃক বিলুপ্ত পিতৃ-রাজ্যের উদ্ধার সাধন করিয়া ভূপালগণের মস্তকে চরণ স্থাপন করিয়াছিলেন।" মহীপালের পূর্ব্বে তাঁহার পিতা দ্বিতীয় বিগ্রহপাল

ধর্ম্মপাল

দেবপাল

(১) Taylor's History of India—p. 65.

"কাম্বোজবংশীয় গৌড়পতি" দ্বারা রাজ্য ভ্রষ্ট হইয়াছিলেন। দিনাজপুর এই শেষোক্ত নরপতির লীলাভূমি। এই কাম্বোজদেশটি কোথায়, তাহা লইয়া মতভেদ থাকিলেও গৌড়রাজমালা-লেখক শ্রদ্ধেয় রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় ফরাসী পণ্ডিত ফুসের মত সমর্থন করিয়া কাম্বোজদেশকে তিব্বতদেশের নামান্তর মাত্র বলিয়াছেন। এই কাম্বোজরাজ ৮৮৮ শকাব্দে (৯৬৬ খৃঃ) একটি শিব-মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এই মন্দিরের একটি প্রস্তর-স্তম্ভ বর্ত্তমান দিনাজপুরাধিপতির উদ্যানে রক্ষিত হইয়াছে। এই স্তম্ভেই কাম্বোজ-রাজের শিব-মন্দির নির্ম্মাণের কথা উল্লিখিত আছে। "বরেন্দ্রদেশ (বিশেষতঃ দিনাজপুর) কাম্বোজরাজের পদানত হইয়াছিল, ইহা নিঃসন্দেহে মনে করা যাইতে পারে। কারণ, বরেন্দ্রের কেন্দ্র-স্থলেই—দিনাজপুরের অন্তর্গত বাণ-নগরেই তাহার কীর্ত্তি-চিহ্ন পাওয়া গিয়াছে; এবং বরেন্দ্র দেশের অনেকস্থানে যে কতক পরিমাণে তিব্বতীয় বা মোঙ্গলীয় আকারের কোচ, পলিয়া, রাজবংশী প্রভৃতি "অর্দ্ধ হিন্দু" জাতি দেখা যায়, ইহারা গৌড়পতির অনুচরগণের বংশধর বলিয়াই মনে হয়।" কাম্বোজদেশীয় নরপতিগণের হস্ত হইতে পিতৃ-রাজ্য উদ্ধার করা মহীপালের প্রধান কীর্ত্তি। কোন্ খৃষ্টাব্দ হইতে মহীপাল রাজ্যপালন করেন, এই সম্বন্ধে ঐতিহাসিকগণের মতানৈক্য দেখা যায়। Dinajpur District Gazetteer প্রণেতা সিভিলিয়ান Mr. F. W. Strong ৮৫৬ খৃষ্টাব্দ মহীপালের রাজত্বকাল বলিয়া স্থির করিয়াছেন। কিন্তু গৌড়রাজমালা লেখক মহীপালকে প্রসিদ্ধ বিগ্রহ ভগ্নকারী সুলতানমামুদের সম-সাময়িক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহার মতে মহীপালের রাজত্বকাল ৯৮০ হইতে ১০৩২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত। Mr. Strongএর পক্ষে প্রধান সাক্ষী নালন্দায় প্রাপ্ত উৎকীর্ণ প্রস্তর-

কাম্বোজরাজ

মহীপাল

লিপি। শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় ১০২৬ খৃষ্টাব্দের সারনাথে প্রাপ্ত প্রস্তরলিপি হইতে মহীপালের রাজত্বকাল স্থির করিয়াছেন। ঐতিহাসিক Hamiltonও শেষোক্ত মত সমর্থন করিয়াছেন। এখন এ বিষয়ে কি মীমাংসা হইতে পারে তাহা সুধীগণ স্থির করিবেন। রাজা মহীপাল প্রথমে অতি দুর্দ্ধর্ষ ও পরাক্রান্ত নৃপতি ছিলেন। মৌর্য্যরাজ অশোকের জীবনের সহিত তাঁহার জীবনের অনেক সাদৃশ্য দেখা যায়। পূর্ব্ব-জীবনে কলিঙ্গ জয় ও পিতৃরাজ্যের উদ্ধার সাধন করিবার সময় নর-শোণিত দেখিয়া তাঁহার মনে বৈরাগ্যের ভাব উদিত হয়। সেই সময় তিনি যুদ্ধ-বিগ্রহ পরিত্যাগ করিয়া পরহিতকর কার্য্যে ব্রতী হইলেন। শ্রীমহীপালদেবের কীর্ত্তি-কলাপ দিনাজপুর জেলার দক্ষিণ-পশ্চিমদিকে বেশী দেখা যায়। এই জেলার বংশীহারি থানার অন্তর্গত "মহীপালদীঘি" ও মুর্শিদাবাদ জেলার "সাগরদীঘি" মহারাজ মহীপাল দ্বারা খনিত হইয়াছিল: দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত "মহী-সন্তোষ", বগুড়া জেলার "মহীপুর" ও মুর্শিদাবাদ জেলার "মহীপাল"—এই তিনটি সুবৃহৎ নগরের ধ্বংসাবশেষ মহীপালের নামের সহিত জড়িত রহিয়াছে। মহীপাল নিজ রাজ্যান্তর্গত বারাণসী-ধামে ঈশান (শিব) ও চিত্র-ঘণ্টার (দুর্গা) মন্দিরাদি প্রতিষ্ঠা করাইয়াছিলেন। বারাণসীধামকে সৌধ-মালায় সজ্জিত করিতে গিয়া এমন তন্ময় হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, বিগ্রহভগ্নকারী রাক্ষস সুলতানমামুদের হস্তহইতে অন্যান্য তীর্থ-ক্ষেত্রের কীর্ত্তি-রত্নের রক্ষার্থ কোন চেষ্টা করিবারও তাঁহার অবসর ছিল না। তাঁহার এইরূপ অত্যধিক শান্তিপ্রিয়তাই পাল-রাজ্যের, তথা ভারতবর্ষের হিন্দু-রাজ্যের অধঃপতনের মূল বলা যাইতে পারে।

মহীপালের পর যথাক্রমে তাঁহার পুত্র নয়পাল ও পৌত্র তৃতীয় বিগ্রহ-পাল ও প্রপৌত্র দ্বিতীয় মহীপাল গৌড়মণ্ডলের অধিপতি হন। এই শেষোক্ত নরপতি দ্বিতীয় মহীপাল সিংহাসন লাভ করিয়া দুষ্কার্য্যে রত

হইয়াছিলেন। তিনি তাঁহার অনুজদ্বয়কে (শূরপাল ও রামপালকে) লৌহশৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়া কারাগারে নিক্ষেপ করেন।

দ্বিতীয় মহীপাল

দ্বিতীয় মহীপালের অত্যাচারে প্রজাগণ বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। প্রজাগণ কৈবর্ত্তপতি দিব্বোক বা দিব্যককে অধিনায়ক করিয়া মহীপালকে নিধন করতঃ কৈবর্ত্তরাজকে গৌড়মণ্ডলের রাজা বলিয়া ঘোষণা করিল। দুরাচার দ্বিতীয় মহীপালের কনিষ্ঠ ভ্রাতা পূর্ব্বকথিত রামপাল এই দিব্যকের বংশধরকে পরাজিত করিয়া স্বীয় পিতৃসিংহাসনের উদ্ধার সাধন করেন। প্রজাবিদ্রোহের অবসানে রামপাল "রামাবতী" নামে এক নূতন নগর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এই

রামপাল

"রামাবতী" নগরটি কোথায় তাহা লইয়া প্রত্নতত্ত্ব-বিদ্‌গণের মধ্যে মতদ্বৈধ দেখা যায়। প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু "রামাবতীকে" দিনাজপুর জেলার একটি স্থান বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। রামপালের পর হইতে পালরাজ্যের অধঃপতন আরম্ভ হয়। পালবংশের শেষ নৃপতি মদনপালকে তাঁহার দুষ্টা

মদনপাল

পত্নী মন্ত্রীর সহযোগে বিষপ্রয়োগে হত্যা করিয়াছিলেন। এই মদনপালের শূরসেন নামক একজন সেনাপতি ছিলেন। শূরসেন মদনপালের রাণীকে ও তাহার উপপতিকে অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া গৌড়মণ্ডলের রাজা হন। এই শূরসেন হইতেই সেন রাজবংশের উৎপত্তি। কথিত আছে, পালরাজগণের অন্যান্য বংশধরগণ সেনরাজ কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়া কামরূপাভিমুখে প্রস্থান করেন।

চতুর্থ অধ্যায়

সেন-রাজবংশ।

সেন রাজ্য গৌড়, বরেন্দ্র, বঙ্গ, বগ্‌ড়ি, রাঢ় এবং মিথিলা এই ছয়টি প্রদেশে বিভক্ত ছিল। সেনরাজগণের প্রতাপ এই দিনাজপুর জেলায়

বহুকাল স্থায়ী হয় নাই, ইহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে। সেনরাজ-গণের রাজ্যের বিস্তৃতি বরেন্দ্রভূমির উত্তরে খুব অল্প দূরই হইয়াছিল। কারণ তৎসময়ে দমদমা নামক স্থানে মুসলমানগণের একটি সেনানিবাস প্রতিষ্ঠিত ছিল। সুতরাং এই জেলায় সেনরাজগণের কীর্ত্তি-চিহ্ন দেখিতে না পাওয়া আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। পূর্ব্বকথিত দমদমা গ্রামটি দিনাজপুরের দক্ষিণে পুনর্ভবা নদীর উপর অবস্থিত।

পঞ্চম অধ্যায়

মুসলমান-রাজত্ব—আফগান নরপতিগণ।

বক্তিয়ার খিলিজি লক্ষ্মণসেনের রাজধানী নবদ্বীপ ধ্বংস করিয়া গৌড়ে তাঁহার রাজধানী স্থাপন করিলেন। বক্তিয়ার খিলিজির পরে প্রায় ১৫০ শত বৎসর কাল পর্য্যন্ত গৌড়ের মুসলমান নবাবগণ কেবলমাত্র দিল্লীর বাদশাহের রাজপ্রতিনিধি ছিলেন। কিন্তু রাজধানী দিল্লী হইতে বঙ্গদেশ বহুদূরে অবস্থিত বলিয়া আলাউদ্দীন নামক এক নবাব স্বাধীন ভাবে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করিলেন। মুসলমান নবাবগণের মধ্যে বাদসাহকে কর দিতে তিনি সর্ব্বপ্রথমে অস্বীকার করেন। নবাব আলাউদ্দিন ১৩৪০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৩৪২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিলে পর তাঁহার উত্তরাধিকারী নবাব

বক্তিয়ার খিলিজি

সামসুদ্দিন দিল্লীর বাদসাহ ফিরোজসাহ তোগলক কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া ঘোড়াঘাটে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। তাহার পর বাদসাহের সহিত নবাবের সন্ধিস্থাপন হইলে, বাদসাহ দিল্লীতে ফিরিয়া যান।

সামসুদ্দীন

যদিও পাঠানগণের আগমনে একচ্ছত্র-হিন্দু-সাম্রাজ্য বঙ্গদেশ হইতে কিছুকালের জন্য তিরোহিত হইল, তথাপি হিন্দুগণের বাহুবল তথনও

ক্ষীণ হয় নাই; তখনও বাঙ্গালী "ভেতো বাঙ্গালী" বলিয়া জনসমাজে পরিচিত ছিল না। তৎকালে হিন্দুগণের বুদ্ধিতেই মুসলমান নবাবগণ পরিচালিত হইতেন। বাঙ্গালী বীরগণ তখনও পাঠান সেনার উৎকৃষ্ট অধিনায়ক বলিয়া সম্মানিত হইতেন। তাঁহাদিগের বাহুবলের উপরেই নবাবগণ সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতেন। রাজা কংসরাম, সুবুদ্ধি খাঁ ইঁহারা মুসলমান নবাবগণের দক্ষিণহস্ত স্বরূপ ছিলেন। কিন্তু চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষভাগে হিন্দুনরপতিগণ এতই প্রবল পরাক্রান্ত হইয়া উঠিলেন যে, তাহারা রাজা গণেশের অধিনায়কত্বে নবাব সামসুদ্দিনকে পরাজিত করিয়া রাজা গণেশকে গৌড়ের সিংহাসনে বসাইলেন। আবার হিন্দু-রাজত্ব কিছুকালের জন্য প্রতিষ্ঠিত হইল। রাজা গণেশ সম্বন্ধে

রাজা গণেশ

ঐতিহাসিকগণের মতদ্বৈধ দেখা যায়। Hamilton ও Westmacott প্রভৃতি ইংরেজ ঐতিহাসিকগণ গণেশকে "দিনাজের রাজা" বলিয়াছেন। ইহাদিগের মতে রাজা গণেশ দিনাজপুর রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। কিন্তু অন্যান্য ঐতিহাসিকগণের মতে গণেশ একটাকিয়ার জমীদার বা রাজা ছিলেন।[১] Stewart সাহেব রাজা গণেশকে ভাতুড়িয়ার জমাদার বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। Elphinstone তাঁহাকে Kans নামে অভিহিত করিয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ে রাজা গণেশ কি জাতি এবং কোন দেশের রাজা ছিলেন, তাহা লইয়া একটা আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে। এই আলোচনা শেষ না হইলে আমরা এ সম্বন্ধে কিছু বলিতে অসমর্থ। রাজা গণেশ হিন্দু ও মুসলমান উভয় জাতিরই প্রিয়পাত্র ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর শব দেহ লইয়া হিন্দু ও মুসলমানগণের মধ্যে ঝগড়া হইবার উপক্রম হয়। হিন্দুগণ তাঁহার শব দাহন ও মুসলমানগণ তাঁহার শব

(১) শ্রীযুক্ত দুর্গাচন্দ্র সান্যাল।

গোর দিতে চাহিয়াছিলেন।২ রাজা গণেশ পরলোক গমন করিলে তৎপুত্র যদু কোন মুসলমানীর প্রতি আসক্ত হইয়া মুসলমান ধর্ম্ম অবলম্বনপূর্ব্বক জেলালুদ্দীন নাম গ্রহণ করেন। জেলালুদ্দীন গণেশের পুত্র কিনা, তদ্বিষয়ে অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করেন; কারণ এইরূপ শুনা যায় যে, রাজা গণেশ জেলালুদ্দিনকে পরাস্ত করিয়া কারাগারে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। অনেকের মতে জেলালুদ্দিন অতিশয় অত্যাচারী নবাব ছিলেন, কারণ তিনি বলপূর্ব্বক দিনাজপুরের প্রায় সকল হিন্দুকে মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন। কেবল মাত্র যাহারা প্রাণ লইয়া কামরূপে পলায়ন করেন, তাহাদিগেরই ধর্ম্ম রক্ষা হইয়াছিল। জেলালুদ্দিনের পর হইতে হোসেনসাহ পর্য্যন্ত মুসলমান নবাবগণের আমলে দিনাজপুরের কোন বিশেষ বিবরণ পাওয়া যায় না।

জেলালুদ্দীন

নবাব হোসেনসাহের রাজত্বকালে দিনাজপুর জেলার হিন্দুনরপতিগণ স্ব স্ব স্বাতন্ত্র্য রক্ষার ও পূর্ব্বগৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিবার নিমিত্ত যথোচিত কার্য্যশক্তি প্রয়োগ করিয়াছিলেন। তাঁহারা উত্তর-পূর্ব্বদিক্-স্থিত পরাক্রান্ত শত্রুদিগের হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার নিমিত্ত দমদমা ও ঘোড়াঘাটের সেনানিবাসগুলি সৈন্যসমাবেশ দ্বারা সুদৃঢ় করিয়াছিলেন। বাদসাহ হোসেন সাহ হেম্‌তাবাদের নিকটস্থ মহেশ রাজা নামক এইরূপ একটি হিন্দু নরপতিকে দমন করিবার নিমিত্ত দম্‌দমা হইতে ঘোড়াঘাট পর্য্যন্ত সৈন্য পরিচালনোপযোগী একটি রাস্তা নির্ম্মাণ করেন। এই রাস্তার ভগ্নাবশেষ বর্ত্তমান ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের রাস্তার

হোসেনসাহ

(২) Stewart's History of Bengal.

[Stewart সাহেব গণেশকে Kanis নামে অভিহিত করিয়াছেন।]

(Imperial Gazetteerএ লিখিত আছে যে, রাজা গণেশও যদুর ন্যায় মুসলমান ধর্ম্ম অবলম্বন করেন)

ভিত্তিস্বরূপ। হেম্‌তাবাদ থানার নিকট মহেশ রাজার রাজপ্রাসাদের ভগ্নাবশেষ এখনও দেখা যায়।

তৎকালীন মুসলমান নরপতিগণ অত্যন্ত ধর্ম্মোন্মাদী ছিলেন। তাঁহারা মুসলমান পীরগণের অত্যন্ত অনুগত ছিলেন। এই জেলার প্রত্যেক অংশে মুসলমান পীরগণের কবর বা স্মৃতিস্তম্ভ দেখিতে পাওয়া যায়। স্মৃতিস্তম্ভগুলি প্রায়ই হিন্দু মন্দিরের ভগ্নাবশেষের উপর নির্ম্মিত। ইহার কারণ সহজেই অনুমিত হইতে পারে। তৎকালীন মুসলমান নবাবগণ তাঁহাদের প্রচলিত প্রথানুসারে হিন্দুমন্দিরাদি ধ্বংসপূর্ব্বক তাহার উপর পীরের কবর বা স্মৃতিস্তম্ভ নির্ম্মাণ করাইতেন। এখন পর্য্যন্ত এই স্মৃতি-স্তম্ভগুলি মুসলমানগণ দ্বারা অতি সমাদরে পূজিত হইয়া থাকে। এই সকল স্মৃতিস্তম্ভের মধ্যে পীর বজরুদ্দিনের কবরই সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। এই কবরটি হেম্‌তাবাদের নিকট অবস্থিত। ইহাকে দেখিলেই সহজেই মনে হয় যে, ইহা কোন হিন্দু রাজপ্রাসাদের ইষ্টকাদি দ্বারা প্রস্তুত হইয়াছে। সম্ভবতঃ পূর্ব্বোক্ত হিন্দু নরপতি মহেশের রাজপ্রাসাদের সরঞ্জামাদি লইয়া এই সমাধি-স্তম্ভনির্ম্মিত হইয়াছে। প্রবাদ আছে, রাজা মহেশকে রাজ্যচ্যুত করিবার নিমিত্ত এই পীর বজরুদ্দিন অনেক সাহায্য করিয়াছিলেন। এই কবর হইতে অনতিদূরে অবস্থিত একটি চতুঃষ্কোণ বিশিষ্ট সূচ্যগ্র স্তম্ভ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা হোসেন সাহের তক্ত বা সিংহাসন বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। হোসেন সাহের তক্তকে এরূপ স্থানে প্রতিষ্ঠিত দেখিয়া আমরা সহজেই বলিতে পারি যে, নবাব রাজা মহেশকে পরাজিত করিয়া সিংহাসনচ্যুত করেন; এবং বিজয়স্তম্ভস্বরূপ এই পীড়ামিড্‌টি নির্ম্মাণ করেন।

১৪৯৮ খৃষ্টাব্দে রঙ্গপুরের খেনবংশীয় নীলাম্বররাজ গৌড়-বাদসাহ হোসেন সাহের সৈন্যকর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া পার্ব্বত্যপ্রদেশে পলায়ন

করেন। এই খেনরাজের সাম্রাজ্য দিনাজপুরে ঘোড়াঘাট পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

পূর্ব্বেই বলা বর্ত্তমান হইয়াছে গঙ্গারামপুর থানার অধীনে দম্‌দমায় মুসলমানগণের একটি সেনানিবাস ছিল। এই দম্‌দমার নিকট "ধল-দীঘি" নামে একটি সুন্দর দীঘি দেখিতে পাওয়া যায়। এই দীঘিটি বোধ হয় সেনানিবাসের সৈন্যদিগের ব্যবহারের জন্য খনিত হইয়াছিল। এই দীঘির উত্তরদিকে মোল্লা আতাউদ্দীনের একটি দর্গা ও তৎসন্নিহিত একটি মসজেদ্ দেখা যায়। মসজেদগাত্রে একটি উৎকীর্ণ-লিপি হইতে আমরা জানিতে পারি যে, ইহা মোল্লা আতাউদ্দীনের পূর্ব্বে পূর্ব্বোক্ত সেনা-নিবাসের অধ্যক্ষ ওয়াজিত উপাধিধারী একব্যক্তি দ্বারা নির্ম্মিত হইয়া-ছিল। তৎপর মসজেদের পার্শ্বের দেওয়ালের আর একটি প্রস্তরলিপি হইতে জানিতে পারি যে, ইহা ফতে সা কর্ত্তৃক আতাউদ্দীনের উপাসনা স্থানরূপে নির্ম্মিত হইয়াছিল। হোসেন সাহের পরবর্ত্তী পাঠান নবাব-গণের রাজত্বকালে দিনাজপুরের ইতিহাস সম্বন্ধে আমরা সম্পূর্ণ অজ্ঞ।

ষষ্ঠ অধ্যায়

মোগল-রাজত্ব

১৫২৬ খৃষ্টাব্দে বাবর ইব্রাহিম লোদিকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া দিল্লীর সম্রাট হন। বাবরের পুত্র হুমায়ুনের রাজত্বকালে বাঙ্গালার ইতিহাসের বিশেষ ঘটনা সম্রাট হুমায়ুন কর্ত্তৃক নবাব সেরখাঁকে আক্রমণ। সেরসাহ হুমায়ুনকে পরাস্ত করিয়া তাঁহাকে ভারতবর্ষ হইতে বিদূরিত করতঃ দিল্লীতে আবার পাঠান সাম্রাজ্য স্থাপন করেন। সেরশাহ ও তাঁহার বংশধরগণ ১৫৭৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত স্বাধীনভাবে রাজত্ব করেন। কিন্তু বঙ্গের নবাব দাউদ খাঁর সময় হইতে আবার ভাগ্যলক্ষ্মী পাঠানরাজগণের প্রতি বিমুখ

হন। দাউদ খাঁ সম্রাট আকবরের মোগলসৈন্য কর্ত্তৃক গৌড় হইতে বিতাড়িত হইয়া সুন্দরবনাভিমুখে পলায়ন করেন। এই সময় হইতে দিনাজপুরের ইতিহাস বর্ত্তমান রাজবংশের ইতিহাসের সহিত বিশেষভাবে জড়িত। বঙ্গের স্বাধীনতাসূর্য্য সম্পূর্ণরূপে অস্তমিত হইবার উপক্রমকালে, পাঠান নরপতিগণের উচ্ছেদ ও মোগলগণের উদয় সময় বঙ্গের অধিকাংশ প্রদেশ প্রবলপরাক্রান্ত দ্বাদশ ভৌমিক নরপতিগণ কর্ত্তৃক শাসিত হইয়াছিল। সেই দ্বাদশ নরপতির রাজ্যবিভাগানুসারে পুরাকালে কখনও কখনও সমগ্র বঙ্গদেশ বারোভাটি বাঙ্গালা নামে অভিহিত হইত। দিনাজপুর এই দ্বাদশ নরপতিগণের মধ্যে এক নরপতির লীলাভূমি, এবং এই নরপতি দিনাজপুর-রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। যদিও আকবরের সময় হইতে আমরা দিনাজপুর রাজবংশের সঠিকবৃত্তান্ত জানিতে পারি, তথাপি ঐ রাজবংশ স্থাপন সম্বন্ধে আমরা বিভিন্ন মত দেখিতে পাই। Westmacott প্রমুখ ইংরেজ ঐতিহাসিকগণের দিনাজপুরে রাজবংশ স্থাপন সম্বন্ধে নিম্নলিখিত মত দেখা যায়। ১৬০০ খৃষ্টাব্দে সম্রাট আকবর সমগ্র সাম্রাজ্যকে ১৫টি সুবায় বিভক্ত করিয়া সেলিমকে বঙ্গদেশের সুবাদার নিযুক্ত করেন। সুবা বাঙ্গালাকে আবার ২৪টি সরকারে বিভক্ত করা হয়। ইহার মধ্যে ছয়টি সরকারের কতকাংশ দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত। আকবরের এই বন্দোবস্তের সময় দিনাজপুর ও মালদহের অনেকাংশ জনৈক জমিদারের অধীনে ছিল। সম্ভবতঃ এই জমিদারটি পূর্ব্বোক্ত রাজা গণেশের বংশধর ছিলেন। ঐতিহাসিক বুকানন তাঁহাকে কাশী নামে অভিহিত করিয়াছেন[১]। কিন্তু এই জমিদারের নাম অতলবিস্মৃতির গর্ত্তে বিলীন হইয়া গিয়াছে। তাঁহার সমাধি মন্দির এখনও রাজবাটীর মন্দির-দ্বারে

দিনাজপুর-রাজবংশ

(১) Dr. Francis Buchanan Hamilton's Dinajpur District p. 25.

প্রদর্শিত হইয়া থাকে, এবং লোকগণ এই সমাধি-মন্দির রীতিমতভাবে দধি, দুগ্ধ, কলা ও কাপড় দ্বারা সাদরে পূজা করে। তিনি অতি ধর্ম্মাত্মা ব্যক্তি ছিলেন বলিয়া মোহন্ত বা ব্রহ্মচারী নামে অভিহিত হইতেন। মহাত্মা কাশী পরলোক গমন করিলে তৎশিষ্য শ্রীমন্ত দত্ত চৌধুরী নামক একটি কায়স্থ রাজগদি প্রাপ্ত হন। এই শ্রীমন্ত দত্তের একটি পুত্র ও একটি কন্যা ছিল। কিন্তু পুত্রের অপুত্রকাবস্থায় মৃত্যু হওয়াতে তাহাতে তাহার দৌহিত্র শুকদেব রায় জমিদারী প্রাপ্ত হন। এই শুকদেবের বংশধর বর্ত্তমান মহারাজ গিরিজানাথ।

দিনাজপুর রাজবংশের উৎপত্তি

দিনাজপুর-রাজবংশ-স্থাপন সম্বন্ধে আর একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে১। এই প্রবাদের কোন ঐতিহাসিক মূল্য নাই বলিলেও চলে। ইহাতে কেবল মাত্র কল্পনা-শক্তির পরাকাষ্ঠা দেখিতে পাই। এই বিবরণানুসারে রঙ্গপুর-স্থিত বর্ত্তমান বর্দ্ধনকুঠী জমিদারের পূর্ব্ব-পুরুষের সহিত দিনাজপুর রাজ-বংশের প্রতিষ্ঠাতার মনিব ও ভৃত্য সম্বন্ধ। দেবকী-নন্দন ঘোষ নামক একজন উত্তররাঢ়ী কুলীন-কায়স্থ এই বর্দ্ধনকুঠীর কর্ম্মচারী ছিলেন। তাঁহার পুত্র হরিরাম নামান্তরে দিনরাজ ঘোষ সম্রাট্ গণেশনারায়ণের অতি প্রিয় পাত্র ছিলেন। গণেশনারায়ণের মৃত্যুর পর তিনি তৎপুত্র যদুনারায়ণের পেশকার পদে উন্নীত হইলেন। কিন্তু যদু মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করাতে দিনরাজ কর্ম্মে ইস্তাফা দিলেন। যদু তাঁহার কর্ম্মচারীর গুণ-গ্রাম জানিয়া তাঁহাকে উত্তর বাঙ্গালার নবাবী দিলেন। দিনরাজ যেখানে গিয়া বাস করিতেছিলেন, তাহার নাম "দিনাজপুর" হইয়াছিল। উত্তর বাঙ্গালার লোকে শব্দের আদ্যে"র"কার উচ্চারণ

---

(১) শ্রীযুক্ত দুর্গাচন্দ্র সান্যাল।

করে না। এই জন্য তাহারা এই স্থানকে "দিনা-আজপুর" বলিত। দিনরাজের মৃত্যুর পর তৎপুত্র শুকদেব রায় রাজা হন।

যদিও দিনাজপুর-রাজবংশ-স্থাপন সম্বন্ধে উপরোক্ত দুইটি বিভিন্ন মত দেখা যায়, তথাপি আমরা নিম্নলিখিত আর একটি বিবরণকে অতীব প্রামাণ্য ও সত্য বলিয়া গ্রহণ করিব। (ক) এই মতের সহিত ওয়েষ্টমেকট সাহেব প্রদত্ত বিবরণের অনেক সাদৃশ্য দেখা যায়। এই মতানুসারে দিনাজপুর-রাজ-বংশের স্থাপয়িতা রাজা শুকদেব রায়ের ঊর্দ্ধতন পিতৃ-পুরুষগণ অযোধ্যানিবাসী ছিলেন। এই রাজ-বংশের বীজপুরুষ সোমেশ্বর ঘোষ অযোধ্যা হইতে মুর্শিদাবাদ জেলার বজান গ্রামে বাস স্থাপন করেন। সোমেশ্বর ঘোষ হইতে রাজা শুকদেব অধস্তন চতুর্বিংশতি পুরুষ। রাজা শ্রীমন্ত দত্ত শুকদেবের মাতামহ বঙ্গের কানুনগো। শ্রীমন্ত দত্ত (বিষ্ণুদত্তের পুত্র) অতি পুণ্যাত্মা এক ব্রহ্মচারীর শিষ্য ছিলেন। এই শ্রীমন্ত দত্তের কন্যার সহিত সোমেশ্বর ঘোষ বংশজ দেবকীনন্দন ঘোষের পুত্র হরিরাম ঘোষের উদ্বাহ-ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। বিবাহের পর হরিরাম নিজ পিতৃভূমি পরিত্যাগ করিয়া দিনাজপুরে বসবাস আরম্ভ করেন। এই হরিরাম ঘোষের ঔরসে শ্রীমন্ত দত্তের কন্যার গর্ভে রাজা শুকদেব ও বিশ্বনাথ ঘোষ জন্ম গ্রহণ করেন।

শ্রীমন্ত দত্ত চৌধুরী উপরোক্ত সন্ন্যাসীর উপদেশ মত প্রজাপালন করিতে লাগিলেন। তিনি তৎকালীন বাঙ্গালার সুবাদার সাহাজাদা সাহসুজাকে নিজ গুণপনা দ্বারা আকৃষ্ট করিয়া অতীব প্রতিপত্তি লাভ করেন। শ্রীমন্ত দত্তের পরলোক হইলে তৎপুত্র হরিশ্চন্দ্র পিতৃ-সম্পত্তি

(ক) মহামহোপাধ্যায়কল্প ৺মহেশচন্দ্র তর্কচূড়ামণি প্রণীত "দিনাজপুর-রাজবংশম্" হইতে গৃহীত।

প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় ভাগিনেয় শুকদেবের প্রতি সেই সম্পত্তি পরিচালনার ভার প্রদান করেন। হরিশ্চন্দ্র অপুত্রকাবস্থায় পরলোক গমন করিলে শুকদেব সেই সম্পত্তি প্রাপ্ত হন।

শুকদেব

শুকদেব প্রজানুরঞ্জন দ্বারা রাজোপাধি প্রাপ্ত হইলে তাঁহাকে সকলেই শুকদেব রায় বলিত। তিনি স্বয়ং প্রজাদের বিচার করিতেন বলিয়া প্রজারা কাজীর নিকট বিচারার্থী না হইয়া তাহারই নিকট বিচারপ্রার্থী হইত। রাজা শুকদেবের প্রথমা পত্নীরগর্ভে রামদেব ও জয়দেব নামে দুই পুত্র এবং দ্বিতীয়া পত্নীর গর্ভে বীর প্রাণনাথ জন্মগ্রহণ করেন। রাজা শুকদেব অতীব কৃতিত্বের সহিত ৩৭ বৎসর কাল রাজত্ব করিয়া ১৬৮১ খৃষ্টাব্দে (১০৮৮ সালে, ১৬০৩ শকাব্দে) পরলোক গমন করেন। তৎখনিত প্রাসাদ-প্রতিবিম্ব-চুম্বিত-জলা শুকসাগর ও অন্যান্য কীর্ত্তিরত্ন সকল আজও তাঁহার স্মৃতি বক্ষে ধারণ করিয়া আছে।

রাজা শুকদেবের পর তজ্জ্যেষ্ঠপুত্র রামদেব রায় পিতৃসিংহাসনে আরূঢ় হইয়া তাঁহার তৃতীয় বৎসরে পরলোক গমন করেন। তৎপর তদীয় ভ্রাতা জয়দেব মাত্র তিন বৎসর কাল পিতৃসিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকিয়া ইহলোক পরিত্যাগ করেন। রামদেব ও জয়দেবের রাজত্ব কালে ঘোড়াঘাট পরগণান্তর্গত ভূসম্পত্তি দিনাজপুর রাজের অধীনে আইসে। এই সম্পত্তি প্রাপ্তির সহিত পরবর্ত্তী রাজা প্রাণনাথ রায়ের জীবনের ঘটনাবলি অতি দৃঢ়ভাবে সম্বদ্ধ।

রামদেব ও জয়দেব

ঘোড়াঘাটের তৎকালীন শাসনকর্ত্তা রাঘবেন্দ্র অতীব প্রজাপীড়ক ছিলেন। ইহার উপর তিনি নবাব সরকারে রীতিমত ভাবে রাজস্ব প্রেরণ করিতে অক্ষম হওয়ায় তাঁহার প্রতি তৎকালীন বঙ্গের সুবাদার আজিম উসান অতীব বিরাগ-ভাজন হইয়া ঘোড়াঘাট পরগণা দিনাজপুর-রাজ্যান্তর্গত করিতে ইচ্ছা করেন। ১৬৮৭ খৃষ্টাব্দে রাজা জয়দেবের মৃত্যুর পর তদীয়

কনিষ্ঠ ভ্রাতা রাজা প্রাণনাথ রাজগদী প্রাপ্ত হন। দিনাজপুরের রাজবংশ তাঁহাদিগের কৃতিত্বের জন্য পূর্ব্ব হইতেই সুবাদারের শুভদৃষ্টিতে থাকায় রাজা প্রাণনাথ ঘোড়াঘাট পরগণার ৷৷৴০ নয় আনা অংশ প্রাপ্ত হইলেন। ১৭০৪, ১৭১৩, ১৭২২ খৃষ্টাব্দের তিনটি তাম্রশাসন দ্বারা আমরা রাজা প্রাণনাথের রাজত্ব-কাল নির্ণয় করিতে পারি। রাজা প্রাণনাথ স্বকীয় ভূজবলে প্রায় স্বাধীন-ভাবে রাজত্ব করিতেন। কিন্তু রাজস্ব দান সম্বন্ধে তাঁহাকে মোগলের বশ্যতা স্বীকার করিতে হইত। ইনি প্রবল প্রতাপের সহিত ৩১ বৎসর কাল রাজত্ব করেন। ইনি বীরত্বে তৎকালীন হিন্দু নরপতি-গণের মধ্যে অগ্রগণ্য ছিলেন। রাজ্যপ্রাপ্তির কয়েক বৎসর পর প্রাণ-নাথ স্বীয় বাহুবলে রাজত্বের কলেবর বৃদ্ধি করিতে স্বীয় কার্য্যশক্তি প্রয়োগ করেন। এইরূপে তিনি মালিগাঁও পরগণা অধিকার করেন। এই পরগণা বংশীহারী থানার পূর্ব্বাংশ ও মালদহ জেলার অনেক বিস্তীর্ণ ভূভাগ লইয়া গঠিত ছিল। ইহা ব্যতীত রাজা প্রাণনাথ নিজ জমিদারীর চতুঃসীমাস্থ ১২ বারটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমিদারী অতি পরাক্রমের সহিত আক্রমণ করিয়া নিজ রাজ্যান্তর্ভুক্ত করেন। তাঁহার কীর্ত্তি-চিহ্নের ধ্বংসাবশেষ এখনও দিনাজপুরের অনেক স্থানে বর্ত্তমান। দিনাজপুর সহরের ১২ মাইল দক্ষিণে মুর্শিদাবাদ রাস্তার পার্শ্বে তিনি "প্রাণসাগর" নামক একটি বৃহৎ দীর্ঘিকা খনন করান। এই দীঘি এখনও জলজ উদ্ভিদ কিম্বা বন জঙ্গল দ্বারা আবৃত হয় নাই।

রাজা প্রাণনাথ

রাজা প্রাণনাথের সর্ব্বাপেক্ষা অতুলনীয় কীর্ত্তি কান্তনগরের মন্দির। এই মন্দির তৎকালীন হিন্দুস্থপতি বিদ্যার একটি প্রকৃষ্ট নিদর্শন। এই মন্দিরে রাধাকৃষ্ণ মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। প্রবাদ আছে, এই মূর্ত্তি দুইটি রাজা প্রাণনাথ শ্রীবৃন্দাবনে পুণ্য

কান্তামন্দির

সলিলা যমুনায় প্রাপ্ত হন। (১) প্রাণনাথের ঘোড়াঘাট পরগণার ॥/০ আনা লাভের পর ঐ সম্পত্তির ভূতপুর্ব্ব অধিকারী রাঘবেন্দ্র ও তাঁহার শক্রগণ দিল্লীর দরবারে বাদসাহ আলমগির সকাশে অভিযোগ করাতে তিনি সম্রাট কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া দিল্লী অভিমুখে গমন করেন। পথি-মধ্যে তিনি শ্রীকৃষ্ণের বাল্য লীলাভূমি ও তাঁহার যৌবনের প্রেমাভিনয়ের স্থান শ্রীবৃন্দাবন ধামে কয়েকদিবসের জন্য অবস্থান করিতে লাগিলেন। প্রবাদ স্বপ্নেতে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া তিনি প্রত্যূষে তর্পণ করিবার নিমিত্ত যমুনা-জলে অবতরণ কালে রুক্মিণী ও তাঁহার কান্ত কৃষ্ণের মূর্ত্তি প্রাপ্ত হইলেন। তৎপর দিল্লীতে সম্রাটকে সন্তুষ্ট করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করতঃ দিনাজপুরের মন্দিরে মূর্ত্তি দুইটি স্থাপন করিলেন। কিন্তু একদা রাত্রিকালে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ রাজা প্রাণনাথকে তাঁহার প্রিয়সখা অর্জ্জুনের লীলাভূমি বিরাট-রাজ্যের উত্তর গো-গৃহে মূর্ত্তি দুইটি প্রতিষ্ঠা করিতে আদেশ দেন। স্বপ্নাদেশানুসারে প্রাণনাথ ১৭০৪ খৃষ্টাব্দে কান্তনগরে একটি সুদৃশ্য মন্দির নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু এই মন্দিরে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা তাঁহার জীবদ্দশাতে হয় নাই। রাজা প্রাণনাথের পুত্র রামনাথ বিগ্রহ দুইটিকে এই মন্দির উৎসর্গ করেন। এই মন্দিরের নয়টি বৃহৎ-চূড়া ছিল বলিয়া ইহা "নবরত্ন" নামে অভিহিত হয়। কিন্তু ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের বৃহৎ ভূমিকম্পে এই নয়টি শৃঙ্গই ভূমিসাৎ হওয়ায় ইহা অনেকটা শ্রীহীন হইয়া পড়িয়াছে। পূর্ব্বে নব-চূড়-যুক্ত অম্বুদ-চুম্বি কান্ত-মন্দিরকে দেখিলে মনে হইত যেন স্বয়ং বিশ্বকর্ম্মা নিভৃতে একটি স্বর্গীয় বিমান নির্ম্মাণ করিয়া লোক-চক্ষুর অন্তরালে বঙ্গ-প্রদেশে স্থাপিত করিয়াছেন। Buchanan Hamilton এই মন্দির দেখিয়া বলিয়াছেন—"The temple is by far the finest that

(১) কেহ কেহ বলেন এই মূর্ত্তি দুইটি বাগনগর হইতে আনীত হইয়াছে।

I have seen in Bengal." ভিত্তি ব্যতীত মন্দিরের অন্যান্য কোন অংশ নির্ম্মাণ করিতে কোন প্রস্তর ব্যবহৃত হয় নাই। মন্দিরের ভিত্তিটি ভীমকায় প্রস্তর-খণ্ড দ্বারা নির্ম্মিত। মন্দির-গাত্রে মহাভারত ও রামায়ণের ঘটনাবলির ছবি ব্যতীত ও প্রাত্যহিক সামান্য জীবনের ঘটনাবলির চিত্রও খোদিত হইয়াছে। এই চিত্রগুলির কতকগুলি ভিন্ন প্রায় সবই বুঝিয়া উঠিতে পারা যায় না। Mr. Fergusson এই মন্দির সম্বন্ধে বলেন,—

"In execution they (i. e. the curvings) display an immeasurable inferiority to the curvings on the old temples in Orissa or Mysore, but for richness of general effect and prodigality of labour this temple may be fairly allowed to compete with some of the earlier examples."

বাণনগর হইতে আনীত প্রস্তরাবলি দ্বারা এই মন্দিরের অনেক অংশ নির্ম্মিত হইয়াছে। প্রাণনাথের আর একটি কীর্ত্তি রাজবাটীর সন্নিকটে এক বৃহৎ দীর্ঘিকা খনন। দীর্ঘিকা খননের পর তিনি রামদেব ও জয়দেবের মাতা দ্বারা উৎসর্গ করান। এই জন্য এই দীঘির নাম মাতা-সাগর হইয়াছে।

রাজা প্রাণনাথের কোন পুত্র না থাকায় তিনি রামনাথ নামক এক আত্মীয় বালককে দত্তক গ্রহণ করেন। রাজা প্রাণনাথ মানবলীলা সম্বরণ করিলে উক্ত রামনাথ ১৭১৯ খৃষ্টাব্দে রাজগদী প্রাপ্ত হন। ১৭৪৫ ও ১৭৫৪ খৃষ্টাব্দের দুইটি তাম্র-শাসন দ্বারা তাঁহার রাজত্বকাল নির্ণয় করা যায়। তদানীন্তন সুবাদার মুর্শিদকুলী খাঁ রাজা রামনাথের নিকট যথাকালে কর ও যথেষ্ট উপ-ঢৌকন প্রাপ্ত হইয়া রাজা রামনাথকে যুদ্ধোপযোগী বহু কামান ও অন্যান্য

রাজা রামনাথ

অস্ত্রাদি প্রদান করেন। রাজা রামনাথ তাঁহার পিতা অপেক্ষাও অতীব প্রবল পরাক্রান্ত নরপতি ছিলেন। তৎকালীন সালবাড়ী পরগণার ভূস্বামী নবাব সরকারে রাজস্ব প্রেরণ না করাতে, বাঙ্গালার তদানীন্তন সুবাদার মুর্শিদকুলী তাহার প্রতি কুপিত হইয়া রাজা রামনাথকে সালবাড়ী পরগণা অধিকার করিবার আদেশ দেন। এই সম্পত্তি অধিকার বিষয়ে রাজা রামনাথের ধীশক্তির প্রাখর্য্য বুঝা যায়। আবার এই বুদ্ধিশক্তির সহিত তাহার বাহুবলের এক অপূর্ব্ব সংযোগ হইয়াছিল। কথিত আছে, এই সালবাড়ী পরগণার ভূস্বামীর রক্ষাকর্ত্রী স্বরূপ কালিকা ও চামণ্ডা বিগ্রহ ঐ জমিদারের বাটীতে প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই বিগ্রহদ্বয় তাহার বাটীতে থাকিলে কেহ ভূস্বামীর অনিষ্টসাধনে সক্ষম হইত না। রাজা রামনাথ এই বিগ্রহদ্বয় স্বগৃহে আনয়নার্থে একটি চতুর ব্রাহ্মণ নিযুক্ত করিলেন। ব্রাহ্মণ এই চৌর্য্যবৃত্তিতে সফল হওয়ায় রামনাথের সহিত ভূস্বামীর ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হয়। ইহাতে সালবাড়ীর ভূস্বামীর পরাজয় হয়। ভূস্বামী তাহার হৃতগৌরব উদ্ধার মানসে দ্বিতীয় বার রাজা রামনাথকে আক্রমণ করেন। এই যুদ্ধেও উক্ত ভূস্বামী পরাজিত হওয়াতে উক্ত পরগণা রামনাথের রাজ্যান্তর্গত হয়।[১] রাজা রামনাথ সালবাড়ী পরগণা অধিকার করিয়া বঙ্গের সুবাদারের নিকট রাজস্ব ও উপঢৌকন প্রেরণ করায় সুবাদার কর্ত্তৃক করদাহ পরগণা রামনাথকে প্রসাদস্বরূপ প্রদত্ত হইল। ক্রমে রাজা রামনাথের কীর্ত্তিকাহিনী সুদূর দিল্লী নগরে বাদশাহের কর্ণে পৌঁছিল। ১৬৬৭ শকাব্দে রামনাথ ভারতের প্রধান প্রধান তীর্থস্থল দর্শন করিয়া সম্রাটের সাক্ষাৎমানসে দিল্লীতে উপস্থিত হইলেন। ভারতসম্রাট রাজা রামনাথকে অতীব আদর ও সম্মান

(১) Mr. Strong ভ্রম করিয়া গোবিন্দনগরের জমিদারী অধিকারের কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

সহকারে অভ্যর্থনা করিয়া দিল্লীর দরবারে মহারাজ উপাধি ও মাহি, মুরাতা প্রভৃতি বহু খেল্লাৎ দানে তাঁহাকে ভূষিত করিলেন। তিনি সম্রাট কর্তৃক দৃঢ় দুর্গরচনার এবং সৈন্য ও অস্ত্রাদি রক্ষার আজ্ঞাপ্রাপ্ত হইয়া শ্রীবৃন্দাবনধামে গমন করিলেন, তথায় একটি গোপাল মূর্ত্তি ক্রয় করিয়া নিজ রাজধানীতে পুনরাগমন করেন। রাজা রামনাথ প্রবাস হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া গোপালগঞ্জের সুবিখ্যাত পঁচিশরত্ন মন্দির নির্ম্মাণ আরম্ভ করান। এই সময়ে বঙ্গে বর্গীর উপদ্রব আরম্ভ হইলে রামনাথ নিজ প্রাসাদাদি দুর্ভেদ্য প্রাকার ও পরিখায় পরিবেষ্টিত করেন। এখনও স্থানে স্থানে তাহার ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। তৎকালে রাজা রামনাথের বীরত্বকাহিনী এতদূর বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল যে, এই বর্গীদিগের ভয়ে অনেক ভদ্রলোক পদ্মা ও গঙ্গার দক্ষিণ পার হইতে বসবাস উঠাইয়া দিনাজপুর রাজ্যমধ্যে বাস স্থাপন করেন। কিন্তু সুখের বিষয় বর্গীগণ দিনাজপুরের কোন অনিষ্ট সাধনে সক্ষম হয় নাই। দুর্দ্ধর্ষ বর্গীগণ বঙ্গের বহুস্থান লুণ্ঠন করাতে বাদশাহের বহু ক্ষতিসাধন হওয়ায়, সেই ক্ষতিপূরণার্থ বাদশাহ সমস্ত জমিদারদিগের উপর মাগন বসান। রাজা রামনাথ সর্ব্বাগ্রে বহু অর্থ চাঁদা দিয়া দিল্লীদরবারে প্রতিপত্তি লাভ করেন।

রাজা রামনাথ ১৬৭৬ শকাব্দে গোপালগঞ্জে প্রাণগোপাল নামক গোপালজীউকে স্থাপন করিয়া সুবিখ্যাত পঁচিশরত্ন মন্দির দান করেন। তাহার পর ঐ মন্দির অপবিত্র হওয়ায় তৎসমীপে পঞ্চরত্ন-মন্দির নির্ম্মিত হয়। এইরূপে রাজা রামনাথ অনেক কীর্ত্তি-স্থাপন করিয়া বহুপুণ্য ও প্রশংসা অর্জ্জন করেন। দিনাজপুর-রাজবংশ দানশীলতার জন্য সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। তাঁহাদিগের দানশৌণ্ডতার বিবরণ পাঠ করিলে ঐ সকল কেবল কল্পিত উপকথা বলিয়া মনে হয়। কিন্তু প্রকৃত-পক্ষে ঐসব কেবল মাত্র কল্পিত কাহিনী নহে, উহা জ্বলন্ত সত্য।

এই বংশের দানশীল নরপতিগণের মধ্যে রাজা রামনাথই সর্ব্বাপেক্ষা অগ্রণী। তিনি দেবসেবা, ব্রাহ্মণসেবা ও মানব-জাতির সেবায় প্রভূত দান করেন। তাঁহার দানশীলতার উপমা ভারতের সমগ্র রাজন্যবর্গের ইতিহাসে অল্পই দেখা যায়। তাহার লোক-হিতৈষণার ইচ্ছা এতই প্রবল ছিল যে, তিনি দিনাজপুর সহরের ৪ মাইল দক্ষিণে রামসাগর নামে তালবৃক্ষ-শোভিত এক মহতী দীর্ঘিকা খনন করাইয়া তাহার তীরে দুইদণ্ড কল্পতরু-ব্রত গ্রহণ করতঃ সমস্ত রাষ্ট্র, ভূসম্পত্তি ও অসংখ্য দ্রব্য দান করেন। রাষ্ট্রগ্রহীতা মন্ত্রী হরিশ্চন্দ্ররায়ের পুনঃ পুনঃ প্রার্থনাতে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের ব্যবস্থানুসারে মূল্য দ্বারা পুনর্ব্বার রাষ্ট্রগ্রহণ করেন।

রাজা রামনাথ

রাজা রামনাথের মনে বৈরাগ্যের উদয় হওয়ায় যৎকালে তিনি সমস্ত বিষয়-বৈভব দান করেন তৎকালে অর্থগৃধ্নু রঙ্গপুরের ফৌজদার তাঁহার রাজধানী আক্রমণ করেন। (১) নাজিম সৈয়দ আহম্মদ মুর্শিদাবাদ হইতে প্রচুর সৈন্য সংগ্রহ পূর্ব্বক দিনাজপুরের ধনাগার লুণ্ঠন করেন। রামনাথ গোবিন্দনগরে পলায়ন করিয়া স্ত্রীপুত্র ও আত্মরক্ষা করেন। (১) ফৌজদার বহু অর্থ লুণ্ঠন করিয়া স্বরাজ্যে প্রত্যাগমন করিলে পর গঙ্গাস্নান গমনের ছলে রাজা রামনাথ নিজ বালক পুত্রদ্বয় সহ মুর্শিদাবাদে গমন করিয়া তদানীন্তন বাঙ্গালার সুবাদার সুজাউদ্দিনের নিকট ফৌজদারের অত্যাচার কাহিনী বর্ণনা পূর্ব্বক তাহার শাসন প্রার্থনা করেন। পাপিষ্ঠ ফৌজদারকে ধৃত করিবার নিমিত্ত সুজাউদ্দিন রামনাথকে এক দল সৈন্য প্রদান করেন। সেই সৈন্য গ্রহণ পূর্ব্বক দিনাজপুরে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া আরও প্রচুর সৈন্য সংগ্রহ করিয়া ফৌজদারের বিরুদ্ধে অভিযান করেন।

(১) Stewart সাহেবের মতে এই সময় কোচবিহাররাজ ও সৈয়দ আহম্মদ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া পার্ব্বত্য প্রদেশে পলায়ন করেন—History of Bengal p. 490.

এইরূপে ক্রমে ফৌজদারের সহিত রাজা রামনাথের এক ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হয়। যুদ্ধে নৃশংস ফৌজদারকে জীবদ্দশায় ধৃত করিতে না পারায় রামনাথ তাহার শিরশ্ছেদন করেন। ফৌজদার হত হইলে রামনাথ তাঁহার অধিকৃত পাঁচটি পরগণা নিজ রাজ্যান্তর্গত করেন। এইরূপে রাজা রামনাথ ফৌজদারকে দমন করিয়া সুবাদার সমীপে বহু জহরতাদি উপহার প্রদান করেন। রাজা রামনাথের শেষ জীবন বেশ শান্তি ও সুখে কাটিয়াছিল। "দিনাজপুর রাজকুলের মধ্যে রাজা রামনাথ সর্ব্বাপেক্ষা কৃতী, কীর্ত্তিমান ও সৌভাগ্যবান পুরুষ ছিলেন।" তাঁহার পরামর্শ-দাতা অগণ্য গুণশালী মন্ত্রী হরিশ্চন্দ্র রায়ের সাহায্যে রামনাথ ঐ সকল গুণের অধিকারী হন। রাজা রামনাথের সময় তদানীন্তন বহু সুবাদারের দেওয়ান রঘুনন্দন রায় রায়াঁর ভ্রাতা নাটোর-রাজ রামজীবন রায়ের নিজ কন্যার বিবাহে বাঙ্গালার সমস্ত রাজগণ নিমন্ত্রিত হন। এই বিবাহে দিনাজপুর-রাজ রামনাথ ব্যতীত বর্দ্ধমান-রাজ, নদীয়া-রাজ প্রভৃতি বঙ্গের আর আর নৃপতিগণ উপস্থিত ছিলেন দিনাজপুর রাজ স্বয়ং এই বিবাহে না গিয়া তাঁহার মন্ত্রী হরিশ্চন্দ্র রায়কে নাটোর প্রেরণ করেন। হরিশ্চন্দ্র নাটোরে গমন করিয়া প্রথমে অনাদৃত হওয়াতে পরে নিজ বুদ্ধি-কৌশলে অত্যন্ত সমাদৃত ও প্রশংসিত হন। তৎপর হরিশ্চন্দ্র নাটোর-রাজের সহিত দিনাজপুর-রাজের ভ্রাতৃ-সম্বন্ধ স্থাপন করান। অদ্যাপি দুই রাজবংশের মধ্যে সেই ভ্রাতৃ-সম্বন্ধ চলিয়া আসিতেছে। রাজা রামনাথ সুকৃতির সহিত ৪২ বৎসর-কাল রাজত্ব করিয়া ১৬৮২ শকাব্দে মানবলীলা সম্বরণ করেন। মহাপ্রাণ রামনাথের ধর্ম্ম ও বীরত্ব-কাহিনী ভারতের ইতিহাসে জ্বলন্ত অক্ষরে লিখিত থাকিবে।

রাজা রামনাথ পৃথিবীতে অতুলনীয় কীর্ত্তি রাখিয়া ইহলোক ত্যাগ করিলে পর তাঁহার কৃষ্ণনাথ, বৈদ্যনাথ, ও কান্তনাথ এই তিন পুত্র

পরস্পর হিংসাযুক্ত হওয়ায় জ্যেষ্ঠ পুত্র কৃষ্ণনাথ পিতার শ্রাদ্ধাদি সম্পন্ন করিয়া রাজ্য প্রাপ্তির ইচ্ছায় দিল্লী গমন করেন। দিল্লীর দরবারে মহারাজ উপাধি ও রাজ্য প্রাপ্তির সনন্দ লইয়া যৎকালে তিনি মাতৃভূমিতে প্রত্যাগমন করিতেছিলেন, সেই সময়ে তিনি দিনাজপুরের অন্তর্গত করদাহের বাড়ীতে আসিয়াই জ্বরে প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর রামনাথের তৃতীয় পুত্র বৈদ্যনাথ সমুদায় রাজ্য অধিকার করেন। এই বৈদ্যনাথের রাজ্যপ্রাপ্তির সময় মীরকাশীম বাঙ্গালার নবাব হইয়া মুর্শিদাবাদ ত্যাগ করতঃ মুঙ্গেরে স্বীয় রাজধানী স্থাপন করেন। মীরকাশীম বঙ্গের সুবাদার হইয়াই বাঙ্গালার রাজা ও জমিদারগণের রাজস্ব বৃদ্ধির আজ্ঞা দেন। এইরূপে রাজা বৈদ্যনাথের প্রতিও রাজস্ব দেওয়ার আজ্ঞা প্রচারিত হইল। কিন্তু বৈদ্যনাথ বর্দ্ধিত রাজস্ব দিতে অস্বীকার করায় মীরকাশীম তাঁহাকে বৃটীশ-পক্ষপাতী ও নিজ বিরোধী জ্ঞান করিয়া ছল পূর্ব্বক দেখা করার প্রয়োজন প্রকাশ করতঃ মুঙ্গেরে আহ্বান করেন। রাজা বৈদ্যনাথ মীরকাশীমের কূটনীতি বুঝিতে না পারিয়া মুঙ্গেরে উপস্থিত হইলে মীরকাশীম তাঁহাকে মুঙ্গেরের দুর্গে অবরুদ্ধ করিলেন। বৈদ্যনাথ স্বীয় বিপদ-বার্ত্তা গূঢ় পুরুষ দ্বারা স্বীয় অনুজভ্রাতা কান্তনাথের নিকট প্রেরণ করেন। কান্তনাথ কিন্তু উহা রাজ্যপ্রাপ্তির সুযোগ বোধ করিয়া বৈদ্যনাথের সঞ্চিত অর্থ গ্রহণ পূর্ব্বক বৃটীশদিগের নিকট খালিসা দপ্তরে রাজ্যপ্রাপ্তির সনন্দ প্রার্থনা করেন। এই সময় মীরকাশীম বৃটীশদিগকে পদচ্যুত করিবার অভিপ্রায়ে অযোধ্যা-নবাবের সাহায্য লইতে মুঙ্গের হইতে অযোধ্যায় গমন করেন। এই অবকাশে রাজা বৈদ্যনাথ দুর্গপালকে অর্থ দ্বারা বশীভূত করিয়া মুঙ্গের দুর্গ হইতে পলায়ন করিয়া স্বীয় মাতৃভূমিতে প্রত্যাবৃত্ত হন। তিনি কান্তনাথের দুরভিসন্ধি জানিতে

বৈদ্যনাথ

পারিয়া খালিসা দপ্তরে নিজ জীবিতাবস্থা জানাইয়া পুনর্ব্বার রাজ্যভার গ্রহণ করেন। ইহার পর রাজা বৈদ্যনাথ কান্তনাথকে পৃথগন্ন করিয়া দেন। তাহার পর বৈদ্যনাথ খ্যাতনামা পিতৃ-পিতামহের ন্যায় একটি দীঘি খনন করিতে ইচ্ছা করিলেন। কিন্তু তৎকালে বাঙ্গালা দেশে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ হওয়াতে দীঘি দেওয়া স্থগিত রহিল। ইহার কয়েক বৎসর পর বৈদ্যনাথ স্বীয় ইচ্ছানুসারে দীর্ঘিকা খনন আরম্ভ করাইলেন। দীর্ঘিকা খনিত হইলে উহা তিনি স্বয়ং উৎসর্গ না করিয়া নিজ পত্নী রাণী সরস্বতী বা আনন্দময়ীর দ্বারা উৎসর্গ করাইয়াছিলেন। তাহাই সেই দীঘির নাম আনন্দ-সাগর হইয়াছে। তৎপরে রাজা বৈদ্যনাথ সেই আনন্দসাগরের তটের নিকট হইতে দুইটি খাল খনন করাইয়া মাতা-সাগরের পূর্ব্বদিক পর্য্যন্ত আনিয়াছিলেন। সেই খাল দুইটির নাম রামদাঁড়া। এই রামদাঁড়ার ধ্বংসাবশেষ এখনও কাউগাও হইতে দিনাজপুর আসিতে পথিকের নয়ন গোচর হয়।[১]

রাজা বৈদ্যনাথের কোন ঔরস সন্তান না থাকায় তিনি ১৬৯৮ শকাব্দে এক জ্ঞাতি পুত্রকে দত্তক লইয়া তাহার নাম রাধানাথ রাখেন। রাজা বৈদ্যনাথ ১৯ বৎসর কাল সুকৃতির সহিত রাজত্ব করিয়া ১৭০১ শকাব্দের চৈত্র মাসে গঙ্গাতীরে দেহরক্ষা করেন।

সপ্তম অধ্যায়

বৃটীশ-রাজত্ব।

১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী পদলাভ করেন। সমগ্র বঙ্গদেশের রাজস্ব আদায়ের ভার

(১) Buchanan Hamilton এর মতানুসারে এই রামদাঁড়া রাধানাথের রাজত্বকালে রাজা বৈদ্যনাথের শ্যালক জানকীরামের আদেশে খনিত হইয়াছিল। (Hamilton's Dinajpur District P. 29.)

দিল্লীর বাদসাহের নিকট প্রাপ্ত হইয়া ঐ কোম্পানী দিনাজপুরে একজন ইংরেজ কলেক্টর নিযুক্ত করিলেন। এই সময় হইতেই দিনাজপুর রাজবংশের আর্থিক অবস্থার অধঃপতন হইতে আরম্ভ করিল। পূর্ব্বে রাজা রামনাথের সময় দিনাজপুর-রাজ-সম্পত্তির আয় ৫০ লক্ষ টাকা ছিল। আর আধুনিক মহারাজের আয় ৩৷৷০ লক্ষ টাকা মাত্র। যখন সমস্ত জিনিষ সস্তা ছিল, যে সময় কুচবিহারের মহারাজের রাজস্ব দিনাজপুর হইতেও অনেক কম ছিল; সেই সময় দিনাজপুর-রাজ বাঙ্গালা দেশের সর্ব্বপ্রধান জমিদার বলিয়া পরিগণিত হইতেন। কিন্তু রাজা রাধানাথের সময় হইতেই দিনাজপুর রাজসম্পত্তির ধ্বংস আরম্ভ হয়।

১৭৭৯ খৃষ্টাব্দে রাজা বৈদ্যনাথ পরলোক গমন করিলে তদীয় নাবালক পুত্র রাধানাথ রাজ-গদী প্রাপ্ত হন। কিন্তু বৈদ্যনাথের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা কান্তনাথের ও বৈদ্যনাথের দত্তক পুত্র রাধানাথের সহিত উত্তরাধিকারিত্ব লইয়া বিবাদ উপস্থিত হয়। রাজা বৈদ্যনাথ কান্তনাথের প্রতি তাদৃশ সন্তুষ্ট না থাকাতে রাধানাথকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন। ইহাদিগের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হওয়ায় সকাউন্সিল গভর্ণর জেনারেলের উপর বিবাদ মীমাংসার ভার অর্পিত হয়।

রাজা রাধানাথ

গভর্ণর জেনারেল ওয়ারেণ হেষ্টিংস দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দের পরামর্শানুসারে কিশোর বয়স্ক রাধানাথকে উত্তরাধিকারী নির্ব্বাচন করিয়া একখানি সনদ প্রদান করেন। কিন্তু রাধানাথকে সম্পত্তি দিবার পূর্ব্বে দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ হেষ্টিংস সাহেবের নাম করিয়া নাবালক পক্ষীয়গণের নিকট ৪ চারি লক্ষ টাকা দাবী করিলেন; এই চারি লক্ষ টাকা না দিলে রাধানাথের জমীদারী প্রাপ্তি লইয়া বিশেষ গোলযোগ ঘটিবে ইহাও তাঁহাদিগকে বলিয়া দেওয়াতে অগত্যা তাঁহারা দেওয়ানকে টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। বলা বাহুল্য, এই সব হেষ্টিংস ও তৎপ্রিয়পাত্র গঙ্গাগোবিন্দের ষড়যন্ত্রানু-

সারেই হইয়াছিল। নাবালক রাধানাথের নিকট চারি লক্ষ টাকা গ্রহণ করা হেষ্টিংস সাহেবের এক ভীষণ কলঙ্ক। হেষ্টিংসের পক্ষে এরূপ বিচার বিক্রয় প্রথা অনুসরণ করা যে অতীব নিন্দনীয় ও হেয় কার্য্য হইয়াছে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু সুখের বিষয় এই চারি লক্ষ টাকার মধ্যে দুই লক্ষ টাকা কোম্পানার কার্য্যে প্রদত্ত হয়, আর বাকী দুই লক্ষ টাকা স্বয়ং হেষ্টিংস ও তাহার প্রিয়পাত্র আত্মসাৎ করেন। অপ্রাপ্ত বয়স্ক রাধানাথকে সম্পত্তি প্রদান করিয়া গভর্ণর জেনারেল হেষ্টিংস দিনাজপুর রাজসম্পত্তি গভর্ণমেণ্টের তত্ত্বাবধানে রাখিবার নিমিত্ত নরপিশাচ দেবীসিংহকে দিনাজপুরের দেওয়ান নিযুক্ত করিলেন।

দেবীসিংহ

১৭৮১ ও ১৭৮২ এই দুই বৎসরে নরপিশাচ দেবী-সিংহের অত্যাচারে দিনাজপুর মহাশ্মশানে পরিণত হয়। দেবীসিংহের অত্যাচার কাহিনী শ্রবণ করিলে আজিও অনেক কোমলহৃদয়া মহিলা মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়েন। তাহার অত্যাচারের বিবরণ পাঠ করিলে কল্পিত গল্প বলিয়া মনে হয়; কিন্তু এ সব জলন্ত সত্য। দেবীসিংহের নাম শুনিলে এখনও উত্তর-বঙ্গবাসী ভয়ে শিহরিয়া উঠে। "সমগ্র মানব জাতির ইতিহাসে এরূপ পাশবিক অত্যাচারের দৃষ্টান্ত অধিক নাই বলিয়াই আমাদিগের বিশ্বাস। মানুষ হইয়া মানুষের প্রতি এরূপ পৈশাচিক ব্যবহার সম্ভবপর কিনা তাহা আমরা স্থির করিয়া উঠিতে পারি না। কল্পনা সে চিত্র আঁকিতে গেলে আপনিই ভীত ও চকিত হইয়া উঠে।" তাই বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন "পৃথিবীর ওপারে ওয়েষ্টমিনিষ্টার হলে দাঁড়াইয়া এড্‌মণ্ড বার্ক দেবীসিংহকে অমর করিয়া গিয়াছেন। পর্ব্বতোৎগীর্ণ অগ্নি-শিখাবৎ জ্বালাময় বাক্যস্রোতে বার্ক দেবীসিংহের দুর্ব্বিষহ অত্যাচার অনন্ত-কাল সমীপে পাঠাইয়াছেন। তাঁহার নিজ মুখে সে দৈববাণীতুল্য বাক্য-পরম্পরা শুনিয়া শোকে অনেক স্ত্রীলোক মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িয়াছিলেন।

আজিও শত বৎসর পরে সেই বক্তৃতা পড়িতে গেলে শরীর রোমাঞ্চিত ও হৃদয় উন্মত্ত হয়।

দিনাজপুরের সদর খাজানা অন্যান্য জেলার সদর খাজানা হইতে অনেক বেশী। এই জেলায় শতকরা ৫০৲ টাকা রাজস্ব দিতে হয়। দেবীসিংহই এই রাজস্বের উচ্চহারের প্রবর্ত্তক। দেবীসিংহের দেওয়ানীর পর তাঁহারই জমীদারী সংক্রান্ত কাগজ পত্র দৃষ্টে পরবর্ত্তী কলেক্টরগণ দিনাজপুরের রাজস্ব নির্দ্ধারণের হার বাঁধিয়া দেন। কিন্তু এ সম্বন্ধে আর একটি মতও প্রচলিত দেখা যায়। এই মতানুসারে দেবীসিংহের পরবর্ত্তী কলেক্টর মিঃ হ্যাচের কার্য্য-কুশলতায় দিনাজপুরের রাজস্বের উচ্চহার নির্দ্দিষ্ট হয়। ইংরেজ শাসনের প্রথম প্রবর্ত্তন হইবার সময় এতদ্দেশীয় কর্ম্মচারিগণ প্রজার জমি সম্বন্ধে কোনও সঠিক খবর ইংরেজ রাজ সমক্ষে উপস্থিত করিতেন না। কিন্তু স্বয়ং মিঃ হ্যাচ্ প্রত্যেক কার্য্য পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরিদর্শন করিতেন বলিয়া তিনি রাজস্বের এরূপ উচ্চহার নির্দ্দিষ্ট করিতে পারিয়াছিলেন।

দেবীসিংহ মাসিক এক হাজার টাকা বেতনে নাবালক রাজার দেওয়ান নিযুক্ত হইলেন। দেওয়ানী-পদ লাভ করিয়া দেবীসিংহ প্রত্যেক বিভাগে নিজের মনোমত কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিয়া দিনাজপুর সংসারের সমস্ত পুরাতন কর্ম্মচারীকে পদচ্যুত করিলেন। এই সময় তদীয় মিত্র রঙ্গপুরের তদানীন্তন কলেক্টর গুড্‌ল্যাড্ সাহেবের সহিত পরামর্শ করিয়া রাধানাথের মাসিক বৃত্তি ১৬০০ ষোল শত টাকা হইতে ৬০০৲ ছয় শত টাকা করিয়া দিলেন। এক হাজার টাকা মাসহারা কমিয়া যাওয়াতে রাধানাথের কিরূপ কষ্ট উপস্থিত হইল তাহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে। দেওয়ানী পদলাভের

দেবীসিংহ

পর বৎসর দেবীসিংহ রঙ্গপুর, দিনাজপুর ও ইদ্রাকপুর এই প্রদেশ ত্রয়ের

ইজারা বন্দোবস্ত করিয়া লয়েন। তৎকালে যে ব্যক্তি যে প্রদেশের দেওয়ান নিযুক্ত হইতেন তাহাকে সেই প্রদেশের ইজারা দেওয়া হইত না। কিন্তু দেবীসিংহ দেওয়ান হইয়াও দিনাজপুর প্রদেশের ইজারা গ্রহণ করেন। দেবীসিংহ ইজারা লইয়া দিনাজপুরে পৈশাচিক লীলার অভিনয় আরম্ভ করিলেন। ত্রিগুণ ও চতুর্গুণ হারে রাজস্ব দিতে অক্ষম হওয়ায় ভূস্বামিগণ শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া কারাগারে প্রেরিত হইল। রাজস্ব অনাদায়ের জন্য তাহাদিগের সম্পত্তি অল্প মূল্যে বিক্রীত হইতে লাগিল। বলা বাহুল্য দেবীসিংহ সেই সব সম্পত্তি কল্পিত নামে ক্রয় করিয়া লইলেন। এই সময় দিনাজপুর ও রঙ্গপুর প্রদেশে অনেক স্ত্রী জমীদার থাকায় তাঁহাদিগের উপর অমানুষিক অত্যাচার হইতে লাগিল। দেবীসিংহ তাঁহাদিগের অন্দরে স্ত্রী পদাতিক পাঠাইয়া বলপূর্ব্বক তাঁহাদিগের ধন, রত্ন ও অলঙ্কারাদি ক্রোক করিয়া লইতেন। তাহার পর অত্যাচার-স্রোত কৃষকগণ ও মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকগণের উপর দিয়া প্রবাহিত হইতে লাগিল। পিতা-পুত্রকে একসঙ্গে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া কণ্টকযুক্ত বিল্বের ডাল দ্বারা বেত্রাঘাত করা হইত। দেবীসিংহের নিযুক্ত কর্ম্মচারিগণ দ্বারা অসূর্য্যম্পশ্যা মহিলা-গণের পবিত্রতা হরণ তৎকালে কোন দূষণীয় কার্য্য বলিয়া পরিগণিত হইল না। কুলবধূগণকে সাধারণের সমক্ষে উলঙ্গিনী করিয়া দেবীসিংহের পৈশাচিক চরগণ অবিরত বেত্রাঘাত করিত। দেবীসিংহের অত্যাচার বর্ণনা করিতে গেলে হৃদয় কাঁপিয়া উঠে। "মহামতি বার্ক ইংলণ্ডের মহা-সমিতির নিকট সেই অত্যাচার কাহিনী বর্ণনা করিতে করিতে এরূপ অস্থির হইয়া উঠিয়াছিলেন যে, আর অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারেন নাই।"

দেবীসিংহের অত্যাচারে রঙ্গপুর প্রদেশের প্রজাগণ বিদ্রোহী হইয়া দিনাজপুরের প্রজাদিগকে তাহাদের সহিত যোগ দিবার জন্য আহ্বান

করে। অবশেষে গভর্ণমেণ্টসৈন্যের সহিত পাটগ্রাম নামক স্থানে প্রজাগণের ভীষণ যুদ্ধ বাধিল। তাহাতে প্রজাগণ পরাস্ত হইয়া দলে দলে কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইল। এত অত্যাচার করিয়াও দেবীসিংহের কোন শাস্তি হইল না। তিনি তাঁহার প্রিয়বন্ধু তৎকালীন নাজিম মহম্মদ রেজা খাঁর বিচারে নির্দ্দোষী বলিয়া নিষ্কৃতি পাইলেন। প্রজাগণের প্রতি এইরূপ অত্যাচার ও উৎপীড়ন ও নিজের সম্ভ্রম নষ্টের আশঙ্কা দেখিয়া কোমলহৃদয়া রাণী সরস্বতীর মনে বিদ্রোহ ভাব জাগাইয়া তুলিল। কিন্তু এই বিদ্রোহ ভাব কার্য্যে পরিণত হয় নাই।

রাজা দেবীসিংহের পর দিনাজপুরের রাজস্ব আদায়ের ভার রাণী সরস্বতীর সহোদর জানকীরামের উপর ন্যস্ত হয়। ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দে জানকী-রাম অত্যাচার জর্জ্জরিত প্রজাগণের নিকট হইতে রাজস্ব সংগ্রহ করিতে না পারায় তাঁহাকে মাত্র তিন দিন বেশী সময় দেওয়া হইল। কিন্তু ইহাতেও তিনি অসমর্থ হওয়ায় তাঁহাকে একরূপ বন্দীভাবে কলিকাতায় লইয়া যাওয়া আছে। কথিত আছে, তিনি কলিকাতায় ঋণের দায়ে এতদ্দেশীয় বারাণসী ঘোষ নামক একটি বণিক দ্বারা কারাগারে প্রেরিত হন। ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে তিনি সেই স্থানেই দেহত্যাগ করেন।

১৭৯২ খৃষ্টাব্দে রাজা রাধানাথ স্বয়ং সম্পত্তি পরিচালনার ক্ষমতা প্রাপ্ত হন। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে রাজ-সম্পত্তির Managing Collector Board of Revenueতে চলিয়া গেলে মিঃ জন ইলিয়েট্ তাহার স্থানে নিযুক্ত হন। রাজা রাধানাথ এই সময় মিঃ হ্যাচ্ নিযুক্ত কর্ম্মচারিগণকে বরখাস্ত করিয়া গভর্ণমেণ্টের বিরাগভাজন জানকীরামের প্রিয় কর্ম্মচারিগণকে নিযুক্ত করায় তিনি ইংরেজের বিষ-দৃষ্টিতে পতিত হন। ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে বড়লাট স্থির করিলেন যে, রাজা রাধানাথকে সম্পত্তি পরিচালনের ভার দেওয়া হইবে না। তাহার পর

রাজা রাধানাথ

ঐ সময়ে মিঃ ইলিয়ট রাজা রাধানাথের নামাঙ্কিত শীল মোহর রাজবাটী হইতে লইয়া গিয়া কলেক্টরের ট্রেজারীতে বন্ধ করিয়া রাখিলেন। রাজ্য পরিচালনের ভার রামকান্ত রায়ের উপর পতিত হইল।

১৭৯৬ খৃষ্টাব্দে রাজা রাধানাথ পুনরায় নিজ সম্পত্তি প্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু ১৭৯৭ খৃষ্টাব্দে রাজস্ব বাকী পড়াতে বোর্ড অব রেভেনিউএর আজ্ঞানুসারে দিনাজপুর রাজ-সম্পত্তির কতকাংশ বিক্রয় করিয়া দেওয়া হয়। এইরূপে দিনাজপুর-রাজ্যের অধঃপতন আরম্ভ হইল। ১৭৯৭ খৃষ্টাব্দের পরবর্ত্তী কয়েক বৎসর পূর্ব্ববৎ সদর খাজানা বাকী পড়ায় পুনর্ব্বার রাজ-সম্পত্তির অনেকাংশ বিক্রয় করা হইল। কিন্তু এই সময়ে রাজা রাধানাথ নীরবে বসিয়া ছিলেন না। তিনি তাঁহার সম্পত্তি রক্ষার্থ যথোচিত চেষ্টা করিয়াছিলেন। রাধানাথের মাতা রাণী সরস্বতী ও সহধর্ম্মিণী রাণী ত্রিপুরা-সুন্দরী কল্পিত নামে সম্পত্তি ক্রয় করিতে আরম্ভ করিলেন। ক্রমে অবস্থা এরূপ শোচনীয় হইয়া উঠিল যে ১৮০০ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে রাজা তাঁহার নিজবাটীতে উত্তমর্ণগণের ভয়ে বন্দীভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ইংরেজ-রাজ কর্ত্তৃক এইরূপ অপমানিত হইয়া ১৮০১ খৃষ্টাব্দে মাত্র ২৪ বৎসর বয়সে রাজা রাধানাথ মানবলীলা সম্বরণ করিলেন। রাজা রাধানাথ কিরূপ প্রকৃতির লোক ছিলেন, তাহা আমাদিগের পক্ষে বুঝা ভার। যে হেষ্টিংস তাহাদের সর্ব্বনাশের ত্রুটি করেন নাই, সেই হেষ্টিংসের সুবিচারের কথা তিনিও কোন সময়ে উল্লেখ করিয়াছিলেন। হেষ্টিংস কর্ত্তৃক এতদূর অপমানিত হইয়াও এই রাধানাথই অবশেষে হেষ্টিংস সাহেবের প্রশংসা করিয়া লিখিয়া পাঠাইয়া ছিলেন।*

* উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে নীলকরগণের অত্যাচারের সময় Mr. Carey এই জেলায় মদনবাটী নামক স্থানে মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করেন। ইহাই বঙ্গদেশে সর্ব্বপ্রথম

ইতিপূর্ব্বে বহুকালের পুরাতন দিনাজপুর-রাজসম্পত্তির কিরূপে ধ্বংস সাধিত হয় তাহা আমরা দেখাইয়াছি। যে রাজবংশের পূর্ব্ব-ইতিহাস গৌরবমণ্ডিত, যে রাজবংশে প্রাণনাথ ও রামনাথের ন্যায় মহাপ্রাণ ব্যক্তিগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; যাঁহারা বহুকাল বঙ্গদেশে দানশীল নরপতি বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন, তাঁহাদিগের এই বৃহৎ সম্পত্তির ধ্বংস-সাধন যে অতীব নিষ্ঠুরতার কাজ হইয়াছে, ইহা দ্বিধাশূন্য ভাবে বলা যাইতে পারে। এত বড় একটি রাজসম্পত্তি ইংরেজরাজের ভয়ের কারণ ছিল বলিয়াই বোধ হয়, ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট উহার উচ্ছেদসাধনে তৎপর ছিলেন।(১)

দিনাজপুর রাজসম্পত্তি-ধ্বংসের পর বঙ্গের সর্ব্বসাধারণের মনোযোগ আকর্ষক কোন ঘটনা ঘটে নাই। ১৮০১ খৃষ্টাব্দে রাজা রাধানাথের অপুত্রকাবস্থায় মৃত্যু হওয়াতে রাণী ত্রিপুরাসুন্দরী গোবিন্দনাথ নামক একটি বালককে দত্তক গ্রহণ করিলেন। ১৮১৭ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৪১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজা গোবিন্দনাথ নির্ব্বিঘ্নে রাজ্য-পালন করেন। রাজা গোবিন্দনাথ অতীব কার্য্য-কুশলী জমিদার ছিলেন। তিনি তাঁহার পিতার হৃতসম্পত্তি সকল পুনরুদ্ধারের নিমিত্ত যথেষ্ট চেষ্টা করেন এবং তাঁহার চেষ্টা অনেকটা সফল হইয়াছিল।

রাজা গোবিন্দনাথ

মুদ্রাযন্ত্র। এই যন্ত্র সাহায্যে কেরী ও তাহার সহচরগণ একখানি ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় পত্রিকা প্রচার করিতে আরম্ভ করেন।

১ "Opinions may differ as to the expediency of breaking up this large and ancient estate, but there can be no question that the policy of the government. however legal, was unduly harsh. ... ... that such a large possession as that of the Raja of Dinajpur was a Standing menace to Government..........." (F. W. Strong-Dinajpur. p. 27)

রাজা গোবিন্দনাথ পরলোকগমন করিলে তদীয় কনিষ্ঠ পুত্র তারকনাথ রাজগদী প্রাপ্ত হন। তাঁহার রাজত্বকালে, ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে বঙ্গদেশে সিপাহীবিদ্রোহ আরম্ভ হয়। যখন ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান নগরগুলি নরহত্যা, স্ত্রী ও শিশুহত্যার পৈশাচিক অভিনয়ের কেন্দ্রস্থল ছিল। তখন দিনাজপুরবাসিগণ নির্ব্বিবাদে শান্তি ও সুখভোগ করিতেছিল। সিপাহী বিদ্রোহের সম্বন্ধে দিনাজপুরে বেশ একটি মজার গল্প প্রচলিত আছে। যখন জলপাইগুড়ি হইতে বিদ্রোহী সিপাহীগণ দিনাজপুরের ধনাগার লুণ্ঠনমানসে বীরগঞ্জ পর্য্যন্ত পৌছে, তখন তাহারা কয়েকটি তামাসা প্রিয় কৃষককে সহরের রাস্তা দেখাইয়া দিতে বলে। তাহারা সিপাহীগণকে রাস্তা দেখাইয়া বলিল যে, দিনাজপুরের একদল ইংরেজসৈন্য তাহাদিগের আগমন-বৃত্তান্ত জানিতে পারিয়া আক্রমণ করিতে আসিতেছে। সিপাহীগণ ইহাতে ভীত হইয়া মালদহাভিমুখে পলায়ন করে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দিনাজপুরে তখন কোন সৈন্য ছিল না।

রাজা তারকনাথ

রাজা তারকনাথ ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে অপুত্রকাবস্থায় পরলোকগমন করেন। তারকনাথের মৃত্যুর পর তৎপত্নী রাণী শ্যামমোহিনী গিরিজানাথ নামক এক বালককে দত্তক গ্রহণ করেন। এই গিরিজানাথই বর্ত্তমান দিনাজপুরাধিপতি। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, দিনাজপুর রাজবংশ বহুকাল হইতেই পরহিতৈষণা ও দয়ার্দ্র চিত্ততার জন্য বিখ্যাত। এই রাজবংশের পূর্ব্বপুরুষগণই লোকহিতার্থে তাঁহাদিগের রাজ্যমধ্যে বৃহৎ বৃহৎ দীঘি খনন করান। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে যখন সমস্ত বঙ্গে দুর্ভিক্ষের ভেরী বাজিয়া উঠিল, যখন বঙ্গদেশের স্ত্রী-পুরুষ ও শিশুগণ অন্নক্লিষ্ট হইয়া প্রাণত্যাগ করিতে লাগিল, সেই সময় দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত প্রজাগণের কষ্টনিবারণার্থে রাণী শ্যামমোহিনী

মহারাণী শ্যামমোহিনী

গভর্ণমেণ্টের হস্তে প্রচুর অর্থ প্রদান করেন। গভর্ণমেণ্ট এই সৎকার্য্যের জন্য তাঁহাকেও মহারাণী 'উপাধি-ভূষণে' সজ্জিত করিলেন। বর্ত্তমান মহারাজ শ্রীল শ্রীযুক্ত গিরিজানাথ রাজগদী প্রাপ্ত হইবার কিছুকাল পরে গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে মহারাজ উপাধি প্রদান করেন। কিন্তু তখন দিনাজপুররাজের পক্ষ হইতে এই আপত্তি উত্থাপন করা হয় যে, এই উপাধি তাঁহাদিগের নিকট নূতন নহে; দিল্লীর বাদশাহ রাজা বৈদ্যনাথকে এই উপাধি প্রদান করেন। আবার এদিকে কলেক্টরের নিকট জমিদারী-সংক্রান্ত পুরাতন কাগজপত্রে শুধু রাজা উপাধি দেখিতে পাওয়া যায়। সিপাহী-বিদ্রোহের পর গভর্ণর জেনারেল লর্ড লরেন্স রাজবংশের নবাব প্রদত্ত পুরাতন উপাধিগুলি পুনর্জ্জীবিত-মানসে রাজবংশের ফরমানসকল দেখিতে চান। প্রধান কর্ম্মচারীসহ ফরমানগুলি নৌকাযোগে কলিকাতায় প্রেরণ করা হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে নবদ্বীপের নিকট নৌকাগুলি ঝটিকাক্রান্ত হইয়া যাত্রীগণ ও ফরমানসহ গঙ্গাবক্ষে নিমজ্জিত হয়। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট রাজভক্তির জন্য বিদ্যোৎসাহী, সাহিত্যানুরাগী, বিনয়ী, পরহিতৈষী, গিরিজানাথকে মহারাজা বাহাদুর উপাধিতে ভূষিত করেন। এই সময়ে গভর্ণমেণ্ট মহারাজা বাহাদুরকে ১০০ একশত সশস্ত্র সৈন্য রাখিবার অধিকার প্রদান করেন। মহারাজা বাহাদুরের ঔরসজাত পুত্র না থাকায় তিনি জগদীশনাথ নামক এক বালককে দত্তক গ্রহণ করেন। গভর্ণমেণ্ট বাহাদুর রাজপুত্র জগদীশনাথকে মহারাজ-কুমার উপাধি প্রদান করেন।

মহারাজা গিরিজানাথ

১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের প্রবল ভূমিকম্পে কারুকার্য্যময় কান্তমন্দিরের নয়টি অত্যুচ্চ শৃঙ্গ স্খলিত হইয়া পড়ে। মহারাজ গিরিজানাথ অপরিমিত অর্থব্যয়ে জীর্ণ মন্দিরের সংস্কারসাধন করিয়া একদিকে যেমন পূর্ব্বপুরুষের

গৌরব অক্ষুন্ন রাখিয়াছেন, অপরদিকে সেইরূপ ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুর ধর্ম্ম-সাধনের সহায়তা করিয়া ধর্ম্মপ্রাণতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। নানাপ্রকারে বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির সাহায্য করিয়া তিনি দেশের ও দশের ধন্যবাদার্হ হইয়া উঠিয়াছেন। ভগবানের অব্যর্থ আশীর্ব্বাদ তাঁহার রক্ষা-কবচ হউক। প্রজাগণের লক্ষ কণ্ঠোত্থিত আকুল প্রার্থনায় তাঁহার জীবন সুদীর্ঘ ও শান্তিময় হোক। দিনাজপুরের ইতিহাসে তাঁহার মহিমা-প্রোজ্জ্বল-চরিত্র স্বর্ণাক্ষরে মুদ্রিত হইয়া থাকুক। কবির কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া ভক্ত প্রজাগণ গাহিয়া উঠুক—

"শ্রীমান্ ভূবলয়ং স এষ গিরিজানাথো বহত্যাত্মনা।
মন্যে পুণ্যযশোধনানি চিন্ময়াদেষোঽপি ভূতিঃ সমম্॥"

দিনাজপুর-রাজবংশাবলী
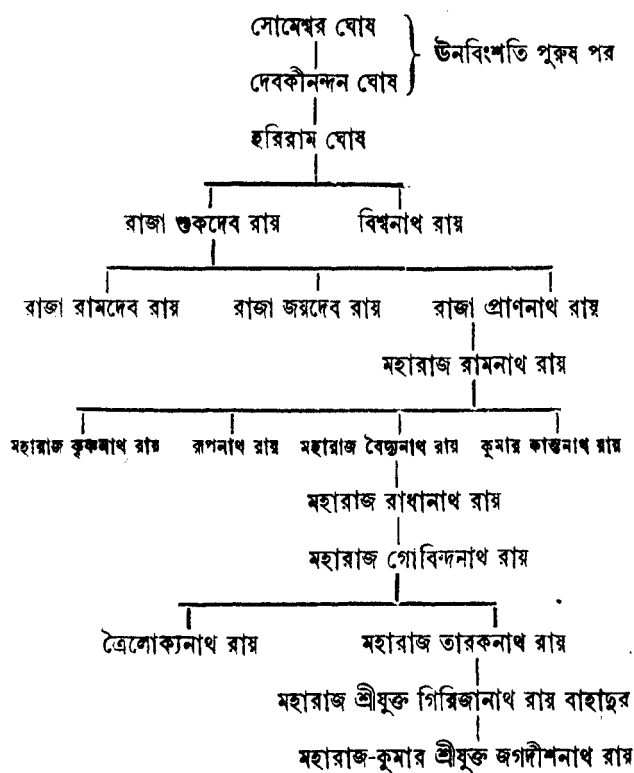
প্রমাণ-পঞ্জি

1. Dr. Francis Buchanan Hamilton—A Geographical, Statistical and Historical description of the district of Dinajpur.

2. F. W. Strong—Dinajpur (Eastern Bengal District Gazetters)

3. J. Vas—Rangpore ... ...

4. Elphinstone's History of India—Edited by E. B. Cowell M. A,

5. Major Stewart—History of Bengal.

6. R. C. Dutt—History of India.

7. Revised List of Ancient Monuments in Bengal—1886.

8. E. Burke's impeachment of Warren Hastings.

9. The Dawn and Dawn Society's Magazine—1906.

11. দিনাজপুর রাজবংশম্—৺মহেশচন্দ্র তর্কচূড়ামণি।

12. গৌড়রাজমালা—শ্রীরমাপ্রসাদ চন্দ।

13. বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাস—শ্রীদুর্গাচন্দ্র সান্যাল।

14. রাজা সীতারাম—শ্রীযুক্ত যদুনাথ ভট্টাচার্য্য।

15. দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ—চণ্ডীচরণ সেন।

16. মহারাজ প্রতাপাদিত্য—শ্রীযুক্ত সত্যচরণ শাস্ত্রী।

17. মুর্শিদাবাদ-কাহিনী—শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায়।

18. M. Taylor—History of India.

20. Imperial Gazetter—(New edition).

21. H. R. Nevill—Benares District Gazetteer.

শ্রীপ্রফুল্লকুমার সেনগুপ্ত

প্রাচীন কয়েকটী বালুর ঘাটের পরিচয়

বালুরঘাট মহকুমার ৩ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে এখানে বর্ত্তমানে পাশাপাশি অবস্থিত চতুর্দ্দিক প্রাচীর বেষ্টিত প্রধান দুইটি সমাধি দৃষ্ট হয়। উহার পার্শ্বে কতকগুলি ছোট ছোট সমাধি চিহ্নও দৃষ্ট হয়।

মাইসন্তোষ

প্রাচীর-গাত্রে একখানি ছোট প্রস্তর গ্রথিত আছে, তাহাতে (সম্ভবতঃ) আরবি ভাষায় কয়েক লাইন খোদিত আছে। স্থানীয় কোন মৌলবীই উহার পাঠ উদ্ধার করিতে পারেন নাই। গত পূর্ব্বসনে কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় ও শ্রদ্ধেয় ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় প্রভৃতি বালুরঘাটে স্থানীয় প্রত্নতত্ত্বের অনুসন্ধানে আসিয়া উহার পাঠোদ্ধারের জন্য প্রতিলিপি লইয়া যান, পাঠোদ্ধার হইয়াছে কি না আমাদের জানা নাই। ঐ প্রাচীরগাত্রে একখানা খোদিত ইষ্টক দেখা যায়। তাহাতে উহা কোন প্রাচীন হিন্দুমন্দির হইতে সংগৃহীত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। উহার নিকটেই ইষ্টক ও প্রস্তরের বিস্তৃত ভগ্নাবশেষ আছে। ঐ প্রস্তরের মধ্যে কতকগুলি Basalt Stone। উহা বঙ্গদেশে Rajmahal Hills এ ও ভারতবর্ষের মধ্যে মধ্যভারত ভিন্ন অন্যত্র পাওয়া যায় না বিশেষজ্ঞেরা এরূপ বলেন। ইহাতে অনুমান হয়, উহা কোন প্রবল প্রতিপত্তিশালী হিন্দুরাজার বাড়ী ছিল। উপরের লিখিত ইষ্টকখণ্ড সম্ভবতঃ তথা হইতে গৃহীত হইয়া থাকিবে। কারণ সমাধির প্রাচীরের গঠন দেখিয়া উহা বিশেষ প্রাচীন বলিয়া অনুমান হয় না।

কিম্বদন্তী এইরূপ যে, মাই ও তাঁহার কন্যা সন্তোষ এই দুইজন সাধুপ্রকৃতির স্ত্রীলোকের ঐ দুই কবর এবং তাঁহাদের নামানুসারেই

স্থানের নাম মাইসন্তোষ। এক্ষণে মুসলমান এক ফকীর ঐ কবরের তত্ত্বাবধান করেন। হিন্দুমুসলমান নিজ নিজ মঙ্গলার্থ ঐ স্থানে সিন্নি দেয়। ফকীরের বহু পীরপাল ভূমি আছে।

তবকাতে নাসিরী নামকগ্রন্থে মাকিদা ও মনতোষের নিকট পাঠানেরা আপনাদের মধ্যে বিবাদ করেন। খল্‌জি সামন্ত আজ্জউদ্দীন মহম্মদ শিরাণ দেবকোট অধিকারের চেষ্টায় কামাররুমীর সহিত যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া কোচবিহারের দিকে পলায়নপথে একজন মুসলমান সরদারের তরবারির আঘাতে নিহত হন। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয় তাঁহার গৌড়ের ইতিহাসে বলেন যে, সন্তোষে তিনি সমাহিত হন। তিনি মাকিদা বর্ত্তমান পরগণা মসিদা দেবকোটের (অর্থাৎ গঙ্গারামপুর থানার অন্তর্গত বর্ত্তমান দম্‌দমা গ্রামের) দক্ষিণ পূর্ব্ব এবং মনতোষ দেবকোটের দক্ষিণ-পূর্ব্ব সন্তোষকে বলেন।

মাই-সন্তোষও বর্ত্তমান সন্তোষ পরগণার অন্তর্গত বটে, মহম্মদশিরাণের সমাধি এ অঞ্চলে কোথায় আছে তাহা জানা যায় নাই, তবে মাইসন্তোষের পূর্ব্বোল্লিখিত দরগায় যেরূপভাবে সমান আসনে পাশাপাশি দুইজনের সমাধি দেখা যায়, তাহাতে উহা প্রকৃষ্টতর প্রমাণাভাবে শিরাণের সমাধি বলিয়া মনে করা যায় না।

বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির সম্পাদক শ্রদ্ধেয় রমাপ্রসাদ বাবু তদীয় গৌড়-রাজমালা নামক গ্রন্থে মাই-সন্তোষের অট্টালিকায় ধ্বংসাবশেষ পালবংশীয় মহীপাল রাজার প্রাদেশিক রাজবাড়ীর ধ্বংসাবশেষ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে কিনা গ্রন্থে তাহার উল্লেখ নাই। পরিখার চিহ্ন, Basalt প্রস্তরের বিশাল স্তূপ এবং বহুবিস্তৃত ইষ্টকচিহ্ন দ্বারা উহা যে কোন পরাক্রমশালী রাজার আবাসস্থান ছিল তাহা নিঃসন্দেহে অনুমান করা যায়।

মাই-সন্তোষেরই নিকটে, আত্রাই নদীর অপর পার্শ্বে অনুমান এক ক্রোশ পশ্চিমে আগরাদুগুণের বিশাল স্তূপ, ইহা দেখিতে একটা ক্ষুদ্র পাহাড় বলিয়া মনে হয়, উপরিভাগ এক্ষণে মৃত্তিকাবরিত এবং তাহার উপরে অনেক গাছও জন্মিয়াছে। বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির পক্ষে দিঘাপতিয়ার কুমার বাহাদুর প্রভৃতি বালুরঘাট শুভাগমন করিলে তাঁহারা উহার স্থানে স্থানে খনন করায় বৃহৎ ইষ্টকের ভিত্তি আদি প্রকাশ পাইয়াছে। তাহাতে এবং অন্যান্য নিদর্শন অবলম্বনে উহা হিন্দু-ভাস্কর্য্যের অপেক্ষাকৃত অতীত যুগের কোন সমৃদ্ধ নগরের ভগ্নাবশেষ বলিয়া তাঁহারা অনুমান করিয়াছেন। বহুবিস্তৃত ইষ্টকচিহ্নে তাহা সূচিত হয়, ঐ স্থানের এক বৃক্ষতলে অনেকগুলি প্রস্তরমূর্ত্তি অযত্নে পড়িয়াছিল, তন্মধ্যে বরাহ, নবগ্রহ প্রভৃতি কয়েকখানি মূর্ত্তি তাঁহারা রাজসাহী লইয়া গিয়াছেন এবং একখানি বাসুদেবমূর্ত্তি সংগৃহীত হইয়া বালুরঘাটের ফৌজদারী আদালতের সম্মুখে একবৃক্ষতলে রক্ষিত হইয়াছে। স্থানীয় লোকে উহাকে হাড়ীরাজার বাড়ী বলিয়া নির্দ্দেশ করে।

আগরাদুগুণ

বালুরঘাটের দক্ষিণ-পূর্ব্বে প্রায় ৬।৭ ক্রোশ দূরে অবস্থিত, এই স্থানটির অবস্থা ও প্রাচীন চিহ্নাদি দর্শনে বোধ হয় যে, এই স্থানে প্রতাপশালী কোন সমৃদ্ধ রাজার আবাসস্থান ছিল। মধ্যে মধ্যে স্তূপাকার ইষ্টকরাশি, বড় বড় পুষ্করিণী ভগ্ন-ইষ্টক-প্রাচীর এবং গ্রামটির মধ্য দিয়া পূর্ব্বপশ্চিমে সুদীর্ঘ একটি পাকা রাজপথ আজও দৃষ্ট হয়। অনেকস্থান খনন করিয়া ইটের গাঁথুনী, দালানের ভিত্তি প্রভৃতি চিহ্ন দৃষ্ট হয়।

আমাইড়

এই গ্রামের পশ্চিম অংশে একটি অত্যুচ্চ ইষ্টকময়স্থান আছে, এই উচ্চ স্থানটির আকৃতি গোলাকার, উপর দিক ক্রমশঃ মোচার

অগ্রভাগের ন্যায় সরু হইয়া উঠিয়াছে, এই স্থানটির উত্তর পার্শ্ব দিয়া পূর্ব্বদিকে পূর্ব্বোক্ত প্রশস্ত রাজপথটি অনেকদূর পর্য্যন্ত গিয়াছে, এই উচ্চ স্থানটিকে স্থানীয় লোকে জঙ্গিল পীরসাহের দরগা বলে।

এই দরগার পশ্চিম দিকে অল্প দূরে কালীসাগর নামে বড় একটা দীঘি আছে। এই দীঘির দক্ষিণপাড়ে একটি কালীমূর্ত্তি স্থাপিত আছে, প্রতি বৎসর ধূমধামের সহিত দেবীর পূজা হইয়া থাকে।

জগদ্দল

বালুরঘাট হইতে ৩।৪ ক্রোশ পূর্ব্ব-দক্ষিণ। এই স্থানে প্রাচীন অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষ আছে। নিকটেই আলতা-দীঘি নামে প্রায় অর্দ্ধ মাইল লম্বা এক দীঘি আছে। এই জগদ্দলেই কি অধুনা প্রখ্যাত জাগদ্দল বিহার ছিল? এবং নিকটস্থ আমাইড় কি "জনকভূ" উদ্ধারকর্ত্তা রামপাল দেবের প্রতিষ্ঠিত রামাবতী-নগর? বিশেষজ্ঞেরা ইহার বিচার করিবেন।

যোগীর গুফা বা যোগীর ঘোপা

বালুরঘাটে ৭ ক্রোশ দক্ষিণ-পূর্ব্ব আমাইডেরই সংলগ্ন। ইহার অপর নাম বিশালদহ, এইখানে পশ্চিমদেশীয় কাণফাটা সন্ন্যাসীদের একটি আশ্রম আছে। ইঁহারা গোরক্ষনাথের সেবা করেন, উহার বর্ত্তমান সেবাইত শ্রীযুক্ত বালকাইনাথ মোহন্ত, তাঁহার দিনাজপুর জেলায় রাণীশঙ্কলে ও বগুড়া জেলায় যোগী-ভবনে আরও দুটি আশ্রম আছে, ইনি আজকাল রাণীসঙ্কলেই থাকেন, বিশালদহে তদীয় শিষ্য হাঁচাইনাথ মোহন্ত থাকেন, ঐ স্থানে মাটীর নীচে একটি কক্ষ বা গুহা আছে, তথায় বৌদ্ধ চৈত্য আছে। উপরে অনেক ভগ্ন মন্দির ও বিগ্রহ আছে, উহাই পূজিত হয়। ঐ গুহা রাজকুমারী বিমলাদেবীর তপস্যা-স্থান বলে। তাঁহার নাকি গোরক্ষনাথ দেবের সহিত বিবাহ হয়, অনুসন্ধানে কোন প্রাচীন দলিল পাওয়া যায় নাই।

বালুরঘাট মহকুমার অনুমান ৮ ক্রোশ পূর্ব্ব-দক্ষিণ কোণে বাদালে

সুপ্রসিদ্ধ গুরব মিশ্রের গরুড়স্তম্ভ, বহুবার বহু স্থানে ইহার বিষয়ে আলোচনা ও পাঠোদ্ধার হইয়াছে, তাই সে বিষয়ে লিখিবার কিছু নাই। তবে বোধ হয়, ইহা বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, এই সম্মিলনের সম্পাদক মহাশয়ের জ্যেষ্ঠতাত হরচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় ইহার এক পাঠোদ্ধার করেন এবং ইংরাজী অনুবাদ ও টীকাসহ ১৮৭৪ খৃঃ এসিয়াটিক্ সোসাইটীর পত্রিকায় তাহা প্রকাশিত হয়।

বাদাল

ইহার উপরের অনেকাংশ ভাঙ্গিয়া ইহাকে হ্রস্ব করিয়াছে এবং (বোধ হয়) বজ্রাঘাতে খণ্ডিত প্রস্তরাংশ লোপ হইয়াছে, সৌভাগ্যক্রমে যে পার্শ্বে লিপি খোদিত আছে, স্তম্ভের সে পার্শ্ব এখনও কিঞ্চিৎ হেলিয়া দণ্ডায়মান থাকিয়া প্রাচীন কীর্ত্তিগাথা রক্ষা করিতেছে, এই স্তম্ভের পাদদেশ কিছু ইষ্টক দিয়া বাঁধান হইয়াছে কিন্তু দিনাজপুরের গৌরব এই প্রাচীনকীর্ত্তি-কালের প্রভাব হইতে রক্ষা করিতে হইলে ইহার সুরক্ষণ বিষয়ে সমধিক যত্ন প্রয়োজন। এই স্তম্ভই সাধারণতঃ "ভীমের লাঠী" বলিয়া উক্ত হয়।

এই স্তম্ভের উত্তরপার্শ্বে এক উচ্চ ভূখণ্ডে চারিদিকে প্রাচীন মন্দিরাদির ধ্বংসাবশেষ মধ্যে হরগৌরীমূর্ত্তি, এক নবনির্ম্মিত ইষ্টকগৃহে রক্ষিত ও পূজিত হইতেছে, নিকটেই এই বিগ্রহ প্রকটকারী সন্ন্যাসীর তপস্যার স্থান বলিয়া একটি বৃক্ষ পূজারীরা দেখাইয়া থাকে। প্রবাদ, তিনি ৺কামাখ্যাদেবীর নিকট যুগলমূর্ত্তি দর্শনাকাঙ্খায় বিস্তর তপস্যা করেন, তাঁহার তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া দেবী বর্ত্তমান স্থানে দর্শন দিবেন বলিয়া স্বপ্নাদেশ করেন, তদনুসারে তিনি এই স্থানে আসিয়া ঐ বৃক্ষতলে ঘোর তপস্যা করিলে দেবী প্রসন্ন হইয়া যুগল মূর্ত্তিতে দর্শন দেন এবং এই মূর্ত্তি জঙ্গলমধ্য হইতে দেবাদেশে অনুসন্ধান করিয়া তিনিই বাহির করেন, ক্রমে এই সংবাদ চতুর্দ্দিকে লোকমুখে প্রচারিত হইলে অনেকেই তাঁহার শিষ্য হয়। নিজ মনোভিলাষ পূর্ণ হওয়ায় নিকটস্থ কোন প্রতাপশালী রাজা ঐ সন্ন্যাসীকে

বিস্তৃত ভূসম্পত্তি দান করিতে চান, তিনি দানগ্রহণে অস্বীকার করেন শেষে তাঁহার নির্ব্বন্ধাতিশয্যে বাধ্য হইয়া কিছু জমা ধার্য্যে লইতে স্বীকৃত হন। বর্ত্তমান হরগৌরীর নিত্য পূজা আদির ব্যয় অধুনা কাশীবাসী ভবানী কুমার ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরা বহন করেন। নিকটস্থ প্রসিদ্ধ হাটও তাঁহাদেরই। মঙ্গলবারে হয় বলিয়া উহার নাম মঙ্গলবারী হাট। এতদ্দেশে উক্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয়দের যে ভূসম্পত্তি আছে উহাই উপরোল্লিখিত সম্পত্তি বলিয়া নির্দ্দেশিত হয়। ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরা নাকি উপরোক্ত সন্ন্যাসীর শিষ্য-বংশ।

ধুরইল

এই বাদালের প্রায় ২॥০ ক্রোশ পশ্চিম দিকে, ধুরইলের রাজবাটীর ধ্বংসাবশেষ, সেখানে বহু বৃহৎ দীর্ঘিকা আছে, স্থানীয় লোক এখনও দেওয়ানবাড়ী, রাজবাড়ী, অন্দরমহল, পশুশালা, আমলাদের আবাসগৃহ প্রভৃতি দেখাইয়া দেয়, বহু বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড লইয়া এই সমস্ত ধ্বংসাবশেষ ও দীর্ঘিকাদি যেরূপভাবে আছে, তাহাতে ধুরইল যে কালে একটি বিশেষ সমৃদ্ধ নগর ও প্রতাপশালী রাজার আবাসস্থান ছিল তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই, প্রায় একশত বৎসর পূর্ব্বে ধুরইলের রাজার ভূমি দানপত্র এখনও নিকটবর্ত্তী স্থানে দেখিতে পাওয়া গিয়াছে [রাজবাটীর ইষ্টকাদির কিছু নিদর্শন প্রদর্শিত হইবে]

দীবইর

বালুরঘাটের প্রায় ৭।৮ ক্রোশ দক্ষিণ-পশ্চিমে দীবইর গ্রামে প্রসিদ্ধ দীবইর দীঘি—উহা লম্বায় অনুমান অর্দ্ধ মাইল ও প্রস্থে কিছু ন্যূন হইবে, উহার চতুর্দ্দিকের পাহাড়ের গাত্রে ও নিম্নে প্রায় শতাধিক ছোট পুষ্করিণী খনিত আছে, দীঘির মধ্যস্থলে এক অষ্টকোণ সুউচ্চ স্তম্ভ এখনও এক প্রকার অক্ষুন্নভাবে দণ্ডায়মান থাকিয়া প্রাচীন কীর্ত্তি-পরাক্রম ও গৌরব-গাথা প্রচার করিতেছে, লোকে ইহাকে দীবইয়ের দীঘির "জাইট" বলে।

১৩১৫ সালে যখন বৃষ্টি-অভাবে ইহার জল অনেকটা শুকাইয়া যায়, তখনও কোন কিছু খোদিত লেখা দেখা যায় নাই। বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির গৌড়রাজমালায় ইহার এক প্রতিকৃতি দৃষ্ট হয় এবং তাহা কৈবর্ত্ত-রাজের জয়স্তম্ভ বলিয়া লেখা হইয়াছে। কিন্তু পুস্তকে তদ্বিষয়ে কিছু লেখা নাই। দীঘির উত্তরের ও পূর্ব্বের পাহাড়ের নিকটে ও চতুর্দ্দিকে নানা স্থানে ভগ্নপ্রাসাদের চিহ্ন ও ইষ্টকরাশি আছে।

এই দীবইয়ের প্রায় (২) দুই ক্রোশ দক্ষিণে ঘাটনগর, বর্ত্তমানে ঐ গ্রামে মহাদেবপুর, বলিহার ও দিনাজপুরের মহারাজার কাছারী আছে।

ঘাট-নগর

এইখানেও দীবইয়ের ন্যায় এক বহু বিস্তৃত দীর্ঘিকা আছে, তাহারও পাহাড়ে ও নিকটে প্রায় ঐরূপ বহু ছোট ছোট পুষ্করিণী দৃষ্ট হয়। বহুদূর পর্য্যন্ত যেরূপ ইষ্টকের স্তূপ ভগ্নপ্রাচীর ও চতুর্দ্দিকে ইষ্টক বিক্ষিপ্ত দেখা যায় তাহাতে যে পূর্ব্বে ইহা একটি প্রসিদ্ধ নগর ছিল এরূপ অনুমান করা যায়। উপরোক্ত দীঘিকে ছয়ঘাটীর দীঘি বলে।

বালুরঘাট মহকুমার পশ্চিম ভাগে তপন গ্রামে সুপ্রসিদ্ধ তপনদীঘি, কালদীঘি, ধলদীঘি, কাদমা দীঘি। পশ্চিমে করদস্থা পরগণা ও নিকটেই প্রসিদ্ধ বাণগড়, উষাগড় এবং পরগণে দেবীকোট বা দেবকোট। "বখ্-তিয়ার আপন রাজ্য দুই ভাগে বিভক্ত করেন, বাগড়ীর কিয়দংশ ও বরেন্দ্র লইয়া একভাগ, দিনাজপুর জেলায় দেবকোট ইহার রাজধানী ছিল, এই দেবকোটই প্রাচীন কোটিবর্ষবিষয়"।

"দেবকোট বর্ত্তমান দিনাজপুরের দক্ষিণ দিকে পুনর্ভবার বাম শাখার তীরে দম্‌দমা নামক স্থান; [রজনী চক্রবর্ত্তীর গৌড়ের ইতিহাস ২য় খণ্ড ৫৬৭ পৃষ্ঠা]

পশ্চিমাংশের উপরোক্ত দীঘি ও প্রাচীন স্থানাদির বিষয় সম্প্রতি অল্প-

বিস্তর আলোচনা হইয়াছে ও হইতেছে। এজন্য বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হইল না, প্রত্ন-তত্ত্বের আলোচনায় শক্তি নাই। এই ক্ষুদ্র পরিচয় দ্বারা বিশেষজ্ঞদিগকে উপযুক্ত কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইবার জন্য সাদরে আহ্বান করিতেছি। যথাসম্ভব পরিচর্য্যা দ্বারা তাঁহাদের কার্য্যের কিঞ্চিন্মাত্র সহায়তা করিবার সুযোগ পাইলেও আমাদিগকে ধন্য জ্ঞান করিব।

শ্রীনলিনীকান্ত চক্রবর্ত্তী।

রঙ্গপুরে প্রাপ্ত বিষ্ণুমূর্ত্তি

মাননীয় সভাপতি মহাশয়, ও সভ্যগণ,—

আমি অদ্য আপনাদিগের নিকট মৎসংগৃহীত তিনটি প্রস্তর ও একটি ধাতুনির্ম্মিত মূর্ত্তি-বিষয়ে ক্ষুদ্র প্রবন্ধ পাঠ করিতে উদ্যত হইয়াছি, মূর্ত্তি কয়েকটি রঙ্গপুর জেলার গাইবাঁধা মহকুমার গোবিন্দগঞ্জ থানার ভিতরে পাইয়াছিলাম। রঙ্গপুর জেলার গোবিন্দগঞ্জ থানা দিনাজপুর ও বগুড়া জেলার দোসীমানার নিকট এবং এখানে অনেক পুরাতন ভগ্নাবশেষ আছে। আমি বর্ত্তমান প্রবন্ধে ঐ গুলির কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। দিনাজপুর জেলার ঘোড়াঘাট নামক স্থান সকলের নিকটেই পরিচিত আছে। ঐ স্থান মোগলদিগের শাসন কালে আমাদের দেশের অন্যতম রাজধানী ছিল বলিয়া খ্যাতি আছে। জাহাঙ্গীর বাদশাহ ঐ রাজধানী ঢাকায় স্থানান্তরিত করেন। ঘোড়াঘাট করতোয়া নদীর উপকূলে অবস্থিত। গোবিন্দগঞ্জ থানার পার্শ্ববর্ত্তী দিনাজপুর জেলার সরেমসজেদ নামক প্রাচীন মসজেদ গোবিন্দগঞ্জ থানার সীমানা

হইতে অধিক দূরবর্ত্তী নহে। বগুড়া জেলার মহাস্থান নামক প্রাচীন রাজবাড়ীর ধ্বংসাবশেষও গোবিন্দগঞ্জ থানার সীমানা হইতে অধিক দূরবর্ত্তী নহে। গোবিন্দগঞ্জ থানা আয়তনে খুব বড়। ঐ থানা এবং উহার সংলগ্ন রঙ্গপুর, বগুড়া ও দিনাজপুর জেলার অংশ "খিয়ার" নামে খ্যাত। খিয়ার শব্দের অর্থ ক্ষীরাভ অর্থাৎ ক্ষীরের আভার স্থায়। খিয়ারে বহুল পরিমাণে চাউল জন্মে এবং তথায় বহুদূর বিস্তৃত বৃক্ষ-লতাহীন বিশাল প্রান্তর, লালবর্ণের মৃত্তিকা ও অনেক সুবৃহৎ অপরিষ্কার জলাশয় দেখা যায়। 'গোবিন্দগঞ্জ পূর্ব্বে বগুড়াজেলার অন্তর্গত ছিল—১৮৭১ সালে ইহা রঙ্গপুর জেলার সামিল হয়। গোবিন্দ-গঞ্জ থানার প্রান্তদেশে বগুড়ার সীমানার কোলে বিরাট নামে একটি স্থান আছে। সেখানে প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে একটী সুবৃহৎ মেলা হয় এবং অনেক হিন্দু বহুদূরদেশ হইতে সেই মেলায় মিলিত হয়।

চৈত্র মাসের ত্রয়োদশী হইতে সপ্তমী পর্য্যন্ত মহাস্থানের মেলা, অষ্টমীতে ব্রহ্মপুত্রের স্নান, তারপর বিরাটের মেলা। বিরাট মেলার বিশেষত্ব আছে, এখানে বৈশাখ মাসের প্রতি রবিবারে হিন্দু-নরনারী এবং মুসল-মানও পুষ্করিণীতে অবগাহন করিয়া করলা সিদ্ধ ও আতপ চাউলের ভাত বিনা তৈল-লবণে আহার করেন। মেলার অর্দ্ধাংশের জমিদার দিনাজ-পুর জেলার নবাবগঞ্জ থানার কড়াইবাড়ী গ্রামের শ্রীযুক্ত নাজির মহম্মদ চৌধুরী ও অপর অর্দ্ধাংশের জমিদার বর্দ্ধনকুঠীর শ্রীযুক্ত চন্দ্রকিশোর রায়। প্রথমোক্ত জমিদারের অংশ কোর্টের হাতে। বর্দ্ধনকুঠীর রাজ-বাটী হইতে মদনমোহন ও গোপীনাথ বিগ্রহ মেলায় আনিয়া বৈশাখ মাস ভোর রাখা হয় এবং ঐ বিগ্রহকে সমাগত হিন্দু-মুসলমান পূজা দেয়। মেলাটি পরগণা আলিগাঁওএর অন্তর্গত। সুদূর মণিপুর, কাছাড়, কটকপুরী, এবং মৈমনসিং, কুচবিহার, নদীয়া, রাজসাহী, পাবনা, দিনাজ-

পুর, বগুড়া, মুক্তাগাছা হইতে হিন্দু-নরনারী এই মেলায় আগমন করেন। ২২।২৩ বৎসর পূর্ব্বে ভীষণ শার্দ্দূলসমাকুল অরণ্যে মেলার স্থান আবৃত ছিল। তখন দিবসে মেলা হইত এবং রাত্রিকালে এখানে কেহ বাস করিতে সাহস করিত না। অধুনা মাত্র কয়েকটি সুস্বাদু ফলবিশিষ্ট ক্ষিরি-গাছ, ২টি প্রাচীন খুব বৃহৎ অশ্বত্থ-গাছ ও কয়েকটি ছোট গাছ ভিন্ন মেলার স্থানে অন্য গাছ-পালা কিছুই নাই এবং বহুদুর বিস্তৃত পরিষ্কার প্রান্তরের ভিতর বিরাট নামক স্থান অবস্থিত। ক্ষিরিগাছ রঙ্গপুর জেলায় আর কোথাও নাই। ইহার ফল মেলার সময়ে পাকে এবং খাইতে অতি মধুর। স্থানীয় কিম্বদন্তী এইরূপ যে, এই গাছ বিরাটরাজার বাটীর চিহ্ন। আরও কিম্বদন্তী আছে যে, রাত্রিতে মধ্যে মধ্যে মেলার স্থানে বাদ্য শুনা যায় এবং ঐ স্থানের ভাঙ্গা হাঁড়ী কোথায় কে লইয়া যায়, তাহা মানুষে জানিতে পারে না। কথিত আছে যে, শাকাহারের শ্রীরফাতুল্ল্যা সরকার রাত্রিতে মেলার স্থানে শ্রীকৃষ্ণ দর্শন করিয়াছিলেন।

বিরাটে মহাভারতের বিরাট রাজার রাজপ্রাসাদ ছিল বলিয়া জন-প্রবাদ আছে। বিরাট রাজার নামানুকরণে স্থানের নাম খ্যাত। রাজপ্রাসাদের ইষ্টক-নির্ম্মিত গৃহাদি মৃত্তিকাচ্ছাদিত উচ্চ স্তূপরূপে অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে এবং তাহাদের চতুষ্পার্শ্বে গড় আছে। স্থানীয় লোকের নিকট জানা যায়, ঐ স্তূপ পূর্ব্বে উচ্চতর ছিল এবং ক্রমশঃ বসিয়া যাইতেছে। নিকটে অনেক পুষ্করিণী ও একখানি বৃহদাকার পাথর পড়িয়া আছে। ঐ রাজপ্রাসাদের অভ্যন্তরে একটি পুষ্করিণীর ভিতর জনৈক সাঁওতাল ধাতুনির্ম্মিত মূর্ত্তিটি পাইয়াছিল এবং উক্ত বিরাট গ্রামের ১½ মাইল ব্যবধানে রাজহার নামক স্থানে প্রস্তরমূর্ত্তিত্রয় এক পুরাতন বৃক্ষতলে আমি পাইয়াছিলাম। মূর্ত্তিগুলি সব বিষ্ণুমূর্ত্তি।

মিষ্টার কে, সি, দে রঙ্গপুর আসার পূর্ব্বে মিষ্টার টিন্‌ডালের শাসন-

কালে ১৯১০ সালের নবেম্বর মাসে গোবিন্দগঞ্জ থানার অন্তর্গত নওরাঙ্গাবাদ নামক স্থানে জনৈক সাঁওতাল ভূমিকর্ষণকালে ধাতুনির্ম্মিত পাঁচটি পুরাতন বিষ্ণুমূর্ত্তি পাইয়াছিল। তাহার কতক এক্ষণে কলিকাতা এসিয়াটিক্ মিউজিয়মে রক্ষিত আছে। নওরাঙ্গাবাদ বর্ত্তমান প্রবন্ধ-লিখিত রামপুরার সংলগ্ন। আমি যে মূর্ত্তি সংগ্রহ করিয়াছি তাহা ঐ মূর্ত্তিগুলির অনুরূপ। আমি যে প্রস্তরমূর্ত্তি সংগ্রহ করিয়াছি তাহার একটীতে কতকগুলি অক্ষর খোদিত আছে। বিরাটের তিন মাইল ব্যবধানে পূর্ব্ব-দক্ষিণদিকে বাণেশ্বর গ্রামে বাণেশ্বর নামে শিবলিঙ্গ আছে। কথিত আছে, ঐ শিবলিঙ্গের নিকট শমীবৃক্ষ ছিল। এবং তাহাতে অর্জ্জুন বাণ রাখিয়াছিলেন। বিরাটের অধিবাসী দানশীল ৬২ বৎসর বয়স্ক শ্রীনরোত্তম দাস মোহন্ত (যিনি বিনাব্যয়ে যাত্রীদের থাকিবার ও আহারের স্থান দেন) আমাকে বলিয়াছেন যে, শিমূলগাছের ন্যায় কিন্তু সাদা ফুলযুক্ত শমীবৃক্ষ তিনি বাণেশ্বর শিবলিঙ্গের নিকট দেখিয়াছেন। ঐ গাছ এখন আর নাই। বিরাটের চারি মাইল ব্যবধানে পূর্ব্বদিকে দানিতলা নামক স্থানে সুবৃহৎ হাট বসে। এখানে অর্জ্জুন ভূগর্ভে বাণ মারিয়া জল বাহির করিয়া দ্রৌপদীকে খাওইয়াছিলেন বলিয়া প্রবাদ আছে; এবং একটি কূয়ার ন্যায় স্থান যাত্রীগণকে দেখান হয়। বিরাট নামক স্থানের কয়েক মাইল ব্যবধানে বগুড়া জেলার ভিতর কীচক নামক স্থান আছে। তাহার অল্প দূরে প্রাচীন রাজবাড়ীর ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। কথিত আছে যে, কীচক নামক স্থানে কীচক রাজাকে দাহ করা হয় এবং কয়েক মাইল ব্যবধানে কীচক রাজার বাটী ছিল।

কীচকের নিকট দিয়া ভীমের জাঙ্গাল অর্থাৎ উচ্চমৃত্তিকা প্রাচীর বগুড়া পর্য্যন্ত আসিয়াছে। স্থানীয় কিম্বদন্তী এইরূপ যে, মহাভারতের বিরাট রাজার প্রাসাদ বিরাট নামক স্থানে ছিল। তাঁহার অশ্বশালা

ঘোড়াঘাট নামক স্থানে এবং গোশালা রঙ্গপুর জেলার গোঘাট নামক স্থানে ছিল। মকর-সংক্রান্তির দিন বগুড়ার লোক নিজ নিজ গরুসকল ছাড়িয়া দেয়। কথিত আছে, বিরাট রাজার আমলে এই প্রথা প্রচলিত ছিল। কোনও সময়ে ঐ রাজা করতোয়া নদীতে স্নান করিতে আসেন এবং নদীতীরে স্বকীয় ও অমাত্যগণের বাসস্থান নির্ম্মাণ করাইয়া একটি নগরের প্রতিষ্ঠা করেন। গোবিন্দগঞ্জের নিকটবর্ত্তী রামপুরা নামক সাঁওতাল-পল্লীতে ঐ নগরের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। কথিত আছে, বহুপূর্ব্বে করতোয়া নদী রামপুরার নিম্নভাগে প্রবাহিতা ছিল। বর্ত্তমানে আমি তাহার চিহ্ন দেখিয়াছি। রামপুরার ধ্বংসাবশেষের ভিতর যজ্ঞাহুতি দিবার একটী স্থান আছে। একটি গোলাকৃতি ক্ষুদ্র শুষ্ক পুষ্করিণীর চতুর্দ্দিকে খুব উচ্চ ইষ্টকনির্ম্মিত প্রাচীর—ঐ শুষ্ক পুষ্করিণীর ভিতর ইষ্টকনির্ম্মিত আহুতি দিবার বেদী ছিল। ঐ বেদী এক্ষণে জঙ্গলে আবৃত। আমি সাঁওতাল সঙ্গে লইয়া ঐ বেদীর স্থান জঙ্গল কাটিয়া পরিষ্কার করাইয়াছিলাম; কিন্তু তাহার ভিতর কিছু পাই নাই। বর্ত্তমান করতোয়া নদী ঐ স্থান হইতে খুব বেশী দূর নহে। মৎসংগৃহীত ধাতুমূর্ত্তিটির মধ্যস্থলে বিষ্ণুমূর্ত্তি, তাঁহার দুই অধঃহস্ত ভগ্ন, দক্ষিণ ঊর্দ্ধহস্তে গদা, বাম ঊর্দ্ধহস্তে চক্র। তাঁহার মস্তকে কিরীট, দুই কর্ণে কুণ্ডল, বক্ষে কৌস্তুভমণি, আজানুলম্বিত কটিবাস, আজানুলম্বিনী বনমালা, নাভিদেশলম্বী যজ্ঞোপবীত। পদ্মহস্তা শ্রী ও বীণাহস্তা সরস্বতী যথাক্রমে দক্ষিণে ও বামভাগে দণ্ডায়মানা। ইঁহারা উভয়েই কবরীভূষিতা। বিষ্ণুমূর্ত্তি, শ্রী ও সরস্বতীমূর্ত্তি প্রত্যেকেই এক একটি পৃথক্ পদ্মাসনে দণ্ডায়মান। ইঁহাদের তলদেশে গরুড়-মূর্ত্তি এবং তাহার তলে উপাসকের মূর্ত্তি। সমুদায় মূর্ত্তিটি উচ্চে ১১″, প্রস্থে ৬৷৷০″। মূর্ত্তিটির পশ্চাতে চাল ছিল বুঝা যায়, কিন্তু তাহা জাল দিয়া পুনঃপুনঃ পুষ্করিণী অনুসন্ধান করিয়া আমি পাই নাই।

মূর্ত্তিটি ওজনে /১৷৷৵ (৯০ তোলার মাপে)। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, মূর্ত্তিটি পুরাণোক্ত কোন্ শ্রেণীর বিষ্ণু? আমি যতদূর স্থির করিয়াছি, তাহাতে ইহা অগ্নিপুরাণ, পদ্মপুরাণ ও সিদ্ধার্থসংহিতা অনুসারে ত্রিবিক্রম বা উপেন্দ্রশ্রেণীভুক্ত। দুই হস্ত ভগ্ন হওয়ায় ইহার অধিক বলা যায় না। প্রস্তরমূর্ত্তিগুলির সবিশেষ আলোচনা আমি করিতে চাহি না, কারণ সেরূপ মূর্ত্তি দুষ্প্রাপ্য নহে। তবে একটি মূর্ত্তির নীচে যে কয়েকটি অক্ষর খোদিত আছে, তাহার ব্যাখ্যা এখনও করিতে পারি নাই, সম্ভবতঃ তাহা বিষ্ণুর নামমাত্র। মূর্ত্তি-বিবরণ ও প্রাপ্তিসম্বন্ধে এই স্থানে উপসংহার করিয়া মূর্ত্তির কালনির্ণয়ের আলোচনা করিব। প্রাচীন ধাতুমূর্ত্তিতে কোনও অক্ষর খোদিত না থাকায়, তাহার কাল-নির্ণয় কেবল আনুমানিক মাত্র। এস্থলে প্রথম কথা এই যে, বিরাট নামক স্থানের সহিত মহাভারতীয় বিরাট-রাজার কোনও সম্বন্ধ ছিল কিনা? কারণ যদি আমরা জানিতে পারি যে, মহাভারতীয় বিরাট রাজার প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষের ভিতর ধাতুমূর্ত্তিটি পাওয়া গিয়াছে, তবে তাহার কাল-নির্ণয়ে কথঞ্চিৎ সুবিধা হয়। মনুসংহিতা (২য় অধ্যায়), মহাভারত (সভাপর্ব্ব ও বিরাটপর্ব্ব) হইতে পণ্ডিতগণ নির্ণয় করিয়াছেন যে, মথুরার নিকটবর্ত্তী জয়পুর রাজ্যের অন্তর্গত "বৈরাট" ও "মাচারী" নামক স্থানে প্রাচীন বিরাট রাজ্য ও মৎস্যদেশ ছিল। বিশ্বকোষ হইতে জানা যায় যে, উক্ত বৈরাটসহর দিল্লী হইতে ১০৫ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিম ও জয়পুর রাজধানী হইতে ৪১ মাইল উত্তরে এবং বৈরাট হইতে ৩২ মাইল পূর্ব্বে ও মথুরা হইতে ৬৪ মাইল পশ্চিমে (মাছেরী) "মাচড়ি" নামক প্রাচীন গ্রাম। সুতরাং মহাভারতীয় বিরাট রাজার সহিত রঙ্গপুর জেলার বিরাট নামক স্থানের কোনও সম্বন্ধ নাই বলিয়া অনুমান করা যায়। বিরাট নামক স্থানের দ্বাদশ মাইল ব্যবধানে বগুড়া জেলায় মহা-

স্থান নামে যে প্রাচীন রাজবাড়ীর ধ্বংসাবশেষ আছে, তাহা প্রাচীন পৌণ্ড্র রাজ্যের রাজধানী পৌণ্ড্রবর্দ্ধন নগরীর সহিত অভিন্ন বলিয়া পণ্ডিতগণ অনুমান করেন। স্বর্গীয় পণ্ডিত রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় বলেন যে, পৌণ্ড্ররাজ্য ব্রহ্মপুত্র নামক একটি বিশাল নদকর্ত্তৃক কামরূপ রাজ্য হইতে পৃথক্ ছিল। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে সুপ্রসিদ্ধ চীনদেশীয় পরিব্রাজক হিউ-এন্‌থ্‌ সঙ্গ পৌণ্ড্রবর্দ্ধন হইতে একটি বিশাল নদী অতিক্রম করিয়া কামরূপ রাজ্যে গমন করেন।

করতোয়া-মাহাত্ম্যে উল্লেখ আছে যে, করতোয়া নদী পৌণ্ড্রদেশে প্রবাহিতা ছিল। মিষ্টার বেভারিজ, মেজর রেণেল ও মিষ্টার বুকানন্ হ্যামিণ্টন করতোয়া নদীকে একটি বিশাল নদী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা হইতে বোধ হয়, কামরূপ ও পৌণ্ড্রবর্দ্ধন রাজ্যের দোসীমানা এককালে করতোয়া নদী ছিল। মিষ্টার গেট্ কর্ত্তৃক আসামের ইতিহাসে উল্লিখিত হইয়াছে যে, রঙ্গপুর জেলা কামরূপ রাজ্যের অন্তর্গত ছিল এবং করতোয়া নদী উক্ত রাজ্যের পশ্চিম সীমানাস্বরূপ ছিল। বগুড়া জেলার মহাস্থান এখনও করতোয়া নদী তীরে অবস্থিত। মিষ্টার ফ্রানসিস্ বুকানন্ ১৮০৭ খৃষ্টাব্দে লিখিয়াছেন যে, কলিযুগের প্রারম্ভে করতোয়া নদী ভগদত্ত ও বিরাট রাজ উভয়ের রাজ্যের দোসীমানা স্বরূপ ছিল। মহাভারত হইতে জানা যায় যে, ভগদত্ত কামরূপ বা প্রাগ্‌জ্যোতিষের রাজা ছিলেন এবং দুর্য্যোধনের সমসাময়িক। বুকানন্ সাহেব কোন্ বিরাট রাজার উল্লেখ করিয়াছেন তাহা বুঝা যায় না। তবে আমরা ধরিয়া লইতে পারি যে, বিরাট নামক স্থান পৌণ্ড্ররাজ্যভুক্ত ছিল। ঐ স্থান করতোয়া নদীর পশ্চিম পার্শ্বে বরাবরই অবস্থিত বলিয়া আমি অনুমান করি। স্থানের অবস্থা দেখিয়া আমার এইরূপ ধারণাই জন্মিয়াছে। পৌণ্ড্র রাজ্য পালবংশীয় নরপতিগণ কর্ত্তৃক বিজিত হয় এবং তাঁহারা কাম-

রূপও জয় করেন। তাঁহারা বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। পালবংশ ধ্বংস হইলে সেনবংশীয় তিনজন রাজা ক্রমান্বয়ে কামরূপের সিংহাসন আরোহণ করেন। তৎপর মুসলমানগণ খৃষ্টীয় ১৪৯৮ সালে কামরূপরাজ্য অধিকার করে। মুসলমান-বিজয়ের পূর্ব্বে ও বৌদ্ধরাজ্য ধ্বংস হওয়ার পর হিন্দুগণ শঙ্করাচার্য্যের মতানুযায়ী বিষ্ণুমূর্ত্তি গড়িয়া পূজা করিতে থাকেন। ঐ সময়ে বিষ্ণুপূজার সবিশেষ প্রচলন হয়। মুসলমানেরা বিষ্ণুমূর্ত্তির নাক কাটিয়া বা হস্তপদাদি ভাঙ্গিয়া পূজার অযোগ্য করিয়া দেয়। মুসলমানের ভয়ে হিন্দুগণ মাটির ভিতর বা পুষ্করিণীর মধ্যে প্রতিমা লুকাইয়া রাখিতেন। এই সকল বিষয় হইতে আমি অনুমান করি যে, খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ বা চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে মৎসংগৃহীত ধাতুমূর্ত্তিটি পৌণ্ড্রাজ্যের কোনও হিন্দু-রাজার গৃহে বিরাজমান ছিল। মিষ্টার টিনড়ালের শাসনকালে যে পাঁচটী মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছিল, তাহাও ঐ রাজার গৃহে ছিল বলিয়া আমি অনুমান করি। পৌণ্ড্রাজ্যের অপর নাম বরেন্দ্র-রাজ্য। প্রবন্ধের উপসংহারে ঘোড়াঘাট ও তাহার নিকটে যে প্রাচীন ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি দেখা যায়, সে বিষয়ে কিছু আলোচনা করিব।

ঘোড়াঘাট নামক যে গ্রাম এক্ষণে সর্ব্বসাধারণের নিকট পরিচিত, তাহার পূর্ব্বে চতুর্দ্দিক পরিখা ও তৎপর উচ্চ প্রাচীরবেষ্টিত জঙ্গলাকীর্ণ স্থান প্রাচীন ঘোড়াঘাট সহরের ধ্বংসাবশেষ। ইহার ভিতর সুন্দর রাস্তা, উৎকৃষ্ট কলমের আম্রগাছ আছে। নদীতীরে দুইপ্রান্তে দুইটি কেল্লার স্থান আছে। অট্টালিকার মধ্যে কেবল একটি প্রাচীন ভগ্ন মস্‌জেদ ও তৎসংলগ্ন বহু পুরাতন খুব বৃহৎ একটি ইঁদারা আছে। ঘোড়াঘাট হইতে ৫ মাইল ব্যবধানে হিলি যাইবার রাস্তার ধারে একটি খুব প্রাচীন মস্‌জেদ্ আছে। ইহার দেওয়ালে ইটের উপর অনেক প্রকার সুন্দর সুন্দর কাজ করা এবং তন্মধ্যে কতকগুলি খুব বড় পাথর আস্ত বসান আছে।

এই মস্‌জেদ্ মুসলমানদের খুব পবিত্র স্থান। হিলির কালীবাড়ী খুব প্রাচীন স্থান। মন্দিরটি জীর্ণ হইয়াছে, ইহার গায়ে ইটের উপর নানা-প্রকার কারুকার্য্য আছে। মন্দিরের নিকট একটি প্রাচীন পুষ্করিণীর তটদেশ খনন করায় ইষ্টকনির্ম্মিত সুবৃহৎ সোপান বাহির হইয়া পড়িয়াছে। হিলির রেলষ্টেশনের নিকট রাস্তার ধারে একটি ভগ্নপ্রস্তরমূর্ত্তি আছে। তাহাতে বাসুদেব ও লক্ষ্মী উভয়েই পাশাপাশি দণ্ডায়মান। বাসুদেব লক্ষ্মীর পাশাপাশি মূর্ত্তিযুক্ত প্রস্তর আমি আর দেখি নাই।

শ্রীঅবনীচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

ঐতিহাসিক প্রবন্ধ

[প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য অবলম্বনে বঙ্গের বণিক-জাতির ইতিহাস ও জাতীয় ইতিহাস সঙ্কলনের কিঞ্চিৎ আভাস]

যদি বঙ্গের ব্রাহ্মণজাতি মিথিলা, কনৌজ প্রভৃতি দেশ হইতে আগত হইয়া থাকেন, যদি বঙ্গের কায়স্থজাতি দ্বারবঙ্গ দিয়াই বঙ্গে প্রবেশ করিয়া থাকেন, যদি বঙ্গের বৈদ্যজাতি বাঙ্গালার সেন রাজগণেরই বংশধর হন, তবে বঙ্গের বণিকসম্প্রদায় এ দেশের আগন্তুক বা আদিম প্রশ্নের মীমাংসার দাবীও উঠিতে পারে। নেটিভ বলিয়া পরিগণিত হওয়া শুধু ভারতে নহে চিরকালই সকল দেশেই নিন্দার কথা। প্রাচীন ও আধুনিক এই দুই শ্রেণী-বিভাগ সকল দেশের অধিবাসীই সর্ব্বদা আপনাদের মধ্যে

করিয়া থাকেন এবং প্রাচীনত্ব অপেক্ষা আধুনিকত্বের প্রতিই অধিকাংশের আসক্তি দেখা যায়। প্রকৃত পক্ষেও একটু চিন্তা করিলেই বুঝা যায় মানুষের এই স্বাভাবিক আসক্তি একেবারে ভিত্তিহীন নহে বা শুধু ভাব-মূলক নহে। মানুষ অতি-দীর্ঘকাল স্থানবিশেষে আবদ্ধ থাকিলে খর্ব্বতা যেন তাহাকে সর্ব্বদিক হইতেই আক্রমণ করে। তাই যে দেশবিশেষ বা সমাজবিশেষে যাহাকে যখন উচ্চতাভিমুখী দেখা যায়, তাহার আধুনিকত্বই যেন মানবজাতির পরিক্রম বিধি অনুযায়ী ও সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। বাঙ্গালার ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থজাতি হিন্দুদের মধ্যে যদি এদেশের প্রতিপন্ন জাতি হন, তবে এদেশের বণিক-জাতিও নিতান্ত অপ্রতিপন্ন নহেন। তাঁহাদের উচ্চতা এবং বিস্তৃতিও সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এ কথাও কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না; কিন্তু হিন্দুসমাজে তাঁহাদের কিছু হেয়তা আছে তাহাও দৃষ্ট হয়।

তাহা হইলে বঙ্গীয় বণিকজাতির বিষয় আলোচনা করিতে গেলে দুইটী প্রশ্ন উঠে। প্রথম, বঙ্গীয় বণিকজাতি এ দেশের আদিম অধিবাসী বা আগন্তুক? দ্বিতীয়, হিন্দুসমাজে এই সম্প্রদায়ের যে হেয়তা দৃষ্ট হয় তাহার হেতু কি?

জাতিতত্ত্ব আলোচনা বা বিচার করিতে গেলে আজকাল এ দেশে যে প্রথা প্রচলিত হইয়া পড়িতেছে অর্থাৎ শাস্ত্রীয় পৌরাণিক বচন উদ্ধৃত করিবার যে নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইতেছে, তৎসম্বন্ধে আমি প্রথমেই বলিতে বাধ্য হইতেছি তেমন দুঃসাহস আমার নাই; কারণ একে ত শাস্ত্ররূপ শৈলে আরোহণ করিবার ক্ষমতাই আমার নাই এবং যদিও শাস্ত্রীয় বচনেই উক্ত আছে 'শনৈঃ শনৈঃ পর্ব্বত লঙ্ঘনং' আমার তেমন ধৈর্য্যও নাই। কিন্তু কথা এই যে, আমার বিশ্বাস শাস্ত্ররূপ শৈল সর্ব্বদাই এমন কুজ্ঝটিকায় আবৃত আছে যে, যাঁহারা কোনও ক্রমে তথায় উপস্থিত হইতে পারিয়াছেন,

তাঁহারও দৃষ্টিশক্তিরহিত হইয়া রত্নভ্রমে যাহা কিছু নিকটে পান, তাহা দর্শনের অভাবে শুধু হাতের জোরেই সংগ্রহ করিয়া ফেলেন; কারণ এই শ্রেণীর প্যাহাড়ীবাবাগণ মধ্যে মধ্যে আমাদের নিকট তাঁহাদের শ্রমসাধ্য, কষ্টলব্ধ যে সকল সংগ্রহসম্ভার আনিয়া উপস্থিত করেন আমরা খুঁজিয়া দেখি তাহার মধ্যে মূল্যহীন, অকিঞ্চিৎকর নুড়ি শিলাখণ্ডই অধিক, মূল্যবান্ প্রস্তর অতি অল্পই থাকে। সুতরাং শাস্ত্রীয় পন্থা আদৌ পরিত্যাগ করিতে আমি বাধ্য। শিক্ষিত সমাজের নিকট শাস্ত্রীয় অশ্রদ্ধা-প্রকাশ মূঢ়তা হইতে পারে, কিন্তু তাৎকালিক একমাত্র শিক্ষিত কতিপয় সংস্কৃতজ্ঞ বঙ্গীয় জাতিতত্ব বিষয়ে স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতার সহিত লিপি-চালন করিয়া শিক্ষার গৌরব রক্ষা করিতে সমর্থ ছিলেন কিম্বা উদরের দায়ে হস্ত বিক্রয় করিয়া স্থলবিশেষে দুষ্ট যন্ত্রের ন্যায়, কোথায়ও বা বলী-বর্দ্দের তুষ্টি-সাধনোপযোগী কণ্ডুয়ন দন্তের ন্যায় লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন কিনা এ বিচারের ভার আধুনিক সংস্কৃতজ্ঞের উপরই ন্যস্ত করিলাম।

এ মোটা কথা সকলেই বুঝিতে পারেন, তৎকালে সংস্কৃতজ্ঞের সংখ্যা অতি অল্প ছিল; ভিন্ন ভিন্ন স্থলে তাঁহারা ভিন্ন ভিন্ন প্রতিপালক নরপতি দেশপালগণের আশ্রয়ে বাস করিতেন; সংস্কৃতজ্ঞগণের একটা বিশেষ সমাজ তখনও হইয়া উঠে নাই বা হইলেও তাহার কোন শক্তি বা বলাধান তখনও হয় নাই। শিক্ষিতগণ বিক্ষিপ্ত অসম্বদ্ধ অবস্থায় বাস করিতেন। এরূপ ক্ষেত্রে তাঁহাদের প্রতিপালক বা আশ্রয়দাতাগণ তাঁহাদিগকে মুদ্রা-যন্ত্রের ন্যায় ইচ্ছানুরূপ ব্যবহার করিতেন ইহা অতি সহজবোধ্য; প্রবৃত্তি থাকিলেও স্বাধীনতা রক্ষা করা সম্ভব ছিল না। মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা লোপ শুধু এই যুগের কলঙ্ক নহে। সকল যুগেই এই পাপ মনুষ্যের স্বাধীন চিন্তায় বড় একটি অন্তরায়। তাৎকালিক দেশপালগণ কর্ত্তৃক রাজকীয় আবশ্যকতা বা ঈর্ষামূলে প্রতিদ্বন্দ্বী জাতির বিরুদ্ধে তাহাদের কাল্পনিক

হেয়তাসূচক কথা সংস্কৃতজ্ঞকর্ত্তৃক লিপিবদ্ধ করান অতি স্বাভাবিক এবং তাহা বহুস্থলে ঘটিয়াছে; কিম্বা নিজেদের জাতিগত হেয়তা থাকিলেও দেশপালগণ তাহা গোপন করাইয়া সংস্কৃতজ্ঞকর্ত্তৃক নিজেদের উচ্চতা যথা কেহ সূর্য্যবংশসম্ভূত, কেহ চন্দ্রবংশ সম্ভূত, কেহ অগ্নিকুলসম্ভূত ইত্যাদি কাল্পনিক অসত্য কথা লিপিবদ্ধ করানও অতি স্বাভাবিক এবং তাহাও বহু স্থলে ঘটিয়াছে। জাতিতত্ত্ব বিষয়ে সংস্কৃত-বচনের অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হইবার এই আশঙ্কা। বরং আমার ধারণা, বঙ্গীয় বা ভারতীয় যে কোন জাতির বিবরণ একবার সংস্কৃত-কণ্টকে কণ্টকিত, তাহার জাতীয় তথ্য উদ্ধারের আশা দুরাশা।

ভারতীয় বা বঙ্গীয় যে কোন জাতি নিজেদের ঐতিহাসিক তথ্য-নির্ব্বাচনে যতটা পরিমাণে পৌরাণিক সংস্কৃত বচনের উপরে নির্ভর করিবেন তাঁহাদের সত্য-দর্শন তত দূরবর্ত্তী এবং তাঁহাদের চেষ্টা তত বৃথা ও হাস্যাস্পদ। আমি নিজে কায়স্থ হইলেও আমার বলিতে মস্তক অবনত হয় যে, যমরাজ-সেরেস্তার মুন্সী বা নিকাশনবিস চিত্রগুপ্তের বংশধর। কায়স্থসভার ধনভাণ্ডারেব নাম চিত্রগুপ্তভাণ্ডার দেখিয়া ক্ষোভে লজ্জায় মন অবসন্ন হয়। ইহা একদিকে যেমন চিন্তাহীনতার পরিচয়, অপরদিকে তেমনি শ্রমকুণ্ঠতার লজ্জাস্কর দৃষ্টান্ত। আলস্য-পরায়ণের ক্ষণিক উত্তেজনাজাত ক্ষিপ্রকারিতার সহিত পৌরাণিক ভাণ্ডারে প্রবেশকরতঃ সংস্কৃত-বচন সংগ্রহ করিয়া আনিয়া জাতীয় তথ্য উদ্ধার করিলাম, ঐ গৌরব বৃথা, তাহাতে আত্মতৃপ্তি হয় না বরং আত্ম-বঞ্চনা হয়। যদি তথ্য-উদ্ধার উদ্দেশ্য হয়, অক্লান্ত পরিশ্রমসহকারে, "রাগ-দ্বেষ"-বিবর্জ্জিত, নিরপেক্ষ, সত্যশীল বিচারকের ন্যায় অতীত, বর্ত্তমান সমস্ত অবস্থা পর্য্যালোচনা করিতে করিতে অগ্রসর হও, সর্ব্বদাই সত্যকে ধ্রুব লক্ষ্য রাখিতে হইবে, ভুল হয় ক্ষতি নাই, কিন্তু জ্ঞানতঃ অসত্যকে

উপাসনা করিও না, ঐতিহাসিকের পক্ষে তাহা মহাপাপ। পৃথিবীতে অসত্যই এখনো বড়, সত্য অতি ক্ষীণ। প্রকৃত বৈজ্ঞানিক, প্রকৃত ধার্ম্মিক, প্রকৃত রাজনৈতিক যেমন এই সত্যব্রত অবলম্বন করিয়া জগতে সত্যযুগ স্থাপনের দায়ীত্ব ও ভার স্কন্ধে লইয়াছেন। হে ঐতিহাসিক, তাহাতে তোমারও দায়ীত্ব বা ভার কাহারও অপেক্ষা ন্যূন নহে, এ বিশ্বাস এ জ্ঞান যেন তোমার সকল চেষ্টা, সকল শ্রম প্রয়াসের মূলমন্ত্র হয়।

এইরূপ ক্ষেত্রে জাতীয় তথ্যনির্ব্বাচনে পৌরাণিক সংস্কৃত বচনের অনুসন্ধান পরিত্যাগ করিতে আমি বাধ্য।

কিন্তু দীনা, সরলা, গ্রাম্য মাতৃভাষা ছলনা-চাতুরীর বহির্ভূত ছিলেন। তাঁহার প্রথম সন্তান গ্রাম্য কবিগণ অনুকরণপ্রবণ গগনবিহারী পাখীর ন্যায়ই গ্রাম্যবুলিগুলি অবিকল গাহিয়া গিয়াছেন; অপরিপক্ক শিক্ষানবিসের ন্যায়ই বটে, কিন্তু "যদ্দৃষ্টং তল্লিখিতং" ঠিক যথাযথরূপেই, নিজেদের মুন্সীয়ানা বা ভাস্করপটুতার কোন ব্যবহার না করিয়া তাঁহারা তাৎকালিক সামাজিক ছবি হুবহু অঙ্কিত রাখিয়া গিয়াছেন। মাতৃভাষার এই বিশুদ্ধ অপাপ-বিদ্ধ রত্নরাজিমধ্যে যে সত্যধন নিহিত আছে তাহার সদ্ব্যবহার করিলে তাৎকালিক সামাজিক চিত্র অনেকটা হস্তগত করা যায় এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।

বণিক-সম্প্রদায়ের নায়কত্বপূর্ণ পদ্মাপুরাণ, চণ্ডী, শীতলামঙ্গল, সত্য-নারায়ণের পাঁচালী, শনির পাঁচালী প্রভৃতি গ্রন্থে এই সম্প্রদায়ের তথ্য উদ্ধারকল্পে অনেক সাহায্য করিতে পারে। এই সমস্ত গ্রন্থের লেখক এক নহে—বহু। শনি-সত্যনারায়ণের পাঁচালীর লেখক সংখ্যাতীত। এখানে একটি বিশেষ কথা মনে রাখিতে হইবে যে, ঐ সকল গ্রন্থগুলি যে সময়ে বাঙ্গালা দেশে লিখিত হয়, কিম্বা যে সমস্ত গ্রন্থকার, যথা—পদ্মাপুরাণের গ্রন্থকার বিজয়গুপ্ত, চণ্ডীর গ্রন্থকার কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম,

শীতলামঙ্গলের গ্রন্থকার দৈবকীনন্দন, ঐ সমস্ত গ্রন্থগুলির প্রসিদ্ধ লেখক বলিয়া খ্যাত, আছেন সেই সমস্ত গ্রন্থকারই যে ঐ সমস্ত উপাখ্যান প্রণয়ন করিয়াছিলেন তাহা নহে, কিম্বা তাঁহাদের নিকটবর্ত্তী কোন অতীত কালের উপাখ্যানই যে তাঁহারা লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন তাহাও নহে; ঐ সমস্ত গ্রন্থকারের বহুপূর্ব্ব হইতেই ঐ সমস্ত গীতি বঙ্গভাষায় চলিত ছিল।

বৈষ্ণবযুগে যে নবপ্রবাহ Renaisance দেশে আসিয়াছিল তাহারই প্ররোচনায় ঐ সমস্ত কবিগণ বৈষ্ণবযুগের পরবর্ত্তীকালে বঙ্গভাণ্ডারের বহু পুরাতনগুলি আপনাদের প্রতিভাদ্বারা প্রতিফলিত করিয়াছিলেন মাত্র। যেমন উদাহরণস্থলে বলা যাইতে পারে ইংরাজী সাহিত্যের কবি-চূড়ামণি Shakespearএর উপাখ্যানগুলির অধিকাংশ তাঁহার নিজস্ব নহে। বৈষ্ণব-সাহিত্যের বহুস্থলে তৎকাল প্রচলিত মনসা বা বিষহরির পূজা ও চণ্ডীপূজার উল্লেখ আছে, তাহাতেই স্পষ্ট বোধ হইবে ঐ উপা-খ্যানগুলি পরবর্ত্তী কোন কবিরই নিজস্ব নহে, বৈষ্ণবযুগের বহুপূর্ব্ব হইতেই বিদ্যমান ছিল। চৈতন্য-ভাগবতের একস্থলে এইরূপ উল্লেখ আছে—

"মঙ্গল চণ্ডীর গীত করে জাগরণে।
দম্ভ করি বিষহরি পূজে কোন জনে॥"

এখন ঐ গীতিগুলির জন্মকাল নির্দ্ধারণ করিবার প্রয়াস আবশ্যক বটে, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে কৃতকার্য্য হওয়া সম্ভবপর নহে। তবে বর্ত্তমান প্রবন্ধের উপযোগী মোটামুটি একটা ধারণা অবশ্যই করা যাইতে পারে। ঐ সমস্ত গীতিগুলির মধ্যে মনসার গীতি বা ভাসানই সর্ব্বপ্রাচীন। চণ্ডীর গীত তৎপরবর্ত্তী। শীতলা, সত্যনারায়ণ ও চণ্ডীর গীত আরও পরবর্ত্তী।

এই সমস্ত গীতি বা গ্রন্থগুলির সহিত বণিক সম্প্রদায়ের সম্বন্ধ কি? ইহাই প্রশ্ন। ইহাদের নায়ক সর্ব্বত্রই বণিক-সম্প্রদায়। অবশ্যই ইহাতে বণিকদিগের কৃতিত্ব বা প্রশংসার কীর্ত্তন নাই, তাঁহাদের নির্য্যাতনের কথাই অধিক, কিন্তু তাহাতেই বণিক-সমাজের তৎকালের অবস্থা ও বিবরণ, বহু পরিমাণে প্রতীয়মান হইবে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বঙ্গের অন্য কোন জাতীয় সম্প্রদায় বঙ্গীয় গায়ক বা লেখকগণের এতদূর মনোযোগ আকর্ষণ করে নাই।

পূর্ব্বোক্ত গীতিগুলি তৎ তৎ ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের আদিগ্রন্থ, বাইবেল বা কোরাণস্বরূপ অভিহিত হইতে পারে। প্রত্যেকগুলির উপাখ্যানই কি ধর্ম্ম-প্রচারের মহাগীতি। পদ্মাপুরাণ বা মনসার ভাসান বঙ্গে মনসা দেবী অর্থাৎ সর্পপূজা, প্রবর্ত্তনের মহাগ্রন্থ, চণ্ডীকাব্য, চণ্ডীরপূজা-প্রবর্ত্তনের মহাগ্রন্থ। শীতলামঙ্গল, সত্যনারায়ণের পাঁচালী, শনির পাঁচালী ইত্যাদিও তদ্রূপ। বঙ্গে এই সমস্ত ধর্ম্ম-প্রবাহ কখন আরব্ধ হয়, তাহাই অনুসন্ধান করিলে ঐ সকল গীতিগুলির জন্মকাল ও জন্মস্থান সম্বন্ধে অনেকটা ধারণা হইবে।

স্থলবিশেষে ব্যক্তিবিশেষ কর্ত্তৃক ধর্ম্মভাব উদ্বুদ্ধ হইতে পারে, কিন্তু ঐ ভাব-প্রবাহের আকার ধারণ করিতে হইলে, পৃথিবীর ইতিহাসে ইহাই দেখা যায় যে, রাজকীয় ক্ষমতা তাহাতে বেগ প্রদান না করিলে ঐ প্রবাহ তেমন বলবৎ হয় না, দুই দিন পরেই লুপ্ত হইয়া যায় বা আদৌ প্রবাহের আকার ধারণ করে না।

উদাহরণস্থলে বঙ্গের বৈষ্ণবধর্ম্ম ও আধুনিক ব্রাহ্মধর্ম্মের উল্লেখ করা যাইতে পারে। উভয়টিই বৈদেশিকের রাজত্বকালে উদ্ভূত, উভয়কেই রাজক্ষমতা হইতে বহুদূরে আপনাকে অবস্থিত রাখিতে হইয়াছে, এবং উভয়ের পরিণতিও প্রায় একই প্রকারের। উভয়েরই সার্ব্বজননীতা

সত্ত্বেও স্বল্পজনতাই দৃষ্ট হয়। ভারতের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তের নানকের মতও বহুকাল প্রবাহহীন ছিল পরে রাজক্ষমতার সহিত যুক্ত হইয়াই প্রবল আকার ধারণ করে।

রাজশক্তির সাহায্যে ধর্ম্মপ্রবাহের কি অবিরোধ গতি হয়, তাহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত দিন ও দুনিয়ার মালিক মহম্মদের ইসলাম-ধর্ম্ম। ইহা অতি অল্পকাল মধ্যেই রাজবলে পুরাতন পৃথিবীর একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। রাজক্ষমতার অভাব হইলে ধর্ম্ম-প্রবাহের কি দুর্গতি হয়, তাহার শোচনীয় দৃষ্টান্ত ভারতের বৌদ্ধধর্ম্ম। গুপ্তরাজগণের তিরোভাবের সঙ্গে সঙ্গেই বৌদ্ধধর্ম্ম ভারত হইতে প্রায় বিচ্ছিন্ন হইয়াছে; যাহা কিছু অবশেষ আছে, তাহার সেই সাম্যনতা প্রচারক উন্নতভাবো-দ্দীপক ক্ষমতাই নাই। তাহা সমানতার বিকার সামান্য পীপিলিকা, মক্ষিকা, পতঙ্গাদির প্রতি আসক্তিতে পরিণত হইয়াছে এবং স্থলবিশেষে হীনাঙ্গীয় পৌত্তলিকতায় পরিণত হইয়াছে।

বঙ্গের মনসা, চণ্ডী, শীতলা, সত্যনারায়ণ ইত্যাদি যেরূপ গৃহে গৃহে বদ্ধমূল, ঐ সমস্ত ধর্ম্মপ্রবাহ যেরূপ দীর্ঘকালব্যাপী ও বলবৎ তাহা দেখিয়া অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, রাজক্ষমতা ঐ সমস্ত ধর্ম্মমতগুলিকে অতি বিশিষ্টভাবে বেগ প্রদান করিয়াছিল। এখন এই রাজক্ষমতা কোন যুগের তাহাই বিবেচ্য।

পশ্চিমাগত বর্ম্ম বা শূরবংশীয় বঙ্গীয় রাজগণ বৈদিক ধর্ম্ম-প্রচারের প্রয়াসী ছিলেন, সুতরাং তাঁহাদের সময়ে এরূপ কাণ্ড সম্ভবপর নহে। উত্তরাগত পালরাজগণ বৌদ্ধভাবাপন্ন ছিলেন, তাঁহাদের সময়েও এরূপ প্রত্যাশা করা যায় না। বঙ্গের শেষ হিন্দু রাজা সেনরাজগণ কি ঐ সমস্ত ধর্ম্মমতের প্রতিপোষক নহেন? ঐ সমস্তগুলি প্রত্যেকেই লৌকিকধর্ম্ম তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু রাজগণও জন-সাধারণের বহি-

ভূত নহেন। তাঁহাদের প্রবৃত্তি ও সংস্কার অনুযায়ী হইলে যে কোন ধর্ম্মমত রাজসাহায্য হইতে বঞ্চিত থাকে না।

সেনরাজগণের পূর্ব্বপুরুষ দক্ষিণাগত বলিয়া প্রসিদ্ধ। বঙ্গের দক্ষিণ-দ্বার চিরকালই উন্মুক্ত ; ঐ মলয়মারুত নির্ব্বাচিত পথে ভাল মন্দ অনেক জিনিসই বঙ্গে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। দক্ষিণী বৈষ্ণব স্রোত মাধবেন্দ্র-পুরীর মত মৃদঙ্গনাদে নৃত্য করিতে করিতে, মৃদু জোয়ারের জলের ন্যায় ছল ছল আঁখি জলে ভাসিয়া ভাসিয়া বঙ্গে প্রবেশ করে এবং ইহাই কালে চৈতন্যসাগরী হইয়া দেশ প্লাবিত করিয়াছিল বটে কিন্তু সেখানেও, পূর্ব্বেই বলিয়াছি, রাজসাহায্যভাবে তাই তাহা ক্রমে পঙ্কিল খাতে পরিণত হইয়াছে। ধর্ম্মপ্রবাহ ভিন্ন অন্যবিধ প্রবাহের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেও দেখিতে পাই, দক্ষিণী জোয়ারেই প্রথমে পর্ত্তুগীজ, ডচ্, ফরাসী এবং অবশেষে ইংরেজ এদেশে প্রবেশ করে। হে দক্ষিণ দ্বার! তোমার অপার উদারতার ফলে গৃহস্বামী বাঙ্গালীর ভাল মন্দর বিচার ভবিষ্যৎ বংশীয়েরাই করিতে পারিবে আমরা অক্ষম।

যাহা হউক, যে সেনরাজগণের কথা বলিতেছিলাম, তাঁহাদের ইতিহাস মোটামুটি এইরূপ। সেনরাজগণের পূর্ব্বপুরুষ দক্ষিণাগত ইহা বদ্ধমূল ধারণা। কিন্তু কত দক্ষিণ তাঁহা নির্দ্দিষ্ট করা সহজ নহে। দ্রাবিড়, কর্ণাট প্রভৃতি দেশে তাঁহাদের কোন ইতিহাস পাওয়া যায় নাই। বিশেষতঃ বিদেশে রাজ্যস্থাপন করিতে পারে এমন কোন বীরজাতি তথায় বাস করিত কিনা সন্দেহ। সম্ভবতঃ সুন্দরবন অঞ্চল যখন সমৃদ্ধ ছিল তখন সেইখানে সেনরাজগণের পূর্ব্বপুরুষ মস্তকোত্তোলন করেন। তথাকার তাৎকালিক চণ্ড প্রভৃতি দুর্দ্ধর্ষ জাতিদিগকে প্রতিদ্বন্দীতায় পরাহত করিয়া ক্রমশঃ সেনরাজগণের পূর্ব্বপুরুষগণ খ্যাতি লাভ করে এবং সুন্দরবন অঞ্চল যখন হঠাৎ আকস্মিক কারণে বিধ্বস্ত হয় তখন সেই দেশ পরিত্যাগ

করিতে বাধ্য হন। চণ্ডজাতি উত্তরাভিমুখী গতি অবলম্বন করে এবং সেনগণের পূর্ব্বপুরুষ দক্ষিণ পশ্চিম বঙ্গের দিকে অগ্রসর হয়। তাহারা দক্ষিণে কর্ণাট পর্য্যন্তও অগ্রসর হইয়াছিল। ঐতিহাসিক অনুসন্ধান এ পর্য্যন্ত যতদূর অগ্রসর হইয়াছে তাহাতে সেনগণের পূর্ব্ব পুরুষকে প্রথমে আমরা কর্ণাট রাজ্যে সৈনিক বা যোদ্ধৃপুরুষরূপে দেখিতে পাই। কর্ণাট রাজ্যের উপর লুণ্ঠনকারী দুর্ব্বৃত্তগণের প্রকোপ বৃদ্ধি হইলে কর্ণাটরাজ সেনরাজগণের পূর্ব্বপুরুষ সামন্ত সেনকে যোদ্ধৃপুরুষরূপে নিয়োগ করেন এবং সামন্ত সেন লুণ্ঠনকারীদিগকে দমন করেন। যথা,—

দুর্ব্বৃত্তানাময়মরিকুলাকীর্ণ কর্ণাট-লক্ষ্মী
লুণ্ঠাকানাং কদন মতনোত্তাদৃণেকাঙ্গবীরঃ।

সামন্ত সেন 'একাঙ্গবীর' ছিলেন অর্থাৎ সেনার এক অঙ্গ-অংশ, একাই চালনা করিতে পারিতেন। উপরোক্ত শ্লোকের শেষ দুই চরণে কবি অতিশয়োক্তি দ্বারা বলিতেছেন 'তাই যমরাজ দক্ষিণ দিকে বসা মাংস প্রভৃতি প্রচুর খাদ্য দ্রব্য পাইয়া অদ্যাপিও পরিত্যাগ করেন নাই।' যথা,—

যস্মাদদ্যাপ্যবিহত বসা-মাংস-মেদঃ সুভিক্ষাং।
হৃষ্যৎ পৌরস্ত্যজতি ন দিশাং দক্ষিণাং প্রেতভর্ত্তা॥

ইহা দ্বারা ইহাও সূচিত হইতেছে যে, সামন্ত সেনকে আর অধিক দক্ষিণে অগ্রসর হইতে হয় নাই, যমরাজের উপর ভার দিয়াই নিশ্চিন্ত ছিলেন। বোধ হয় এই সময়েই প্রথমে সেনরাজগণের পূর্ব্বপুরুষ "সেন" (সেনা শব্দের অপভ্রংশ) অর্থাৎ বীর (যথা, ভীমসেন বিক্রমসেন) উপাধি প্রাপ্ত হন। এইরূপ অবস্থা হইতেই সেনগণ ক্রমশঃ ক্ষমতাশালী হইতে থাকেন এবং রাজত্ব স্থাপন করিয়া ইতিহাসপ্রসিদ্ধ হইয়াছেন। কর্ণাটাদি অঞ্চল হইতে ক্রমশঃ বলাধানপূর্ব্বক উত্তরাভিমুখে অগ্রসর হইতে থাকেন। এই সত্যের সূত্র অবলম্বন করিয়াই পরবর্ত্তীকালে সেনগণের পূর্ব্বপুরুষ

বীরসেন নামক কোন দাক্ষিণাত্য ক্ষৌণীন্দ্র বা পৃথিবীপতিকে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। কিন্তু উক্ত বীরসেন অমূলক কাল্পনিক ব্যক্তি। বর্ত্তমানে বল্লাল-সেনের যে তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে, শ্রীযুক্ত তারকচন্দ্র রায় মহাশয় যাহার পাঠোদ্ধার করিয়া বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায় ১৩১৭ সালের ৪র্থ সংখ্যায় প্রকাশিত করিয়া ঐতিহাসিক কুহেলিকা অনেকটা দূর করিয়াছেন, তাহাতে বল্লালসেনের পূর্ব্বপুরুষগণের নামের মধ্যে বীরসেনের উল্লেখ নাই। যদিও দেওপাড়ায় আবিষ্কৃত বিজয়সেনের খোদিত লিপিতে বীরসেনের উল্লেখ আছে এবং ক্ষৌণীন্দ্র বলিয়াই পরিচয় আছে তাহা হইলেও বল্লালসেনের তাম্রশাসনখানিই বিশেষ প্রামাণ্য জিনিস। কারণ এখানি একখানি দানপত্র, রাজদপ্তরের দলিলের নকলতে ইহাতে যতদূর সম্ভব সত্য রক্ষা করা হইয়াছে, তাহাতে অসত্য বা কল্পনা ইহাতে বড় স্থান পায় নাই। এই সেনগণ ক্রমশঃ উত্তরাভিমুখী হইয়া "প্রৌঢ়া রাঢ়া" অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত প্রাচীনতর রাঢ়দেশের মধ্য দিয়া ক্রমশঃ শক্তিসঞ্চার করতঃ পদ্মা ভাগীরথীর সঙ্গমস্থল অতিক্রম করিয়া বরেন্দ্রে আসিয়া উপস্থিত হন এবং এই সময়ে ও স্থানে বল্লালসেনের পিতা বিজয়সেন প্রথমে রাজত্ব স্থাপন করিতে সমর্থ হন। তৎপূর্ব্বে সেনগণ রাজ্য শাসন করেন নাই। প্রাগুক্ত তাম্রশাসনে বল্লালসেনের পূর্ব্বপুরুষ সামন্ত ও হেমন্ত সেনের নামোল্লেখ আছে, কিন্তু উক্ত সেনদ্বয় রাজোপাধিসূচক কোন বিশেষণে বিভূষিত নহেন। বিজয়সেনের নামের সঙ্গেই প্রথমে "অখিল পার্থিব চক্রবর্ত্তী পৃথ্বিপতি" বিশেষণ দেখিতে পাই। বিজয়সেনের পুত্র বল্লালসেন অবশ্যই রাজচক্রবর্ত্তী হইয়াছিলেন, এবং পালরাজগণের প্রতিপত্তি প্রহত করিয়া গৌড়রাজ্য অধিকার করেন।

সেনগণ কর্ত্তৃক প্রতিপত্তি স্থাপনের সময়ে বঙ্গের অন্যান্য অঞ্চলে শূর, বর্ম্ম ও পালবংশীয়েরা রাজ্যবিস্তার ও সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মবিস্তারকল্পে

পরস্পর বিবাদকলহে লিপ্ত ছিলেন। শূর ও বর্ম্মবংশীয়েরা পুনরুত্থিত বেদসম্মত মতের এবং পাল-বংশীয়েরা বৌদ্ধমতের প্রচারে প্রয়াসী ছিলেন। এ ক্ষেত্রেও ব্রাহ্মণ নামধারী যাজকগণ বেদবিদ্বেষী বা বেদানুরক্ত বলিয়া কোন বাদবিচার করিবার অবসর পান নাই। কারণ মানুষ চিরকালই উদরানুরক্ত। রাষ্ট্রীয় কলহে পালরাজগণ বলবত্তর হইয়া উঠিলে দেশের অধিকাংশ ব্রাহ্মণই পালরাজগণের আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং পালরাজগণ কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট মত নিজেদের ভবিষ্যৎ চিন্তার সহিত খাপ খাওয়াইয়া তাৎকালিক ব্রাহ্মণগণ এ দেশে এক প্রকার কিম্ভূত-কিমাকার ধর্ম্ম-যাজন করিতেছিলেন, তাই বঙ্গের ভাগ্যে প্রকৃষ্ট বৌদ্ধধর্ম্মের দর্শন কথনই ঘটিতে পারে নাই; ধর্ম্মপূজা, শীতলাপূজা প্রভৃতি পূজাবহুল নিকৃষ্ট অঙ্গের বৌদ্ধধর্ম্মের হীন আভাস রাহুগ্রস্ত সূর্য্যালোকের ছায়ার ন্যায় বঙ্গের উপর দিয়া কোন সময়ে চলিয়া গিয়াছে মাত্র। এই সময়ে ব্রাহ্মণগণ পালে পালে এরূপভাবে পালরাজগণের হস্তগত হন যে শূর ও বর্ম্মবংশীয়েরা এদেশে খুব কম সংখ্যক ব্রাহ্মণই পাইতেন। উদরের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা উপস্থিত হইলেই (ধর্ম্মের) ভাণ ধরা পড়ে। হে উদর তোমার কি অনির্ব্বচনীয় মহিমা, তোমার গহ্বরেই ধর্ম্মস্য তত্বং নিহিত আছে। ঋষিগণ তোমার অনুসন্ধান না পাইয়া বৃথাই পর্ব্বত-গহ্বরে প্রবেশ করিয়াছিলেন। তুমিই সেই চক্ষুরাততং, তোমার আভ্যন্তরিক কার্য্য লোক-চক্ষুর বহির্ভূত।

এই অবস্থায় শূর বা বর্ম্মবংশীয় রাজগণ বিদেশ হইতে আগত ব্রাহ্মণ-দিগকে বহু প্রলোভন দিয়া নিজ রাজ্যে বাস করাইতেন। দেশ-বিদেশে এই প্রলোভনের কথা ছড়াইয়া পড়িলে এ দেশে ব্রাহ্মণগণের যে আগমন-প্রবাহ বা আমদানী আরব্ধ হয়, তাহাই বঙ্গে আদিশূর কর্ত্তৃক এ দেশে পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনয়নের কাহিনীস্বরূপ প্রসিদ্ধ আছে ও শ্যামলবর্ম্মা কর্ত্তৃক 'বৈদিক ব্রাহ্মণ' আনয়নের কথার ন্যায় খ্যাত আছে।

আদিশূরকর্ত্তৃক পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনয়নের কাহিনী এক প্রকাণ্ড অমূলক সৃষ্টি। এই বদ্ধমূল প্রবাদ ইতিহাসরূপ মহীরুহের পরগাছার ন্যায় তাহারই গাত্রে জন্মগ্রহণ করিয়া, তাহারই রসে পরিবর্দ্ধিত হইয়া ক্রমশঃ শাখা প্রশাখা ও মূল বিস্তার করতঃ, ইতিহাসবটের পুরাতন ধূসর পত্রগুলি ঢাকিয়া ফেলিয়া নিজের হরিৎপত্রের সম্ভার যে জাঁকজমকে প্রসারিত করিয়া ফেলিয়াছে, তাহাতে ইহাকেই ঐতিহাসিক তথ্য বলিয়া ভ্রম হইবে, তাহা নিতান্ত অস্বাভাবিক নহে। তাই, অবশ্যই দুঃখের বিষয়, বঙ্গীয় অধিকাংশ লেখকই এই প্রবাদকে নির্ব্বিবাদে ঐতিহাসিক তথ্যরূপে গ্রহণ করিয়া আসিতেছেন এবং এই প্রকাণ্ড ভ্রমকে ভিত্তি করিয়া বহু প্রকাণ্ডতর ভ্রমাত্মক তথ্যের উৎপাদন করিতেছেন। সংস্কৃত অক্ষরে সংস্কৃত ভাষায় পুরাতন পুস্তকে (যথা কুলকারিকা প্রভৃতি গ্রন্থে) ইদং লিখিত আছে, এই মোহকৃচ্ছ্র অনুসন্ধায়ীর প্রয়াস-বিহ্বল দৃষ্টিকে অভিভূত করিবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি? বহু প্রয়াস ও পরিশ্রম স্বীকার করিয়া অতীতের অন্ধকারময় গহ্বর হইতে যে চাকচিক্যময় বস্তু সংগ্রহ করিতে পারিলাম, তাহাকে পৃথিবীতে সাধারণের নিকট বহুমূল্য রত্ন বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার ইচ্ছাই স্বাভাবিক। পুনরায় সেই রত্ন খাঁটি কি ঝুটা এত অনুসন্ধান করা অনুসন্ধান-ব্যাধি-গ্রস্ত ব্যক্তি ভিন্ন অন্যের সম্ভবে না। পরিশ্রান্ত ঐতিহাসিক এই খানেই স্থগিত হইয়া নিজের পরিশ্রমে সফলতার চিন্তায় ততোধিক সেই রত্নের স্ফুটিত ঔজ্জ্বল্যে নিজেই বিমুগ্ধ হইয়া আত্মহারা হইবেন সন্দেহ নাই; কিন্তু যথার্থ ঐতিহাসিক অক্লান্ত পরিশ্রমী, সত্য-সন্ধয়নী, নিরপেক্ষ ন্যায়-বিচারক, চিন্তাশীল এবং সর্ব্বোপরি অনধীয়, বুদ্ধিমান, দর্শনশক্তিশালী দার্শনিক ও নির্ভীক। এইরূপ প্রকৃত ঐতিহাসিক নিজের অনুসন্ধান-লব্ধ বস্তুকে পুনঃপুনঃ পরীক্ষা করিবেন তাহাতে ভুল নাই।

সামান্য একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারি, ব্রাহ্মণ এমন কোন নিশ্চল

বা অস্থাবর বস্তু নহেন যে, তাঁহাকে বহন করিয়া স্থানান্তরে লইয়া যাইতে হয়। স্বতঃ-প্রবৃত্ত হইয়া তিনি কোথায়ও যাইতে পারেন না বা যান না। বিশেষতঃ ধন-ধান্যে ভরা বঙ্গে অন্যান্য সকলে অতিদ্রুতপদে প্রবেশ করিয়াছিলেন; শুধু ব্রাহ্মণকেই স্কন্ধে করিয়া এদেশে আনিতে হইয়াছিল এ কথা বিশ্বাস করিবার পূর্ব্বে ব্রাহ্মণের অত্যাশ্চর্য্য তৎপরতায় অবিশ্বাস করিতে হয়। ব্রাহ্মণের তৎপরতা অতর্কিত; এই তৎপরতার গুণেই ব্রাহ্মণ যুগে যুগে সুখে-স্বচ্ছন্দে হিন্দু-সমাজের চরম স্থান অধিকার করিয়া আছেন; হিন্দু-সমাজের বহু ভাগ্য-বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। কিন্তু ব্রাহ্মণের তৎপরতা ব্রাহ্মণকে চিরকাল স্বস্থানেই রক্ষা করিয়াছে; তৎপরতাই ব্রাহ্মণের ব্রহ্মণ্য। বিজেতা বণিক ও অন্যান্য সম্প্রদায় দেশ-দেশান্তর কাশ্মীর কাম্বোজ দূরান্তর দেশ হইতে বঙ্গের নামে প্রলুব্ধ হইয়া বঙ্গে প্রবেশ করিলেন আর গৃহকোণের মিথিলা কনৌজনিবাসী ব্রাহ্মণগণ নিশ্চেষ্ট ছিলেন ইহা স্বীকার করিলে ব্রাহ্মণের ব্রহ্মণ্যের অবমাননা করা হয়। মিথিলা ও কনৌজনিবাসী ব্রাহ্মণগণ ত নিতান্ত অতৎপর নহেন, এখনো তাঁহাদিগকে দলে দলে বঙ্গে উপস্থিত হইতে দেখি। অবশ্যই ভাগ্য-বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। পূর্ব্বে ভাগ্য-গুণে কেহ ভূমি দান পাইতেন, কিন্তু চিরদিন সমান যায় না। যদি ইঁহারা তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষের বৈদিক আচরণ অক্ষুণ্ণ রাখিয়াই অর্থাৎ কেহ বা অগ্নিহোত্রী কেহ বা দণ্ডধারী বেশে বঙ্গে উপস্থিত হন, তথাপি এখন মাথার ঘাম পায় ফেলিয়া অর্থ রোজগার করিতে হয়; ভূমি-দান, বস্ত্র-দান সহজে আর মিলে না। এমন তৎপর সন্তানগণের পূর্ব্বপুরুষ নিতান্ত নিশ্চল। নিশ্চেষ্ট ছিলেন এ কথা বিশ্বাস করিতে পারি না।

প্রকৃষ্ট বা বিশিষ্ট প্রমাণের অভাবে কি ঐতিহাসিক, কি বৈজ্ঞানিক, সর্ব্বশ্রেণীর সত্যানুসন্ধিৎসুদিগকেই সম্ভবপর আনুমানিক তথ্যের

(theory)র আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। চিন্তাশীল অনুসন্ধান-জগতে অনুমান তথ্যের theoryর স্থান অতি উচ্চে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই উচ্চতাকে লক্ষ্য করিয়া নানা দিক্ হইতে নানা পন্থায় সেই তথ্য-শৈলে আরোহণ করিতে করিতে ভাস্বর জলন্ত সত্যনাথ দেবের মন্দিরে উপস্থিত হওয়া যায়। আজ যদি চিন্তা-জগতের এই উন্নত উচ্চতাগুলিকে ভূমিসাৎ করতঃ সমতায় পরিণত করা যায়, তাহা হইলে মুহূর্ত্ত মধ্যে অজ্ঞান-বারিধির তরঙ্গ চিন্তাক্ষেত্রকে গ্রাস করিয়া ফেলিবে সন্দেহ নাই। মধ্যে মধ্যে চিন্তাগ্নি দ্বারা উৎক্ষিপ্ত হইয়া অনুমান ভূধরের অভ্যুদয় হয় বলিয়াই অজ্ঞান-বারিধি ক্রমশঃ দূরে সরিয়া যাইতেছে। মানব ক্রমশঃ জ্ঞান-উদ্যান বিস্তার করিয়াই সেই সমস্ত তথ্য-ভূধরগুলির শৃঙ্গ স্পর্শ করিবার চেষ্টা করিতেছে এবং যে দিন বিন্ধ্যগিরি হইতে হিমগিরির অত্যুঙ্গ শৃঙ্গ পর্য্যন্ত জ্ঞান-পুষ্পে শোভিত হইবে, যে দিন প্রকৃতই কবির প্রার্থনানুযায়ী—"ধবল শৃঙ্গে ফুটায়ে পদ্মরাগ" জ্ঞানদেবী ধন্যা হইবেন, সেই দিন মানবও ধন্য হইতে ধন্যতর হইবে। অনুমান-শৈল কল্পনার স্তূপ নহে, বাস্তব-চিন্তার দৃঢ় উচ্চতা।

ব্রাহ্মণ এদেশে আছেন সুতরাং এখানে আসিয়াছেন এ কথা অভ্রান্ত। কিন্তু (১) এক সময়ে কোন বিশেষ অনুষ্ঠানসহকারে তাঁহারা এ দেশে আসিয়াছেন। (২) কি বঙ্গীয় আমদানী-প্রবাহের স্রোতে পড়িয়া অবিরাম গতিতে এখানে আসিয়া জুটিয়াছিলেন। বঙ্গে ব্রাহ্মণ উপস্থিত হইবার এই দুইটী তথ্য বা theory হইতে পারে। অর্থাৎ আদিশূর কিংবা তদ্রূপ কোন রাজা কর্ত্তৃক বহু সম্মান ও আদর সহ আহূত হইয়া পঞ্চ বা তদ্রূপ কোন সংখ্যক ব্রাহ্মণ বঙ্গে আসিয়া বঙ্গকে ধন্য করিয়াছিলেন এবং তৎপরে তাঁহাদের বংশধরগণ তাঁহাদের নাম স্মরণ করিয়া রাখিয়া এখনো তাঁহাদের নামেই পরিচিত হইতেছেন এই তথ্যই ঠিক; কি কলম্বস যে বুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া আমেরিকা আবিষ্কার করিয়াছিলেন, কিম্বা ভাস্কো

ডি গামা যে আকাঙ্ক্ষার প্ররোচনায় ভারতের পথ আবিষ্কার করিয়াছিলেন, কিম্বা পর্টুগীজ, ডচ্, ডিনামার, ফরাসী, ইংরাজ প্রভৃতি মধুমক্ষিকাগণ যে অনুসন্ধানতৎপরতা-গুণে বঙ্গ-মধুকে খুঁজিয়া বাহির করিয়াছিলেন, মিথিলা কনৌজবাসী ব্রাহ্মণগণ সেই মধু-আহরণে রত হইয়াই একটি দুইটি করিয়া বা সময়ে সময়ে দলে দলে বঙ্গে আসিয়া জুটিয়াছিলেন এবং ক্রমশঃ মধুচক্র নির্ম্মাণকরতঃ বিক্ষিপ্ত অসম্বন্ধ ছড়ান মধুমক্ষিকাগুলিকে একচক্রান্বিত করিয়া প্রকাণ্ড ব্রাহ্মণ-সমাজের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন—অর্থাৎ নিজের গরজেই সাধারণ মানব যেমন তৎপরতার আশ্রয়ে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহের সুকরতা জন্য দেশ হইতে দেশান্তরে গিয়া উপস্থিত হয় ব্রাহ্মণও তদ্রূপ তৎপর ও উদ্যোগী হইয়াই বঙ্গে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের নামজাদা পাঁচটিকে হাতি ঘোড়া চড়াইয়া এ দেশে কেহ কস্মিন্‌কাল আনে নাই এবং পরে প্রাগুক্তরূপে আগত ব্রাহ্মণগণ আপনাদের মধ্যে বিবাহাদি নানারূপ সম্বন্ধে পরস্পরের সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়া নিজেদের সমাজ-সৃষ্টির আবশ্যকতা বোধ করিয়া রাজ-শক্তি সাহায্যে যে ব্রাহ্মণ-সমাজ রচনা করেন তাহাতেই পূর্ব্বপুরুষগণকে কাল্পনিক গৌরবে মণ্ডিত করিবার উদ্দেশ্যে আদিশূর কর্ত্তৃক পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনয়নের কাহিনী প্রণয়ন করিয়া মানুষের স্বাভাবিক আত্মপ্রসাদনরূপ প্রবৃত্তির তুষ্টিসাধনকরতঃ প্রথমে আত্ম-বঞ্চনা পরে সমগ্র বঙ্গীয় জন-সাধারণকে বঞ্চনা করিয়াছেন ও করিতেছেন—এই তথ্যই ঠিক; এই উভয়ের মধ্যে কোনটী সম্ভবপর তাহাই বিচার্য্য বিষয়।

এই উভয় তথ্যের বিচারে প্রবৃত্ত হইলে প্রথমে আদিশূর কর্ত্তৃক পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনয়ন-কাহিনীর পক্ষে কি বলিবার আছে শুনা আবশ্যক। এ কাহিনী কোন শিলালিপি বা তাম্রশাসনে আবিষ্কৃত হয় নাই। এই কাহিনী নানা ব্রাহ্মণ-কুল-কারিকা কিম্বা কায়স্থকুল-পঞ্জিকায় লিপিবদ্ধ

আছে। ঘটকগণ-লিখিত গ্রন্থই একমাত্র প্রামাণ্য গ্রন্থ। যাহা হউক যাহা লেখা আছে তাহার প্রতি মনোযোগ দিলে দেখি ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থে যে সমস্ত বিবরণ আছে, সেগুলির কি সময় কি স্থান কি আগত ব্রাহ্মণ-গণের নাম কোন বিষয়েই একের সহিত অন্যের ঐক্য নাই। যথা বারেন্দ্র-কুলপঞ্জিকার মতে "শাকে বেদ-কলঙ্ক-ষট্‌ক-বিমিতে" অর্থাৎ ৬৫৪ শাকে ও বৈদিক কুলাচার্য্যদিগের মতে "বেদ বাণাঙ্ক শাকেতু" অর্থাৎ ৯৫৪ শাকে, দত্তবংশমালা মতে ৮০৪ শাকে, কায়স্থ-কৌস্তুভ মতে ৮১৪ শাকে, ক্ষিতীশবংশাবলী মতে ৯১৯ শাকে পঞ্চব্রাহ্মণকে বঙ্গে আনয়ন করা হয়। স্থানসম্বন্ধেও এইরূপ; কাহারও মতে পৌণ্ড্রনগরে, কাহারও মতে সুরসরিদ্‌-বিধৌত গৌড়নগরে এবং ঘটককারিকার মতে বিক্রমপুরে প্রথম পঞ্চ ব্রাহ্মণ উপস্থিত হন। নামসম্বন্ধেও তথৈব; রাঢ়ীয় মতে পঞ্চ ব্রাহ্মণের নাম যথাক্রমে ভট্টনারায়ণ, শ্রীহর্ষ, দক্ষ, ছান্দড় ও বেদগর্ভ; বারেন্দ্রমতে ইহাঁদের নাম যথাক্রমে ক্ষিতীশ, তিথিমেধা বা মেধাতিথি, বীতরাগ, সুধানিধি, সৌভরি; এই শেষোক্ত নামগুলি একেবারে ঔপন্যাসিক।

পূর্ব্বোক্ত শাকগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেও বোধ হয়, তাৎকালিক লেখকগণ দশ অঙ্কের মধ্যে যে কয়েকটী অঙ্ককে শুভপ্রদ বলিয়া সম্মানিত করিতেন তাহাদেরই সাজান-গোছানের উপর ব্রাহ্মণ-আনয়নরূপ শুভ-ঘটনার কাল বা সময় নির্ভর করে। যথা 'বেদ' হিন্দুর সর্ব্বাগ্রগণ্য ও সর্ব্বশুভপ্রদ। তাই যতগুলি শাক পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে তন্মধ্যে একটী ব্যতীত সকল গুলিতেই অঙ্কস্থ বামাগতি হিসাবে সর্ব্বাগ্রে '৪' চারি এই অঙ্কই আছে। অপরগুলিও বিশেষ শুভপ্রদ; যথা—৮ বসু, ধন, ৫ বাণে বীরত্ব আছে, ৬ ঋতুগণ হিন্দুর দেবতা মধ্যেই গণ্য, '০' শূন্য এক সময়ে বঙ্গীয় ধর্ম্মাকাশে চন্দ্র-সূর্য্য অপেক্ষাও উচ্চতর আসন গ্রহণ করে; বঙ্গে

বৌদ্ধধর্ম্মের শেষাঙ্ক শূন্যপুরাণের উদয় হয় এবং শূন্য পূজিত চিহ্ন হয় এবং সেই সময় হইতেই ক্রমে বৌদ্ধধর্ম্মের ভাঙ্গা বাজারে হিন্দু দেবদেবিগণের হাট বসিয়াছে। একমাত্র ৯৯৯ শকে উপরি লিখিত লক্ষণগুলি নাই বটে, কিন্তু তাহাতে যে মোটা শুভ লক্ষণ আছে তাহা হিন্দুমাত্রেরই চোখ এড়াইতে পারে না। চক্ষু মুদিলেও হিন্দুকে নবগ্রহ শান্তি করিতে হয়, জীবন্ত হিন্দুর পক্ষে নবগ্রহকে সর্ব্বদাই তুষ্টিতে রাখিতে হইবে। তাই ব্রাহ্মণ-আনয়নরূপ-শুভব্যাপারে নবগ্রহের তিনবার সমাহার করিয়া ৯৯৯ শাক উৎপন্ন করা হইয়াছে।

এই অবস্থায় প্রথম তথ্যটী অর্থাৎ আদিশূর কর্তৃক পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনয়ন শুধু কাহিনী হওয়াই সম্ভবপর, ঐতিহাসিক ঘটনা হওয়া নিতান্ত অসম্ভব। প্রথম তথ্য অসম্ভব হইলে দ্বিতীয় তথ্যটী স্বতঃসিদ্ধ।

আমি আনন্দের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, এই প্রবন্ধের এই অংশ লিখিবার পরে বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতি কর্ত্তৃক প্রকাশিত গৌড়রাজমালা গ্রন্থে আদিশূর বিষয়ক সিদ্ধান্ত দেখিতে গিয়াও এই একই সিদ্ধান্ত দেখিয়াছি। দার্শনিক-পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া 'রাজমালা' গ্রন্থকার এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। যাঁহারা ঐতিহাসিক তথ্য লইয়া বিচার করিয়াছেন তাঁহারা এইরূপ সিদ্ধান্তের মর্য্যাদা অবশ্যই বুঝিবেন এবং ইহাতে আস্থা স্থাপন করিবেন বিশ্বাস করি।

পাল, শূর ও বর্ম্মবংশীয়েরা যখন উত্তরবঙ্গে এইরূপ দ্বন্দ্বে লিপ্ত ছিলেন, দক্ষিণবঙ্গে তৎকালে সেনবংশীয়েরা ক্রমশঃ বলসঞ্চয় ও প্রতিপত্তি বিস্তার করিয়া আসিতেছিলেন। ইঁহারা পূর্ব্ববর্ত্তী সেনগণ। এই সেনগণ অমার্জ্জিত হইলেও উদ্যম, উৎসাহপূর্ণ এবং মজ্জাবীর্য্যসম্বলিত; পরবর্ত্তী সেনরাজবংশ কিঞ্চিৎ মার্জ্জিত হইলেও ক্রমশঃ মজ্জাহীন হইয়া পড়েন। পরবর্ত্তী সেনরাজগণের ইতিহাস এইরূপ। শূরবংশীয়েরা পালবংশীয়দের

প্রতাপে প্রতিহত প্রায় হইয়া আসিলে তাঁহারা দক্ষিণী সেনবংশীয়দিগকে আহ্বান করেন এবং একরূপ তাঁহাদের নিকট আত্মসমর্পণ করেন। এই ঐতিহাসিক ঘটনাই বঙ্গে সেনবংশ আদিশূরের দৌহিত্র সন্তান হইতে উদ্ভূত এইরূপ প্রবাদে পরিণত হইয়াছে এবং কুলজ্ঞগণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন যে, "জাত বল্লালসেন গুণি-গণিত স্তস্য দৌহিত্রবংশে"। উভয় বংশ-মধ্যে সম্বন্ধস্থাপনও অসম্ভব নহে। এই সময়ে সেনরাজগণ নিজ শৌর্য্যবলেই দক্ষিণরাঢ় ও পূর্ব্ববঙ্গে রাজত্ব বিস্তার করেন এবং শূরবংশীয়দের পূর্ব্ব প্রতিভার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ক্রমশঃ গৌড় পর্য্যন্ত অধিকার করেন এবং পালরাজগণকে সম্পূর্ণভাবে প্রতিহত করিতে সমর্থ হন। ইহাঁরাই পরবর্ত্তী সেনরাজগণ। ইহাঁরা ক্রমে শিক্ষিত ও মার্জ্জিত হন এবং ধর্ম্মপরিবর্ত্তন করিয়া শৈবধর্ম্ম অবলম্বন করেন। পরবর্ত্তী সেনরাজগণ অধিকাংশই শিবোপাসক। ইহাঁরা শূরবংশীয়দের নিকট তৎকালিক উত্তর ভারতীয় সভ্যতা শিক্ষা করেন এবং শূরবংশীয়দের আশ্রিত ব্রাহ্মণগণ ইহাঁদের আশ্রয় গ্রহণ করেন। শূরবংশীয়েরা বহু ব্রাহ্মণকে আশ্রয় দান করেন বটে এবং রাষ্ট্রীয় ও ধর্ম্মপ্রচার ব্যাপারে ব্রাহ্মণগণকে যন্ত্রস্বরূপ ব্যবহার করিতেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের রাজ্যের প্রসার তত বেশী না হওয়ায় এই যান্ত্রিকতার তত দরকার হয় নাই; সভ্যতাসম্পন্ন থাকা হেতু ব্রাহ্মণগণও একেবারে হস্তপুত্তলি করিতে পারেন নাই কিন্তু সেনগণ ব্রাহ্মণের হাতে পড়িয়া আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হন নাই; তাঁহাদের পূর্ব্ব বর্ব্বরতা ও সংস্কারের সুবিধা পাইয়া ব্রাহ্মণেরা সেনগণকে একেবারে ব্রাহ্মণসর্ব্বস্ব করিয়া ফেলেন। ফলে, অতি সত্বরেই শৌর্য্যবীর্য্যশালী সেনরাজগণ মজ্জাহীন হইয়া বঙ্গের হিন্দুরাজত্বকে অতলজলে জলাঞ্জলি দিয়া নিজেরাও কালপ্রবাহে ভাসিয়া বেড়াইতেছেন। শুধু বঙ্গে নহে ভারতের সর্ব্বত্রই হিন্দুরাজত্ব অবসানের এই একইরূপ ইতিহাস।

বারান্তরে এ বিষয়ে সাধ্যমত সম্যক্ সমালোচনা করিবার ইচ্ছা আছে। তবে এখানে ভারতীয় বিশেষের বঙ্গের জাতিবিশেষের হীনতার প্রসঙ্গক্রমে এইটুকু বলা আবশ্যক মনে করি যে, উত্তর-ভারতের আর্য্যবিজেতা শকাদি জাতির রাজ্যারম্ভকালে রাষ্ট্রীয় আবশ্যকতার হেতুতেই কিন্তু অনেকটা সহজাত বুদ্ধিবশেই উক্ত রাজগণ কর্তৃক তাহাদের শত্রুজাতিদিগকে ও অন্তর্নিহিত শক্তিসম্পন্ন অসভ্য অথচ উন্মুখ জাতিদিগকে চিরনিষ্পেষিত করিয়া রাখিবার দুরভিসন্ধিতে বিজিতাবশেষ আর্য্যদিগের মধ্যে যাহারা সহজে বশ্যতা স্বীকার করে এবং ক্রমে পেশায় ব্রাহ্মণ হইয়া পড়ে, সেই ব্রাহ্মণ ও সেই ব্রাহ্মণের শিক্ষাযন্ত্রস্বরূপে ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ হয়। এই দৃষ্টান্ত পরে সুবিধামত ভারতীয় বহু রাজগণই অনুসরণ করে। এই স্থলেই ভারতীয় জাতিভেদরূপ আলোক ও বায়ুর প্রবেশ দ্বার শূন্য-হর্ম্ম্যের ভিত্তি-স্থাপন। এই সুরম্য-হর্ম্ম্য সুদৃঢ় বাসগৃহের উদ্দেশ্যেই নির্ম্মিত হয় বটে কিন্তু বিধি-বিড়ম্বনায় ইহা দুর্ভেদ্য কারাগৃহে পরিণত হইয়াছে। ইহার বিষময় ফলে ভারতের ভবিষ্য-দেবতা রুদ্ধ হইয়া পড়িতেছেন বুঝিয়া, মহাপ্রাণ বুদ্ধধর্ম্মের আবির্ভাব হয় এবং সেই বুদ্ধ-আত্মাই কিছুকালের জন্য ভারতের রুদ্ধ দ্বার মুক্ত করেন, কিন্তু অহো দুর্ভাগ্য! পুনরায় সেই মুক্ত দ্বারে অর্গল পড়িয়াছে এবং পুনরায় বর্ব্বরতার অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে যান্ত্রিক ব্রাহ্মণগণের এক অভ্যুত্থান হয়, যাহা ইতিহাস-প্রসিদ্ধ শঙ্করের অভ্যুদয় নামে পরিচিত। ফলে ক্রমে মজ্জাহীনতা ও অন্তঃসারশূন্যতারূপ ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া অচিরে ভারতীয় রাজগণ আপনাদের প্রতিভার চিতাগ্নি প্রজ্বলিত করেন। এই চিতাগ্নির জ্যোতিঃ অনেক ঐতিহাসিকের চক্ষে গৌরব-বহ্নি বলিয়া ভ্রম জন্মাইয়াছে। দৃষ্টান্তস্থলে উত্তর-ভারতের সমুদ্রগুপ্ত, শ্রীহর্ষ, বিক্রমাদিত্য ও বঙ্গের বল্লালসেনের রাজত্ব-কালের প্রশংসার কীর্ত্তনের উল্লেখ করা যায়। ঐতিহাসিকগণ

যে পরিমাণে এই রহস্যোদ্ঘাটন করিতে পারিবেন, ভারতবাসীও সেই পরিমাণে আপনার অতীত ইতিহাস সুতরাং ভবিষ্যৎ লক্ষ্য স্পষ্টতর দেখিতে পাইবে। যে সেনগণের কথা এ পর্য্যন্ত একটু বাহুল্য ভাবেই বলা হইল, তাঁহারা যখন সুন্দরবন অঞ্চলে ছিলেন তখনই তাঁহাদের সর্প-পূজা অভ্যস্ত ছিল। বঙ্গে পালরাজগণের খণ্ড ও বিচ্ছিন্ন রাজ্যগুলি ক্রমশঃ সেনরাজগণের হস্তগত হইতেছিল এবং তৎসঙ্গে তৎকালে বৌদ্ধ-প্রভাবও হ্রাস হইয়া আসিতেছিল। ব্রাহ্মণগণও যে কোন নবাগত বা নবোদ্ভূত শক্তিকে আশ্রয় করিয়া বৌদ্ধবল আহত করিবার চেষ্টায় ছিলেন, এই উদ্দেশ্য সহজবোধ্য। যাহা হউক, রাজশক্তি ও ব্রাহ্মণশক্তি মিলিত হইয়া গরল-ধারীকেও দেবতার আসনে স্থান দিল। শাসন ও শিক্ষার এই লজ্জাস্কর যোগ-সাধন মানুষের চোখে সকল সময়েই পড়ে।

অমার্জ্জিত সেনরাজগণ স্বধর্ম্ম ও স্ব-সংস্কারানুযায়ী বিষহরীর পূজাকে সাদরে গ্রহণ করিতে পারেন; ব্রাহ্মণগণ উদরের দায়ে বা প্রতিহিংসার পরিশোধের জন্য তাহা সমর্থন করিতে পারেন; কিন্তু তথায় যদি এমন কোন উচ্চজাতি বাস করেন, সাপের পূজা যাহাদের সংস্কার ও প্রবৃত্তির বিরুদ্ধ এবং সেই জাতির যদি এমন অর্থবল থাকে যে, পেটের দায় তাহাদিগকে ম্রিয়মাণ করিতে পারে না, কিম্বা প্রতিহিংসানল তাহাদের বুদ্ধি বিবেচনাকে দগ্ধ করিয়া ফেলে নাই, তবে তাহারা সহজে কেন সেই সর্প-পূজা গ্রহণ করিবে? এই অঞ্চলেই তৎকালে ব্যবসায়ী সওদাগর বণিক্‌জাতি বাস করিতেন, তাঁহাদের সংস্কার উচ্চতর ছিল, অর্থবলও যথেষ্ট ছিল। মনসার ভাসান বা পদ্মাপুরাণ গ্রন্থে তাঁহাদিগকেই নির্ব্বাচন করিয়া মনসা-পূজা গ্রহণে বাধ্য করাইবার উপাখ্যান বর্ণিত আছে। পদ্মাপুরাণের আখ্যায়িকা সকলেই জানেন। তবে চণ্ডীকাব্য, শীতলামঙ্গল, সত্যনারায়ণের পাঁচালী ইত্যাদির সহিত সাধারণত্ব প্রদর্শন জন্য আখ্যা-

াম্নকাটার সামান্য অবতারণা করা আবশ্যক। এই সকলগুলিতে সদাগর বণিক্-জাতির প্রতি প্রকোপ। এই বণিক্-সম্প্রদায় শিবোপাসক; কোন ক্রমেই মনসা, চণ্ডী, শুভচণ্ডী ওরফে শুবচনি, বা শীতলা, সত্যনারায়ণ ইত্যাদির পূজা গ্রহণ করিবেন না। পদ্মাপুরাণ, চণ্ডীকাব্য যদি মনসা-পূজা ও চণ্ডী-পূজার বাইবেল হয়, তবে চাঁদ সদাগর ও ধনপতি সদাগর প্রত্যেকটীর Satan স্বরূপ, সর্প ও চণ্ডীর Kingdom স্থাপন জন্যই তাহাদের নির্য্যাতন, প্রথমে নৌকাডুবি, ধন-সম্পত্তির বিনাশ, তৎপরে পুত্রনাশ, কারাবন্ধন ইত্যাদি। অবশেষে স্বর্গ-রাজ্যের আবির্ভাব; সর্প ও চণ্ডীর পূজার প্রচার।

মনসার ভাসান প্রথমে কোথায় রচিত হয়, তৎসম্বন্ধে আরও প্রমাণ সংগ্রহ করিতে হইলে পদ্মাপুরাণের প্রথম লেখকগণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে হয়! পদ্মাপুরাণের গ্রন্থকার কর্তৃক বহু কারণে মনসা-পূজা ক্রমে দেশময় ছড়াইয়া পড়ে, কিন্তু তন্মধ্যে ৩ জন প্রসিদ্ধ ও সর্ব্বপ্রাচীন। তাঁহাদের নাম যথাক্রমে কাণা হরিদত্ত, বিজয় গুপ্ত ও নারায়ণ দেব। কাণা হরিদত্ত কাল্পনিক লোক কিনা বলা যায় না, কিন্তু বিজয়গুপ্তের স্বদেশীয় বলিয়া বিজয়গুপ্ত অনেকটা আভাস দিয়াছেন। বিজয়গুপ্ত ও নারায়ণদেব কাল্পনিক ব্যক্তি নহেন। বিজয়গুপ্তের নিবাস আধুনিক বাখরগঞ্জ জেলার অন্তর্গত ফুলশ্রী ওরফে গৈলা গ্রাম। নারায়ণ দেবও পূর্ব্ব-দক্ষিণ বঙ্গনিবাসী; ত্রিপুরা ও মৈমনসিংএর সন্ধিস্থল জোয়ানসাহি পরগণায় তাঁহার জন্মস্থান। এই প্রাচীন গ্রন্থকারগণের প্রতি লক্ষ্য করিলে ইহা অনুমিত হয় যে, মনসার ভাসান তাঁহাদের অঞ্চলেই প্রথমে উদ্ভূত হয়। কারণ দেশের পাখীই দেশের বুলি ধরে। মনসার ভাসানের বিস্তৃতি এত হইয়াছিল যে, চাঁদ সদাগরের নিবাস বঙ্গের প্রত্যেক অঞ্চলেই এক একটি দাবী করে, কিন্তু মনসার ভাসানের উদ্ভব-স্থান লইয়া বিশেষ তর্ক থাকিতে

পারে না। প্রমাণের উপর নির্ভর করিলে সমুদ্র-সন্নিধ, নদীবহুল, সর্পসঙ্কুল সুন্দরবন ভাটি অঞ্চলেই তাহা নির্ণয় করিতে হয়। উত্তর ও পশ্চিমবঙ্গের পদ্মাপুরাণের কবিগণ নায়িকা বালিকা বেহুলাকে ভেলায় ভাসাইয়া ছয় মাস কাল নদী-বক্ষে, সমুদ্র-বক্ষে রাখিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে কেহ জীবনে এক দিন কাল নদী বা ক্ষুদ্র তটিনী-বক্ষেও কথন যাপন করিয়াছেন কিনা কিম্বা করিতে সাহসী হইতেন কিনা সন্দেহ।

কেহ যদি সন্দেহ করেন, পদ্মাপুরাণের সদাগর জাতি ও প্রবন্ধোক্ত বেণে বা সাহ জাতি এক কিনা, তবে আমি বলিব তাঁহার সে সন্দেহ বৃথা, তাহা আদৌ ধারণার বিরুদ্ধ। যাহা হউক তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য পদ্মাপুরাণের একটী স্থলমাত্র উদ্ধৃত করা আবশ্যক মনে করি। যেস্থলে বেহুলার ভ্রাতাগণ কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহাকে ফিরাইবার চেষ্টা করিতেছেন,—

হরি সাধু বলে ভগ্নি মোর বাক্য ধর
সমুদ্রের কূলে তুমি লখিন্দরে গোড়
এইক্ষণ চল বেহুলা মুক্ত সাহের বাড়ী
খনি বদলে দিব কাঁচা পাটের সাড়ী
শঙ্খ বদলে দিব সুবর্ণের চুড়ি
সিন্দুর বদলে দিব ফাউগের গুড়ি।

এইস্থলে দুইটি বড় কথারই প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। প্রথম বেহুলার ভ্রাতাগণের আত্মীয় বিশেষ স্বজাতির নাম মুক্তসাহ সুতরাং সাহু, সদাগর বেণে একজাতি। কারণ চাঁদ সদাগরকে বহুস্থলে চাঁদ বেণেও বলা হইয়াছে যথা,—

"যদি মোর পূজা করিবে চাঁদ বেণে।
হেঁতালের বাড়িগাছি আগে ফেল টেনে॥"

দ্বিতীয়, সমুদ্রের কূলে এই সাহু, সদাগর বা বেণে জাতির নিবাস ছিল। লখিন্দরকে সৎকার করিয়া বেহুলাকে সেইরূপ কোন এক বাড়ীতে লইয়া যাইবার জন্য তাহার ভ্রাতারা চেষ্টা পাইয়াছিল। অতএব পদ্মাপুরাণ অবলম্বনে আমরা বণিক্-সম্প্রদায়কে প্রায় বঙ্গোপসাগরকূলেই পাই। চট্টগ্রামে ইহাদের উপনিবেশের প্রমাণের কথা পরে বলিব। তবে এখানে এই কথা বলিয়া রাখিব, এই সময়ে বণিক্সম্প্রদায় চট্টগ্রাম-অঞ্চলেও বাস করিতেন।

ইহার পরে এই বণিক্ সম্প্রদায়কে আমরা বঙ্গের কোন্ অঞ্চলে দেখিতে পাইব, তজ্জন্য দ্বিতীয় গ্রন্থ চণ্ডীকাব্যের প্রতি লক্ষ্য করিতে হইবে।

পদ্মাপুরাণেই আমরা পাইয়াছি, এই বণিক্-সম্প্রদায় জলবণিক্, স্থল-বণিক্ নহে ; তাহারা সমুদ্রে মধুকর ডিঙ্গায় আরোহণ করিয়া বাণিজ্য করিতে যাইত। বাণিজ্যলক্ষ্মী ও রাজলক্ষ্মী পরস্পর সঙ্গিনী। যেখানে রাজশক্তি বিস্তৃত হয়, অপহরণ, দস্যুতার ভয় সেখান হইতে ক্রমে দূর হয়, বাণিজ্যও ক্রমে সেই সকল স্থানে প্রসারিত হয়। দক্ষিণাগত রাজগণ ক্রমে উত্তর অঞ্চলে রাজ্য বিস্তৃতি করিতেছিলেন এবং এই বণিক্-সম্প্রদায়ও ক্রমে তাহাদের অনুগামী হয়। চণ্ডীর আখ্যায়িকাস্থল তাম্রলিপ্ত, মেদিনী-পুর ও গাঙ্গপ্রদেশ, ত্রিবেণীর চতুঃপার্শ্বস্থ সপ্তগ্রাম ও কলিকাতা অঞ্চল। মুকুন্দরামের পূর্ব্বকবি মাধবাচার্য্যের চণ্ডী মেদিনীপুর অঞ্চলে প্রচলিত ছিল এবং মুকুন্দরামের চণ্ডীতে ধনপতি সদাগর সিংহল গমনে ইন্দ্রাণী পরগণা, ললিতপুর, ভাউসিঙের ঘাট, মেটেরি অঞ্চল অতিক্রম করিয়া-ছিলেন। মাধবাচার্য্য স্বয়ং সপ্তগ্রামবাসী ছিলেন। মুকুন্দরাম বর্দ্ধমান জেলা নিবাসী ছিলেন। এই সমস্ত লেখকের নিবাস, গীতির আখ্যায়িকা-স্থল ইত্যাদির প্রতি লক্ষ্য করিলে এই বণিক্-সম্প্রদায়কে পরবর্ত্তীকালে আমরা তাম্রলিপ্ত ও সপ্তগ্রাম ত্রিবেণী অঞ্চলে দেখিতে পাই।

তৃতীয় গ্রন্থ শীতলামঙ্গলে বণিক্-সম্প্রদায়ের পরবর্ত্তীকাল ও স্থান নির্দ্দিষ্ট হয়। শিবোপাসক চন্দ্রকেতুর নিবাস বেহার ও বঙ্গের সঙ্গমস্থল, বসন্তরোগের প্রকোপস্থল উত্তর-গাঙ্গপ্রদেশ।

তৎপরে সেনরাজগণ ক্রমে যখন গৌড়ে প্রবেশপূর্ব্বক "সেন" উপাধি ধারণ করিয়া রাজত্ব করিতে থাকেন, সেখানেও এই বণিক্-সম্প্রদায় লক্ষ্মীর বরপুত্রের ন্যায় তাঁহাদের অনুসরণ করেন। এই বণিক্-সম্প্রদায় এখনও গৌড়প্রদেশ বর্ত্তমান মালদহ জেলায় বহু পরিমাণে বাস করিতেছেন এবং তাঁহারা আপনাদিগকে "বঙ্গদেশী" বলিয়া থাকেন। বোধ হয়, বেহারের উপকণ্ঠস্থ মালদহের গৌড়, বঙ্গদেশ হইতে তৎকালে বিশিষ্টরূপে বিভিন্ন ছিল, তাই আপনাদের পূর্ব্ব-নিবাসের পরিচয় অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য তথাকার আগন্তক বণিক্-সম্প্রদায় আপনাদিগকে বঙ্গদেশী বলিয়া পরিচয় দিতেন।

ক্রমে এই বণিক্-সম্প্রদায়, প্রথমে সেনরাজগণের রাজ্যবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে, ও মুসলমান-রাজত্বকালে, ও পরে ওলন্দাজ, ইংরাজদিগের সময়েও প্রতি রাজধানী ও বাণিজ্য-প্রধান স্থানেই আপনাদের উপনিবেশ স্থাপন করেন এবং কালে বঙ্গময় ছড়াইয়া পড়িয়াছেন। এই কারণে সোনারগাঁ, বিক্রমপুর, ঢাকা, মুর্শিদাবাদ, কলিকাতা, হুগলী ইহাঁদের বিশেষ স্থান।

তবেই দেখা যাইতেছে, যে পথে বঙ্গে অন্যান্য বণিক্-সম্প্রদায় যথা পর্ত্তুগীজ, ডচ, ফরাসী, ইংরাজ বঙ্গে প্রবেশ করেন, এই বণিক্ বা বেণে জাতিও সেই পথেই বঙ্গে আসিয়াছিলেন। ইউরোপীয় বণিক্গণের ন্যায় ইহাঁদেরও অর্ণবপোত ছিল, বিশিষ্ট সমুদ্র-বাণিজ্যও ছিল। কিন্তু 'ভাগ্যং ফলতি সর্ব্বত্র'।

এই বণিক্-সম্প্রদায়ের বঙ্গে আগমন-বৃত্তান্তের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের

ধর্ম্মবৃত্তান্ত আলোচনা করিলে তাঁহারা যে বঙ্গের আগন্তুক একথা আরও স্পষ্টতর হইবে। পদ্মাপুরাণ ও চণ্ডীকাব্যেই তাঁহাদের ধর্ম্মবৃত্তান্ত, তাঁহাদের সংস্কার, আচার-ব্যবহার যথেষ্ট উল্লেখ আছে। উভয় গ্রন্থেই দেখা যায় ইঁহারা শিবোপাসক। পদ্মাপুরাণের সাত খানা মধুকর ডিঙ্গা সমুদ্রে মনসার কোপে নিমজ্জিত হইলেও চাঁদ কোনক্রমে ভেলায় চড়িয়া কূল পাইয়া শিবঠাকুরকেই স্মরণ করিতেছেন—

ভেলা চাপিয়া সাধু পাইলা গিয়া তট।
শিব শিব বলি সাতবার করে গড়॥

এবং শিবের ভরসাতেই মনসাকে সংহার করিবার বুদ্ধি আঁটিতেছেন—

"যা করেন শিবশূল এবার পাইলে কূল
মনসার বধিব পরাণে।"

চণ্ডীকাব্যের ধনপতি সদাগরও কারারুদ্ধ হইয়াও চণ্ডীর পূজা গ্রহণ করিতে কিছুতেই স্বীকৃত নহেন, প্রাণ গেলেও তিনি শিবের অবমাননা করিতে পারিবেন না।

যদি বন্দিশালে মোর বাহিরায় প্রাণী।
মহেশ ঠাকুর বিনে অন্য নাহি জানি॥

যে কারণেই হউক মনসার পূজা তৎকালে বঙ্গে বিশেষ প্রচলিত হইলেও তাহা যে ইতরজনোচিত এবং ইতরের বাড়ীতেই যে মনসার বিশেষ আদর ছিল তাহার প্রমাণ পদ্মাপুরাণেই পাওয়া যায়। চাঁদ সদাগরের হেঁতালের (যষ্টির) বাড়ী, মধ্যে মধ্যে খাইয়া মনসাদেবী যে হাঁসপাতালে গিয়া চিকিৎসিত ও শুশ্রূষাপ্রাপ্ত হইতেন তাহার এইরূপ ভাবে বর্ণনা আছে—

"হেঁতালের বাড়ী দিলগো আগো তাতে ব্যথা পাইলাম বড়,
জালুয়া মণ্ডপে গিয়া কাঁকলী কৈলাম দড়।"

ধীবরাদি জাতির বাড়ীতেই মনসার বেশী খাতির ছিল। এই শ্রেণীর দগের বাড়ীতে মনসা ও চণ্ডীর যাজন করিয়া তাৎকালিক ব্রাহ্মণ-গণও বেশ লাভবান্ হইতেন। চৈতন্যভাগবতে তদ্বিষয়ে এইরূপ উল্লিখিত আছে,—

"দেখ এই চণ্ডী বিষহরীরে পূজিয়া,
কেনা ঘরে খায় পরে বসন পরিয়া।"

ইহা দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হয়, বণিক্ আধুনিক বেণে জাতি, তৎকালে বঙ্গের সাধারণ ইতরজাতি অপেক্ষা বিশেষ ও উচ্চতর জাতি ছিলেন। বঙ্গের এই ইতর আদিম জাতির সহিত শুধু ধর্ম্মে নহে কোন বিষয়েই বণিক্‌গণের একত্ব ছিল না। আদিম জাতিগণের সহিত বিভিন্নতা বণিক্‌গণের আগন্তুকত্বই প্রতিপন্ন করে। বাণিজ্যকুশল বঙ্গ চিরকালই বিদেশী বণিক্‌কে আহ্বান করিয়াছে। কাহাকেও বঙ্গ আপনার করিয়া ফেলিয়াছে, কাহারও নিকট আপনাকে বিক্রীত করিয়াছে। যাহারা বিচ্ছিন্ন বা স্বতন্ত্র থাকিতে চেষ্টা করিয়াছে, তাহাদিগকে দূরে নিক্ষেপ করিয়াছে। আধুনিক মারওয়াড়ী বণিক্‌গণের সহিত তুলনা করিলে প্রবন্ধোক্ত বণিক্-সম্প্রদায়কে একভাবে বঙ্গের প্রাচীন মারওয়াড়ী বলা যাইতে পারে। বিশেষত্ব এই বণিক সম্প্রদায় বাঙ্গালী হইয়াছে, মারওয়াড়ী মারওয়াড়ীই আছেন। আজ বঙ্গে হিন্দুরাজত্ব বর্ত্তমান থাকিলে, বঙ্গ-সমাজের প্রবাহ স্রোতস্বান্ থাকিলে, মারওয়াড়ীগণ নিজেদের স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ন রাখিতে পারিতেন কিনা সন্দেহ, বঙ্গসমাজ তাহাদিগকে নিজ অঙ্গীভূত করিয়া লইত।

বণিক্‌সম্প্রদায়ের ধর্ম্মালোচনা করিলে তাহাদের জাতীয় উচ্চতা, মানসিক বল, প্রকৃত মনুষ্যত্ব, যে কি পরিমাণে মনকে আঘাত করে, তাহা তাহাদের বর্ত্তমান সামাজিক হীনতার প্রতি শুধু লক্ষ্য রাখিলে

ধারণা করা আদৌ সম্ভব নহে। তাই একবার বঙ্গবাসীকে বাঙ্গলার বেণে বা শুঁড়ি জাতির প্রতি তাঁহার স্বাভাবিক অবজ্ঞা ক্ষণেকের জন্য ভুলিতে অনুরোধ করি। পদ্মাপুরাণের ও চণ্ডীর আখ্যায়িকায় পুনরাবৃত্তি করিয়া বলিতে চাই, চাঁদ, ধনপতি ও শ্রীমন্তের ন্যায় প্রকৃত মনুষ্যোচিত বীরহৃদয় বঙ্গীয় কোন্ উচ্চ জাতির মধ্যে কে কয়টি নির্দ্দেশ করিয়া দিতে পারেন? হিমাচলের গগনস্পর্শী উচ্চতার সম্মুখীন হইলে স্তম্ভিত হইয়া দণ্ডায়মান হই, কিন্তু চাঁদের সুমহৎ বীরত্বের সম্মুখীন হইলে, ভক্তিভরে মস্তক অবনত হইয়া আসে। শিবোপাসক চাঁদকে মনসার মন্ত্রে দীক্ষিত করিবার জন্য মনসা তাহাকে কোন্ নির্য্যাতনই না করিয়াছেন? সে নির্য্যাতন খানাতালাসী অথবা deportation শ্রেণীর নির্য্যাতন নহে। প্রথমে সর্ব্বস্বনাশ, একে একে সাতখানি বাণিজ্যসম্ভারসম্বলিত মধুকরকে জলমগ্ন করা, পরে একটি বা দুইটি নহে, ছয়টি পুত্রের বিনাশসাধন। কিন্তু চাঁদ অটল, তখনও হেঁতাল লইয়া মনসাকে তাড়া করেন। এত দুঃখেও শিবঠাকুর চাঁদের কোন উপকার করেন নাই বা বিপদের আসান দেন নাই, কিন্তু চাঁদ তজ্জন্য তিলমাত্র ক্ষুব্ধ নহে। চাঁদ জানিতেন তাঁহার উপাস্য দেবতা পার্থিব মিত্র বা শত্রুর ন্যায় ব্যবহার করিতে পারেন না। মনসার দেবত্ব দেশে যতই বদ্ধমূল হোক না কেন, চাঁদ তাঁহাকে তাঁহার চরিত্র দেখিয়া পার্থিব অন্যান্য শত্রুর ন্যায়ই জ্ঞান করেন, তাই মনসার ব্যঙ্গ শুনিয়া চাঁদ তাঁহাকে সম্মুখ সমরে আহ্বান করিতেছেন—

"মনেতে ভাবিছ কাণি অন্তরীক্ষে রৈয়া।
সাহস যদ্যপি থাকে কহ আগু হৈয়া॥"

এত করিয়াও চাঁদ যখন নমিত হইল না, মনসা অনন্যোপায় হইয়া স্বর্গের দেবতা-গোষ্ঠীর নিকট আপনার অসামর্থ্য জ্ঞাপন করিলেন। দেবতাগণ চিন্তিত হইলে মর্ত্ত্যে বঙ্গে এমন আর দুই চারিটি মানুষ জন্মগ্রহণ

করিলে, তেত্রিশ কোটির উপায় কি হইবে। দেবতাগণ বুদ্ধি আঁটিলেন। মর্ত্তো বেহুলার আবির্ভাব হইল। আমার সন্দেহ হয়, দেবতাগণের অভিসন্ধির ফলেই স্বর্গের কোন অপ্সরী, মর্ত্তো বেহুলারূপ ধারণ করিয়া জন্ম-গ্রহণ করিয়াছিলেন কিনা? কিন্তু চাঁদের অবশ্যই সে সন্দেহ হয় নাই। বেহুলাকে উপযুক্ত শ্বশুরের উপযুক্ত পুত্রবধূ বলিয়াই চাঁদ বুঝিয়াছিলেন। দেবগণ নিঃশব্দে, দুর্লক্ষ্যে, স্নেহাবরিত বেহুলারূপিণী সহানুভূতির অস্ত্র দ্বারা চাঁদের বীর-তন্ত্রী ছিন্ন করিতে অবশেষে সমর্থ হইয়াছিলেন। শেষ অস্ত্র sympathy সহানুভূতির আক্রমণ হইতে আপনাকে রক্ষা করিতে পারে এমন বীর যেমন হৃদয়ের তেমনি বুদ্ধির বীর হওয়া আবশ্যক।

দেবগণ বুদ্ধি স্থির করিয়া মনসাকে পুনরায় চাঁদের শেষ পুত্র লখিন্দরের বিনাশ সাধন করিতে বলিলেন। লখিন্দরের গলিত শব লইয়া বেহুলা জলে ভাসিল। ক্রমে বেহুলার ভেলা স্বর্গের ঘাটে পৌঁছিল। দেবগণ বেহুলার নৃত্য-গীত শ্রবণে সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে পুরস্কার দিলেন, চাঁদের সাত পুত্রের পুনর্জীবন। এই খানে দেবগণ আপনাদের মর্য্যাদা prestige রক্ষার উদ্দেশ্যে বেহুলাকে এক সর্ত্ত দিলেন। যদি বেহুলা মর্ত্তো গিয়া তাহার শ্বশুরকে মনসা-মন্ত্রে দীক্ষিত করিতে না পারে তবে পুনরায় চাঁদের পুত্রগণ যমালয়ে ফিরিয়া আসিবে। বেহুলা স্বামী ও স্বামীর ভ্রাতাগণ-সহ শ্বশুরের নিকট উপস্থিত হইলেন। পাঠক, এখানে চাঁদ কি করিতে পারে? আমার বা আপনার একটি গরুর বাছুর হারাইলে তাহা ফিরিয়া পাইবার জন্য হরির লুট মানস করি। চাঁদের মৃত সাতপুত্র অযাচিত ভাবে ফিরিয়া আসিয়াছে, একটু দুর্ব্বলতা স্বীকার করিয়া তাহাদিগকে গৃহে রাখিয়া দিলে চাঁদকে কি একেবারে অমানুষ বলিবেন? ইহা অবশ্যই স্থূল-চক্ষে দেখিলে চাঁদের পরাজয়, কিন্তু এই পরাজয়, জয় কি পরাজয়—তাহা সেই বীর-রমণী বেহুলাই বুঝিয়াছিল, নতুবা বীর শ্বশুরকে মনসার

উদ্দেশ্যে অন্ততঃ বামহাতে দুইটি ফুল ফেলিয়া দিবার জন্য অনুরোধ করিত না। পুত্র-শোকাতুরা সনকার মর্ম্মভেদী ক্রন্দন চাঁদ তুচ্ছ করিয়াছিল, কিন্তু বীর, বীরের মর্ম্ম বুঝে, পুত্রবধূর কৃচ্ছ সাধনার সার্থকতাকে আপনার কৃতকার্য্যে অসার্থক করা, চাঁদ অপকার্য্য মনে করিয়াছিলেন, তাই নিজের একটু ন্যূনতা স্বীকার করিয়া "চেঙ্গমুড়ি"র মস্তকে মুখ ফিরাইয়া বাম-হস্তে কয়েকটি ফুল ফেলিয়া দিয়াছেন। কিন্তু তখনও মনসা চাঁদের নিকট-বর্ত্তিনী হইয়া পুষ্প গ্রহণ করা নিরাপদ মনে করেন নাই। চাঁদের হাতের লাঠি (হেঁতাল) খানি তখনো মনসার মনে ত্রাস উৎপাদন করিতে-ছিল; বেহুলাকে অনুরোধ করিয়া হাতের লাঠিখানি সরাইয়া মনসা তবে চাঁদের সম্মুখীন হয়।

পদ্মাপুরাণের অন্যান্য অঙ্কেও চাঁদের মনুষ্যত্ব অসাধারণ। সফরের নৌকা জলমগ্ন হওয়ায় চাঁদ বিধ্বস্ত হইয়া, দীর্ঘ উপবাস ও ক্লান্তির পরে, বন্ধু-গৃহে খাইতে বসিয়াছেন। বন্ধু খাদ্য-দ্রব্য চাঁদের সম্মুখে দিয়াছেন, চাঁদ হাত বাড়াইয়া অন্নের গ্রাস তুলিতেছেন, এমন সময়ে বন্ধু চাঁদের দুঃখে কাতর হইয়া চাঁদকে মনসার সহিত বাদ ক্ষান্ত দিতে অনুনয় করিলেন। ঘৃণায় চাঁদের অন্তরাত্মা জ্বলিয়া উঠিল, বন্ধুর অন্ন-ব্যঞ্জনে পদাঘাত করিয়া তৎক্ষণাৎ বন্ধু-গৃহ ত্যাগ করিলেন, ক্ষোভের সহিত বলিয়া গেলেন, "বর্ব্বর ভাঁড়ায়ে খাও কাণি।" সত্যই এই সংসারে এই চাঁদ বন্ধুর ন্যায় বর্ব্বরের অভাব নাই বলিয়াই "কাণি" শ্রেণীর হীনশক্তি প্রতিপত্তি লাভ করে।

পদ্মাপুরাণের বণিক্ চাঁদের এইরূপ অলৌকিক বীরত্ব ও তেজস্বিতা। চণ্ডীর বণিক্ ধনপতি ও শ্রীমন্তের বীরত্ব অবশ্যই সম্পূর্ণ চাঁদের ন্যায় নহে। বর্ব্বর-উৎপীড়ন ও নির্য্যাতনের প্রকোপে সে তেজ অবশ্যই হ্রাস হইয়া আসিয়াছে। পড়িলে ভেড়ার শৃঙ্গে ভাঙ্গে হীরার ধার। কিন্তু তাহাও অসাধারণ, অন্ততঃ উচ্চশ্রেণীর মনুষ্যের চরিত্রানুযায়ী।

চণ্ডীর ছলনায় শিবোপাসক ধনপতি সিংহলে যাবজ্জীবন কারারুদ্ধ হইলেন; সুবিধা বুঝিয়া কারাগারের যন্ত্রণাভোগের মধ্যেই চণ্ডী স্বপ্ন দেখাইয়া জানাইলেন, তাঁহার পূজা করিলে, "ধনপতির দুর্গতির অবসান হইবে"; কিন্তু ধনপতি তখনও অটল; উত্তর করিলেন,—

"যদি বন্দীশালে মোর বাহিরায় প্রাণী
মহেশ ঠাকুর বিনে অন্যে নাহি জানি।"

চাঁদের ন্যায় ধনপতিও উপাস্য দেবতা শিবের দ্বারা পার্থিব সুখ-সম্ভোগ বা বিপদ্ হইতে ত্রাণ পাইবার প্রত্যাশা করেন না। ইহা উচ্চাঙ্গের উপাসনা, উপাসক নিশ্চয়ই উচ্চ শ্রেণীর মানব। পদ্মাপুরাণের শিব মনসার হিসাবে অকর্ম্মণ্য, উপাসনার অনুপযুক্ত দেবতা; চণ্ডী পুরাণে ততোধিক, শিব এখানে বেশীর ভাগ বদরাগী, শাপ-দান-প্রবণ। শিব-কর্ত্তৃক অভিশপ্ত ব্যক্তি চণ্ডীর কৃপায় ত্রাণ পায়।

শিব-পূজার জন্য ইন্দ্র যুবরাজ নীলাম্বরকে ফুল তুলিতে বলেন; রাজকুমারের তোলা ফুলের মধ্যে একটি পিপীলিকা ছিল। সেই পিপীলিকা শিবকে একটু কামড়াইলেই শিব চটিয়া নীলাম্বরকে শাপ দিলেন,—

"মোর সেবা ত্যজি ইচ্ছা কর অন্য সাধ
ত্বরিত চলহ মহী হও গিয়া ব্যাধ।"

পৃথিবীতে গিয়া ব্যাধ হও। নীলাম্বর চক্ষু মুদিলেন; স্বামীর সহমৃতা হইয়া নীলাম্বরের স্ত্রী ছায়াবতীও নীলাম্বরের সহিত মর্ত্ত্যে আসিয়া জন্মগ্রহণ করিলেন। তাহারাই চণ্ডীকাব্যের কালকেতু ও ফুল্লরা। শিবের অভিসম্পাতজনিত দুর্দ্দশাগ্রস্ত কালকেতু ও ফুল্লরা চণ্ডীপূজা গ্রহণ করিয়াই ঐহিক সুখ-সমৃদ্ধি যথেষ্ট ভোগ করিয়া স্বর্গে ফিরিয়া যায়। উভয় গ্রন্থেই শিবের এই নিন্দা ও তুচ্ছীকরণ,—চণ্ডীর মহিমা অপার, তৎকৃপায় গোধিকাহারী ব্যাধ রাজত্ব করিয়া স্বর্গে ফিরিয়া গেল, শাপভ্রষ্ট নীলাম্বর

পাপমুক্ত হইল। প্রকৃত পক্ষেও কালক্রমে বঙ্গে চণ্ডীদেবীর এত প্রাধান্য স্থাপিত হয় যে, ধর্ম্মরাজ্যে তাঁহার এক চোট পশার হইয়াছিল, বঙ্গগৃহের দেবগৃহখানি একেবারে 'চণ্ডীমণ্ডপে'ই পরিণত হয়।

ধনপতি এত দেখিয়া শুনিয়াও চণ্ডীকে তুচ্ছ করিতেছেন। ধনপতির পক্ষে ইহা ধর্ম্ম-রাজ্যের সিডিসনের অপরাধ। নির্য্যাতন ত যথেষ্ট হইয়াছে। বশে আনিবার অন্য কি উপায় হইতে পারে? পুনরায় দেবগণের মন্ত্রণা-সভা আহূত হইল। স্থির হইল, এবারে সহানুভূতির অস্ত্র-প্রয়োগ। দেবগণ এবারে বেশী সতর্ক হইয়াছিল। বেহুলা বালিকা হইলে দৃঢ়তরা। মনসার কথা সব জানিয়া শুনিয়াও বিপদে পতিত হইয়াও স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া বেহুলা কখনো মনসার শরণাপন্ন হয় নাই। স্বীয় আয়াস দ্বারাই স্বামীর জীবন লাভ করিয়াছিল। দেবগণ বুঝিলেন এই স্বাবলম্বন-স্পৃহা শিক্ষার দোষ সুতরাং শিক্ষার সংস্কার আবশ্যক। এজন্য বালক শ্রীমন্তের গর্ভধারিণীর প্রতিই প্রথমে নজর পড়িল। তাই শ্রীমন্তের মাতা খুল্লনা দেবধাম হইতেই প্রেরিতা হইলেন। অপ্সরী রত্নমালা তালভঙ্গদোষে লক্ষপতি বণিকের ঘরে খুল্লনা হইয়া জন্মগ্রহণ করিলেন। পাছে বালক 'ছিরা'—শ্রীমন্ত বিগড়াইয়া যায় এই আশঙ্কায় পিতা ধনপতিকে দূরে দূরে কখন গৌড়ে, কখন সিংহলে রাখা হইল। শ্রীমন্তের জন্মগ্রহণের সময়েও পিতা ধনপতি গৃহে উপস্থিত নাই। বণিক্-সমাজের স্বাভাবিক নির্ভীকতায় পাছে বালকের মনে তেজাঙ্কুর জন্মে এই ভয়ে সেই বালক-হৃদয়েই এক বিষাঙ্কুর রোপিত হইল। প্রাথমিক primary শিক্ষাগারেই তাহাকে জানান হইল তুমি জারজ সন্তান, তোমার পিতৃত্বে মনুষ্যত্বের কোন দাবী নাই। এমন বিষ যে বালক-হৃদয়ে প্রবেশ করে, সেখানে স্বভাবোদ্গত অন্য অঙ্কুরগুলি পুড়িয়া ছাই হইয়া যায়। কিন্তু বণিক্-সমাজের কি মহত্ত্ব, এরূপ অবস্থায় পড়িয়াও শ্রীমন্ত মনুষ্য-চরিত্রের

আভাস দিতে লাগিল। পুনরায় আর একমাত্রা বিষ-দানের ব্যবস্থা হইল। উচ্চশিক্ষা Collegiate educationএর সময় শ্রীমন্ত যখন স্বাধীন চিন্তার পরিচয় দিতে লাগিল, তখন অন্য কেহ নহে তাহার গুরু-দেবই তাহাকে তিরস্কার করিলেন, তুমি জারজ। তোমার কোন শিক্ষাই তোমাকে মনুষ্যের অধিকার দিতে পারিবে না। তোমার সকল চেষ্টাই বৃথা। বলিতে কি, আমার সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টিশক্তি ভবিষ্যতের কুজ্ঝটিকা যতদূর ভেদ করিতে সমর্থ, ততদূর পর্য্যন্ত তোমার মনুষ্যত্বের দাবীর ক্ষীণাদপি ক্ষীণ রশ্মিও আমার নয়নগোচর হয় না। আমি বলিতেও কুণ্ঠিত নই, আমার কর্ণে তোমার মনুষ্যত্বের দাবীর কথা উপকথা বা পৌরাণিকী কথা বলিয়াই মনে হয়। শ্রীমন্তের আর ধৈর্য্য থাকিল না। পিতার উদ্দেশ্যে গৃহত্যাগ করিল।

এই সময়ে চণ্ডী সুবিধা মনে করিলেন। পিতা ধনপতিকে যে পরীক্ষায় ফেলিয়া ব্যর্থ হইয়াছেন, মাতৃগর্ভ হইতে দুর্ব্বলীকৃত শ্রীমন্তের উপরেও সেই পরীক্ষা আরম্ভ হইল। পূর্ব্বের ন্যায় ছলনা করিয়া তাহাকে সিংহলের পথে লইয়া চলিলেন এবং পথে সমুদ্রের গভীর জলে এক পদ্ম-বনে এক প্রস্ফুটিত পদ্ম-ফুলের উপরে দণ্ডায়মানা দেবী এক হাতে এক হাতী উঠাইয়া গ্রাস করিতে উদ্যতা এরূপ এক অলৌকিক মূর্ত্তি দেখাই-লেন; দেবী রূপে উজ্জ্বল বরণী; হস্তিখাদিনী দেবী বালকের মস্তক-খাদিনী হইবার প্রত্যাশায় উল্লাসময়ী।

সিংহলে রাজসভায় উপস্থিত হইয়া শ্রীমন্ত এই অলৌকিক কমলে-কামিনীরূপ প্রচার করিল। শ্রীমন্তেরও পিতার ন্যায় চক্রে পড়িয়া প্রাণদণ্ডের আদেশ হইল। দক্ষিণ মশানে শ্রীমন্তকে মস্তকচ্ছেদনের জন্য আনিলে বালক প্রাণের দায়ে চণ্ডীর শরণাপন্ন হইল। দেবগণের অভি-সন্ধি সফল হইল। চণ্ডী হাঁপ ছাড়িলেন, নির্য্যাতন repression সফলিত

হইল দেখিয়া, অধিকার reformation অযাচিতভাবে দান করিলেন। দয়ার ভাণ্ড শ্রীমন্তের মস্তকে ঢালিয়া দিলেন। শ্রীমন্ত জীবন পাইল, রাজকন্যা পাইল, অর্দ্ধরাজ্য পাইল, সিংহলের ব্যবস্থাপক সভার বোধ হয় সদস্যও হইয়াছিল এবং পরে পিতার সহিত সাক্ষাৎ হইল। দেবগণ এক্ষেত্রেও স্নেহাবরিত সহানুভূতির অস্ত্রদ্বারাই বীর বণিক্‌কে পরাভব করিলেন। কারানিহিত ধনপতি পুত্রের অনুরোধে নিজেও চণ্ডীর পূজা গ্রহণ করিলেন। স্বর্গে দুন্দুভি বাজিয়া উঠিল; Rule Heavenia সঙ্গীত গীত হইল।

চণ্ডীর শেষ অঙ্কেও যুবক বণিকের উচ্চ-হৃদয়ের পরিচয় দেখিতে পাই। স্বাধিকারপ্রমত্তা রাজকুমারী সুশীলা স্বামীকে নিজ হস্তে পাইয়া, সিংহলের বর্ষব্যাপী সৌন্দর্য্য-সম্ভারের বিষয় জানাইয়া, একটী বৎসরকাল সিংহলে থাকিবার প্রার্থনা জানাইলেন। কিন্তু জননীর শ্রীচরণদর্শনাভিলাষী যুবক শ্রীমন্ত সে সুখের প্রলোভনে মত্ত হয় নাই, পিতাকে সঙ্গে লইয়া জননীর উদ্দেশ্যে ছুটিয়াছিল।

চণ্ডীকাব্যও বণিক্‌সম্প্রদায়ের এই উচ্চ মানসিকতা, সুতরাং উচ্চ জাতীয়তার পরিচয় প্রদান করে।

অবশ্যই একথা বলিতে চাই না, যে বণিক্‌জাতির মধ্যে চাঁদ সদাগর বা ধনপতি, কি শ্রীমন্ত প্রকৃতই জন্মগ্রহণ করিয়াছিল কিম্বা ঐ সমস্ত উপাখ্যান-গুলির বৃত্তান্ত সমুদয় ঠিক সত্য, কিন্তু সেগুলি যে সত্যের সুস্পষ্ট উজ্জ্বল আভাস তাহাতেও বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। রূপ, অবয়বের ছবি যেমন চিত্র বা ফটো রক্ষা করে, সমসাময়িক কাব্য-সাহিত্যও সেইরূপ মানব-চরিত্রের প্রতিকৃতি ধারণ করিতেছে। ভূধর-গাত্রের ক্ষীণ কঙ্কালচিহ্ন যেমন লুপ্ত ঐরাবতের পরিচয় দেয়, সাহিত্য-পটের লুপ্তপ্রায় হস্তলেখা অতীত যুগের মানবের সেইরূপ সুস্পষ্ট ইতিহাস। বর্ণনার আতিশয্যে বা

অলঙ্কারের চাকচিক্যে পুরাতন মানবের স্বরূপ একেবারে লুপ্ত হয় নাই, সকল ঐশ্বর্য্যের পশ্চাতে সে তাহার ব্যক্তিত্ব লইয়া সুস্পষ্ট দণ্ডায়মান আছে। "What is your first remark on turning over the great, stiff leaves of a folio, the yellow sheets of a manuscript,—a poem, a code of laws, a declaration of faith? This, you say, was not created alone. It is but a mould, like a fossil shell, an imprint, like one of those shapes embossed in stone by an animal which lived and perished. Under the shell there was an animal, and behind the document there was a man. Why do you study the shell, except to represent to yourself the animal? So do you study the document only in order to know the man." *Taine.*

বণিক্‌গণের শুধু শিবোপাসকত্বই ও শিবের প্রতি অটল আসক্তিই ভারতের হিসাবে তাহাদের উচ্চ জাতীয়তার বিশিষ্ট প্রমাণ সন্দেহ নাই। এইস্থলে হিন্দুধর্ম্মমণ্ডলে শিবের স্থান-নির্ণয়ের একটু প্রয়াস অপ্রাসঙ্গিক হইবে না—বরং আবশ্যকীয় মনে করি। পরবর্ত্তী নির্দ্ধারণেও এই প্রসঙ্গ অত্যাবশ্যক পরে দেখিতে পাইবেন।

অনেকের মতে যথা প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের বেদের রুদ্র-দেবতাই কালে শিবস্বরূপে ভারতে উপাসিত হইতে থাকেন (বিশ্বকোষ "শিব")। এই সিদ্ধান্ত ভ্রমাত্মক বলিয়াই বোধ হয়; শিবের তেজ-বীর্য্যের কিঞ্চিৎ আভাস বৈদিক রুদ্রদেবতায় পাওয়া যায় এবং কালে অভিধানে 'রুদ্র' ও 'শিব' একই অর্থে ব্যবহৃত হইতেছে বলিয়াই এইরূপ সিদ্ধান্ত যুক্তিসঙ্গত নয়। ঋগ্বেদে রুদ্র-দেবতা মরুৎগণের জনকস্বরূপে বর্ণিত। অগ্নিপ্রজ্বলিত করিলে চতুর্দ্দিক্ হইতে বায়ুপ্রবাহ আরব্ধ হয়, এই নৈসর্গিক ব্যাপার হইতেই যাজ্ঞিক অগ্নিশিখা বা রুদ্রের

সহিত মরুৎগণের পিতাপুত্র-সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে। ঋগ্বেদের মরুৎ-স্তোত্রে সম্বন্ধ এইরূপে সূচিত আছে,—

"নিত্যং ন সূনুং মধু বিভ্রত উপ
ক্রীড়ংতি ক্রীড়া বিদথেষু ঘৃষয়ঃ।
নক্ষংতি রুদ্রা অবসা নমস্বিনং
নমর্ধংতি স্বতবসো হবিষ্কৃতং" ॥

১মঃ ১৬৬ সূঃ ২ ঋক্।

ইহার পণ্ডিত মোক্ষমূলর কর্তৃক ইংরাজী তর্জ্জমা এইরূপ,—

Like parents bringing sweet to their own son (নিত্যং সূনুং) the wild (ঘৃষয়ঃ) (Marutas) play playfully (ক্রীড়ংতি ক্রীড়া) at the sacrifices. The Rudras reach the worshippers (নমস্বিনং) with their protection powerful by themselves they don't hurt the sacrificer (ন ক্ষংতি, ন মর্ধংতি হবিষ্কৃতং)।

আকাশস্থ মরুৎগণও যে একই রুদ্রতনয় মরুৎ, তাহা নিম্নলিখিত শ্লোকেও সূচিত হয়—

"প্র যে শুংভংতে জনয়ো ন সপ্তয়ো
যামন্রুদ্রস্য সূনবঃ সুদংসসঃ।
রোদসী হি মরুত শ্চক্রিরে বৃধে
মদংতি বীরা বিদথেষু ঘৃষয়ঃ" ॥

১মঃ ৮৫ সূঃ ১ ঋক্।

প্রচে শুংভংতে = Those who glance forth, like wives and yoke-fellows (জনয়ো ন সপ্তয়ো) they are the powerful Sons of Rudra (রুদ্রস্য সূনবঃ) on their way. The Marutas have heaven and earth to grow they the strong and the wild delight in sacrifices.—*Maxmuller.*

সুতরাং বৈদিক রুদ্রদেবতা এবং শিবের সহিত কোন সাদৃশ্যই নাই। হিন্দুর দেবদেবীগণের কোন বিশেষ ধারাবাহিক ইতিহাস নাই, তবে হিন্দুর পুরাণগুলির মধ্যে ঐতিহাসিক তথ্য অতি সংগোপনে লুক্কায়িত আছে। হিন্দু-পুরাণের প্রতি লক্ষ্য করিলে স্পষ্টই দেখিতে পাই, বৈদিক যাগযজ্ঞ প্রভৃতির সহিত প্রকাশ্যে বিরুদ্ধাচরণ "শিব" দেবতাই প্রথমে সূচনা করেন। দক্ষযজ্ঞ প্রথমে শিব ও শিবদূত দ্বারাই পণ্ড হয়। দক্ষ-যজ্ঞের পাণ্ডা বৈদিক ঋষিগণ, তাঁহারা শিবদূতগণের অত্যাচারেই অন্তর্হিত হন। অনেকে শিবের এইরূপ আচরণ দেখিয়া অর্থাৎ শিবকে বেদ-বিরোধী দেখিয়া 'শিব'কে একেবারে অনার্য্য দেবতা বলিয়া ফেলিয়াছেন। বর্ত্তমান রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় এই মত প্রকাশ করিয়াছেন। অবশ্যই অনার্য্য শব্দ ন+আর্য্য—অর্থাৎ আর্য্য ব্যতীত অন্য জাতীয় অর্থে ব্যবহৃত হইলে তাঁহার মত অসমীচীন নহে, কিন্তু অনার্য্য শব্দ সাধারণতঃ যে অর্থে ব্যবহৃত হয় অর্থাৎ ভারতীয় আদিম aboriginal জাতির অর্থে ব্যবহৃত হইলে অর্থাৎ 'শিব'কে ভারতীয় বর্ব্বর আদিম অসভ্য জাতির দেবতা বলিলে তাহার মতও ভ্রমাত্মক বলিয়াই বোধ হয়।

এইস্থলে কিঞ্চিৎ রাষ্ট্রীয় তথ্যের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। আমি পূর্ব্বেও কিঞ্চিৎ আভাস দিয়াছি, পরেও দেখাইব, এবং এখনো বলিতেছি, কি ধর্ম্মজগৎ, কি চিন্তাজগৎ, কি মানব-সমাজ, কি মানবের শিক্ষা আচরণ অনুষ্ঠান সমস্ত বিষয়ের তথ্য ও সিদ্ধান্ত আদিম মূল তথ্য রাষ্ট্রীয় তথ্যের উপরে নির্ভর করে। পৃথিবীর যা কিছু পরিবর্ত্তন রাষ্ট্রীয় পরিবর্ত্তনেই তাহার সূচনা বা পরিণতি। Theodore *P*arkar বলেন *P*olitics is the science of exigencies পৃথিবীর যা কিছু পরিবর্ত্তন রাষ্ট্রীয় তথ্যই তাহার রহস্যোদ্‌ঘাটন করিবে। বৈদিক দেবতাগোষ্ঠী, যাজ্ঞিক হবি ও আহুতি দ্বারা সদলবলে সুখে-স্বচ্ছন্দে আপনাদের উদর-

পূর্ত্তি করিয়া আসিতেছিলেন, হঠাৎ একা শিবের এমন কি সাধ্য যে তাঁহাদের মুখের গ্রাস কাড়িয়া লন। শিবের এই পারগতার মূল কারণ রাষ্ট্রীয় বল। যে দুর্দ্ধর্ষ বিক্রমশালী শক Scythian জাতি ভারতের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তস্থিত আর্য্য বা বৈদিক জাতিকে প্রহত করিয়া তথায় স্বাধিকার স্থাপন করেন, শিব সেই শকগণেরই উপাস্য দেবতা; যে শক-বংশীয়গণ পরে 'রাজপুত' নাম গ্রহণ করিয়া 'হর হর ব্যোম ব্যোম' শব্দে ভারতে দিগ্বিজয় করিয়াছিলেন, 'শিব' সেই শকগণের সহিতই ভারতে প্রথম প্রবেশ করেন; যে দেশের পাঠানগণ পরে উপর্য্যুপরি ভারত আক্রমণ করিয়া ভারতে বিজয়-বৈজয়ন্তী প্রোথিত করিয়াছিলেন, 'শিব' সেই আফগানিস্থান প্রভৃতি দেশেরই আদিম অধিবাসী। 'শিব' ভারতের আগন্তুক খাঁটি দেশী দেবতা নহেন। শিবের প্রবল প্রতাপ, সিন্ধু হইতে গঙ্গাসাগর, হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই শিবময়। ইহার কারণ আর অন্য কিছু নহে, শক-সভ্যতা। আদিম আর্য্য-সভ্যতা ও নবোদ্ভূত দ্রাবিড়ী সভ্যতা এবং অপর আগন্তুক মোঙ্গলীয় সভ্যতার সহিত মিশ্রিত হইয়া যে বিরাট্ ভারতীয় সভ্যতার সৃজন করে, তাহাতে ধর্ম্মমণ্ডলে 'শিব'ই সর্ব্বোপরি প্রবল হন, কারণ তাঁহার উপাসক শকগণই প্রবলতম ছিল। শক-সভ্যতা প্রথমে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই আর্য্য-সভ্যতার পাণি-গ্রহণেচ্ছু হইয়া আর্য্যসভ্যতাকে আপন করিয়া লইবার চেষ্টা করে। নিরীহ, বিধ্বস্ত আর্য্যগণের পক্ষে শকগণের বীর্য্য অসহ্য বোধ হয়। তাই দক্ষরাজ-যজ্ঞে শিবের নিন্দা শুনিয়া আর্য্য-সভ্যতার দুহিতা দক্ষকন্যা সতী প্রাণত্যাগ করেন এবং কিছুকাল আর্য্য-সভ্যতা শকসভ্যতা হইতে পৃথক্ থাকে। পরে ভারতের উত্তরপূর্ব্ব প্রান্ত হইতে মোঙ্গলীয় সভ্যতা ও মোঙ্গলীয় বীর্য্য ভারতে প্রবেশ করিতে থাকে। তিব্বতীয়গণ কর্ত্তৃক উত্তর ভারতে রাজত্বস্থাপন ইতিহাসপ্রসিদ্ধ। শকসভ্যতা সহজে ইহার

সহিত মিলিত হইতে প্রস্তুত ছিলেন না। কিন্তু মোঙ্গলীয় সভ্যতার প্রবাহ উত্তর ভারতে অপ্রতিহত গতিতে প্রবেশ করে। কালে "কুর্য্যাদ্ হরস্যাপি পিণাকপাণেঃ ধৈর্য্যচ্যুতিং" মোঙ্গলীয় সভ্যতার এই প্রতিজ্ঞাই বলবৎ হয়। এই ক্ষেত্রেই ভারতীয় মহাকবিগণ ব্যাস, বাল্মীকি, শক ও মোঙ্গলীয় সভ্যতার সংমিশ্রণরূপ হর-পার্ব্বতীর বিবাহ কীর্ত্তন করিয়াছেন এবং পরে মহাকবি কালিদাসও হর-গৌরীর বিবাহ-কীর্ত্তন করিয়া ভারতে 'কুমার-সম্ভব' গাহিয়া গিয়াছেন। প্রকৃতই উত্তর ভারতের কুমারগণ তিনি কুমারগুপ্তই কি কুমার সিংহই হউন, এক কথায় উত্তর ভারতের শৌর্য্য, বীর্য্য শক ও মোঙ্গলীয় জাতির সংমিশ্রণজাত তাহাতে সন্দেহ নাই।

মধ্য ও দক্ষিণ-ভারতেও ক্রমে শকবিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে শিবের আধিপত্য স্থাপন হয়। প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য্যাপ্লুত, স্নেহমণ্ডিত, স্নিগ্ধ দক্ষিণ-ভারতে লক্ষ্মীশ্বর প্রেমিক বিষ্ণুদেবেরই আবির্ভাব হয়। দ্রাবিড়গণ অধিকাংশই বিষ্ণু-উপাসক, কিন্তু সেখানেও শিবোপাসক শকগণ বিজয়স্তম্ভ স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে বহু শিব-মন্দিরও স্থাপন করে। দুর্দ্ধর্ষ দ্রাবিড়ীগণ শকগণের একেবারে করায়ত্ত হয় নাই; শকগণের সহিত সমকক্ষতা রক্ষা করিতে তাহারা সমর্থ হইয়াছিল, তাই শিব ও বিষ্ণুর পরে আপোষ হইয়াছে। নানাবর্ণ ও জাতির লীলাক্ষেত্র ভারতের এক প্রধান বিশেষত্ব আপোষ-প্রবণতা; এক কর্তৃক অন্যের সমূল উচ্ছেদ ভারতে অতি অল্প স্থানেই ঘটিয়াছে। তাই কালে ভারতীয় সমাজ বৈদিক, দ্রাবিড়ীয় ও শক-মঙ্গো-সভ্যতার আপোষ করিয়া এই তিন মহাবৃক্ষের ত্রিফলাকে গঙ্গা, যমুনা, সিন্ধু, কাবেরী, গোদাবরীর সলিলে সিক্তকরতঃ তাহারই রস-পানে আপনাদের দ্বন্দ্বজ বৈষম্য দূর করিবার ব্যবস্থা করিয়া লইয়াছে।

যদিও 'শিব' ভারতময়, তথাপি শিবোপাসনার পদ্ধতি সর্ব্বত্র একরূপ নয়। কোথায়ও 'শিব' কেবল মন্ত্রদ্বারা উপাসিত হন, কোথায় বা

নরাকার দেশে উপাসিত হন, কোথায় বা 'শিব' শিলাময় পুরাতন আর্য্যগণের ন্যায় পুরাতন শকগণ শুধু মন্ত্রোপাসক ছিলেন অর্থাৎ কোনরূপ মূর্ত্তিপূজা না করিয়া মন্ত্রোচ্চারণেই বৈদিক প্রার্থনার ন্যায় শুধু প্রার্থনা দ্বারাই উপাস্য 'শিব'কে স্তুতি করিতেন। কিন্তু এই শ্রেণীর শিবোপাসনা এক্ষণে ভারতে বিরল। ভারতের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে দৃষ্ট হয় এবং ভারতবহির্ভূত আফগানিস্থান ও বেলুচিস্থান অঞ্চলে যে সামান্য সংখ্যক হিন্দু আছেন, তাহাদের মধ্যেও দৃষ্ট হয়। কিন্তু ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে অন্য প্রকার উপাসনার সহিত এই পদ্ধতি মিশিয়া গিয়াছে।

'শিবের' শিলাময় মূর্ত্তি কিঞ্চিৎ চিন্তার বিষয়। বর্ব্বরজাতি কর্ত্তৃক অধ্যুষিত মধ্য-ভারতে অতি ত্রস্ততার সহিত শৈবধর্ম্ম প্রচারের চেষ্টাতেই এই কাণ্ড ঘটিয়াছে। মধ্য-ভারতের বর্ব্বরগণ সাধারণতঃ প্রস্তর ও বৃক্ষাদির উপাসক। এখন তাহারা খৃষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করিলেও তাহাদের সিন্দুর-রাগ-রঞ্জিত প্রস্তরখণ্ডের উপাসনা পরিত্যাগ করে নাই। খৃষ্টান হইয়াছে বলিয়াই তাহারা ধর্ম্মত্যাগী, বিধর্ম্মী বলিয়া আপনাদিগকে পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত। শিলা ও বৃক্ষোপাসনা তাহাদের স্বাভাবিক স্বধর্ম্ম। তাই স্থলবিশেষে 'শীতলা' বা শিলাময় অন্য দেবতার উপাসনা খৃষ্টান হইলেও তাহারা ছাড়ে নাই। এইস্থলে অবশ্যই খৃষ্টানপাদরীগণ বর্ব্বর চরিত্রের উৎকট স্থিতিশীলতা দেখিয়া নির্ব্বাক্ থাকেন। নিতান্ত অধীর হইয়া যেন তেন প্রকারেণ কার্য্য-উদ্ধারের নীতি অবলম্বন করেন না। মহদনুষ্ঠানের উপযোগী মহাধৈর্য্যের সহিত, আপনাদের ধর্ম্মের মহত্ত্বের বিশ্বাস অটল রাখিয়া, প্রাকৃতিক গতির স্বাভাবিক শক্তির উপরে নির্ভর করেন, সময়ের সহকারিতায় বিশ্বাস করেন, নবদীক্ষিত বর্ব্বরদিগকে এরূপ শিক্ষা দেন না যে, ঐ প্রস্তরখণ্ডই তাহাদের যীশু বা পবিত্র ক্রস। কিন্তু দুর্ভাগ্য কি সৌভাগ্যের কথা বলা কঠিন, বৌদ্ধধর্ম্ম প্রহত-প্রয়াসী সুতরাং

ব্যস্তবাগীশ। প্রতিদ্বন্দ্বিতার তাড়নায় চক্ষুরোগগ্রস্ত সাধারণ শঙ্করনামাধ্যায়ী শৈবধর্ম্ম-প্রচারকগণ 'তথাস্তু' বলিয়া বর্ব্বরের শিলাখণ্ডকেই 'শিব' বলিয়া শিক্ষা দেন এবং 'শিব' বলিয়া গ্রহণ করেন। কাজ কিছু সহজ ও সংক্ষেপ করা হয় বটে, কিন্তু পরিণাম যে ক্রমেই বিপরীত হইতে থাকে তাহা অতি সহজবোধ্য। পরবর্ত্তী যুগে ভারতীয় ভাস্কর-পটুতার শ্রীবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের যে-কোন-প্রকারের প্রস্তরখণ্ড 'শিব' ক্রমশঃ একমূর্ত্তি শিব ও পরে মূর্ত্তিহীন নির্দ্ধারিত ক্রম-সূক্ষ্ম ও মসৃণ দেহ ধারণ করে এবং সময়ে কবিশ্রেণীর পুরোহিতের ভক্তি ও কল্পনার মহিমায় পরিষ্কার, পবিত্র পৌরুষ-চিহ্নের আকার ধারণ করিয়া বসিয়াছে।

শিবের নরাকৃতি পূর্ব্বোত্তর ভারতে আবদ্ধ। বারাণসী ইহার পীঠস্থান। এই খানেই হরগৌরী নরনারী মূর্ত্তিতে বিরাজিত, উত্তর-ভারতীয় কবিগণ এই খানেই অর্দ্ধ-নারীশ্বর মূর্ত্তি দর্শন করেন। ইহা তিব্বতীয় সাধুর কৃপা তাহাতে সন্দেহ নাই। তিব্বতীয়গণ কর্ত্তৃক উত্তর-ভারতে রাজ্য-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে এদেশে মোঙ্গলীয় সভ্যতার প্রবাহ আগমন করে এবং তিব্বতীয় পুরোহিত ডালাই লামা সশরীরেই ভারতে অবতীর্ণ হন। প্রথমে হিমালয়ের পাদদেশে আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করিয়া ডালাই লামা গাঙ্গপ্রদেশ পর্য্যন্ত অগ্রসর হন। মূঢ়ের কল্পনাকে স্তম্ভিত করিবার উপযোগী পুরোহিতের ভড়ং ডালাই লামা স্বশরীরে সমুদয়ই একত্র করিয়াছিলেন; বাহন পার্ব্বতীয় অতিকায় বৃষ, কণ্ঠে পার্ব্বতীয় অজগর, হস্তে পার্ব্বতীয় মহিষের শৃঙ্গ-নির্ম্মিত শিঙ্গা, পরিধান পার্ব্বতীয় ব্যাঘ্রের চর্ম্ম—এ সমুদয়ই অজ্ঞ বর্ব্বর যজমান-হৃদয়কে অভিভূত করিতে বিশেষ ক্ষমতাশালী; সহজেই তাহারা ঈদৃশ ডালাই লামার নিকট মস্তক অবনত করিবে। ডালাই লামার তদুপরি কপালজোর, অদৃষ্টবলে খুঁৎটুকুও গুণেই পরিণত হইয়াছে—ডালাই লামার মার্জ্জার-শাবকোপম অর্দ্ধস্ফুট

মোঙ্গলীয় চক্ষু ভারতীয় কবিশ্রেণীর ভক্তের দ্বারা ধ্যান-স্তিমিত-লোচন-রূপে অথবা মূঢ়শ্রেণীর সাধকের দ্বারা ভাং ধুতুরা ইত্যাদি মাদকে ঈষন্মত্ততা-জনিত সঙ্কুচিত চক্ষু বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। ভারতীয় শিল্পি-গণও মৃন্ময় ডালাই নামার গাত্রে জীবন্ত ডালাই লামার হরিদ্রাভ গৌর রং যতদূর সম্ভব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। এই মূর্ত্তিই কাশীর বিশ্বেশ্বর মূর্ত্তি। কনৌজ, কাশী-অঞ্চল, মিথিলা, বিহার প্রভৃতি গাঙ্গপ্রদেশে আধিপত্য স্থাপন করিয়া ত্রিলোচন ক্রমে বঙ্গে প্রবেশ লাভ করেন। বঙ্গবিজেতা তিব্বতীয় রাজগণ দ্বারাই ত্রিলোচন এদেশে প্রতিষ্ঠিত হন। দিনাজপুরের বাণগড়ে প্রাপ্ত দিনাজপুরের রাজপ্রাসাদের সম্মুখস্থ রাজোদ্যানে রক্ষিত একটি প্রস্তরস্তম্ভের পাদদেশে উৎকীর্ণ লিপিদ্বারা এই তথ্যই সমর্থিত হয়। উক্ত লিপির পাঠ এইরূপ,—

> "দুর্ব্বারারি-বরুথিনী-প্রমথনে দানে চ বিদ্যাধরৈঃ
> সানন্দং দিবি যস্য মার্গণগুণগ্রামগ্রহো গীয়তে।
> কাম্বোজান্বয়জেন গৌড়পতিনা তেনেন্দুমৌলেরয়ং
> প্রাসাদো নিরমায়ি কুঞ্জরঘটা বর্ষেণ ভূভূষণঃ।"

ইহা দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে কাম্বোজবংশোদ্ভব গৌড়পতি ইন্দুমৌলি অর্থাৎ শিবের মন্দির নির্ম্মাণ করিল। পণ্ডিতগণের মতে, বিশেষতঃ ফরাসী পণ্ডিত ফুসের মতে, কাম্বোজ অর্থে তিব্বত দেশ। সুতরাং ইন্দুমৌলি—ত্রিলোচন অর্থাৎ নরাকৃতি শিবপূজার পদ্ধতি গৌড়ে তিব্বতীয়গণ দ্বারা প্রারব্ধ ও প্রতিষ্ঠিত হয় সন্দেহ নাই।

কনৌজ, কাশী, মিথিলা, বিহার প্রভৃতি অঞ্চলে শিবপূজার বেশ আধিক্য থাকিলেও এ নরাকৃতি পূজা সেই সমস্ত অঞ্চল হইতে প্রায় লুপ্ত হইয়াছে। বঙ্গবিহারের সন্ধিস্থল মালদহ জেলা পর্য্যন্ত এই নরাকার শিবের বেশ প্রসার ছিল এবং এখনো এই মালদহ জেলাতেই গৌড়াগত

বণিক্‌গণ (যাহারা আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি তথায় "বঙ্গদেশী" নামে পরিচিত) নরাকার শিব অর্থাৎ হুবহু কাশীর বিশ্বেশ্বর মূর্ত্তির অনুরূপ ৩।৪ হস্ত পরিমিত দীর্ঘ মূর্ত্তি গঠন করিয়া পূজা করিয়া থাকেন। যদিও অধুনা এই গৌড়বণিক্‌গণ চৈতন্যধর্ম্মাবলম্বী, তথাপি চৈত্রসংক্রান্তি হইতে প্রায় দুই মাসাবধি কাল গম্ভীরা নামক অনুষ্ঠানে "শিবো হে" গানে প্রমত্ত হইয়া প্রাগুক্ত নরাকার শিবমূর্ত্তি নিৰ্ম্মাণ করিয়া পূজা করেন। মালদহের সর্ব্ব শ্রেণী হিন্দুগণই "গম্ভীরা" অনুষ্ঠানে যোগ দেন, কিন্তু তথাকার বণিক্‌গণের এই ব্যাপারে যোগদানই এই প্রবন্ধের বিশেষ লক্ষ্যের বিষয়। নরাকার শিবের সহিত মালদহে বণিক্‌গণের সাক্ষাৎ অবশ্যই একটু চিন্তার বিষয়। মালদহের চতুঃপার্শ্বস্থ কোন অঞ্চলেই নরাকৃতি শিবপূজা বর্ত্তমান নাই। মালদহেই অনুষ্ঠান আবদ্ধ। মালদহের বিশেষ অধিবাসী গৌড়ীয় বণিক্‌গণই এই বিশেষত্বের মীমাংসা করে। বণিক্‌গণ যখন বঙ্গে প্রবেশ করেন, তখন তাঁহারা নরাকারে শিবপূজা করিতেন না, ক্রমে যখন উত্তরে উঠিতে লাগিলেন, নির্য্যাতনের প্রকোপে যখন তাঁহাদের হৃদয়ের বল কমিয়া আসিতে লাগিল—যখন গৌড়ে বর্ত্তমান মালদহ-অঞ্চলে প্রবেশ করেন, এই খানেই নরাকার শিবের সঙ্গে তাঁহাদের সাক্ষাৎ হয়। এই শিব উত্তরাঞ্চলে কোচরাজবংশী জাতির মধ্যে বেশ প্রতিপত্তি স্থাপন করিয়া গৌড়মালদহ প্রদেশে শিবোপাসক বণিকের আগমন শুনিয়া গৌড়ে প্রবেশ করেন। বণিক্‌গণের তখন মনস্বিতা অনেক কমিয়া আসিয়াছে, নরাকারে শিবকে পাইয়া তাহারা তাঁহাকেই পাদ্যার্ঘ প্রদান করিল।

যাহা হউক, এই শিব ঠাকুর বঙ্গোপকণ্ঠস্থ মালদহ পর্য্যন্ত আপনার পসার বাড়াইতে সক্ষম হইয়াছিলেন, কিন্তু বঙ্গে প্রবেশ করিতে গিয়া তাঁহার নিতান্ত দুর্দ্দশা হয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি বঙ্গে চণ্ডীরই আধিপত্য। দেব-দেবীগণও ঈর্ষাপরতন্ত্র। চণ্ডী শিবকে বঙ্গে উপস্থিত দেখিয়া তাঁহাকে

আক্রমণ করেন, যুদ্ধে শিবের লজ্জাস্কর পরাজয়। ডালাই লামা সটান চীৎপাৎ, চণ্ডী বুকের উপরে দণ্ডায়মানা, ইহাই বঙ্গের কালিকা-মূর্ত্তি। অবশ্যই পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ভারতের এক বিশেষত্ব—আপোষ, শিবের সঙ্গে চণ্ডীর পরে আপোষ হয়, শিবকে স্বামিত্বপদে বরণ করেন। বঙ্গকবিগণ চণ্ডীকে হিমালয়-দুহিতার স্থানে আনিয়া তাঁহাকে "শিবানী" করিয়াছেন।

শিবের এই দুরবস্থাও ভগবানের নিতান্ত অবিচার বলা যায় না, কারণ "শিব" উচ্চ শ্রেণীর দেবতা। তিনি নিম্ন শ্রেণীর দেবতার ন্যায় হীন পন্থা অবলম্বন করিয়া পসার বৃদ্ধির চেষ্টা করেন। নিম্নশ্রেণীর দেবদেবীগণ নরাকার ধারণ করিয়া বেশ প্রতিপত্তি স্থাপন করিতেছেন দেখিয়া 'শিব'ও তাহাতে প্রলুব্ধ হন, তাই বঙ্গে নরদেহ ধারণ করিয়া উপস্থিত হন। কিন্তু শিবের বোঝা উচিত ছিল হীনতা বা নীচতা, হীন বা নীচের সহায় হইয়াই সফলতা দিতে পারে। উচ্চের পক্ষে হীনতা বা নীচতা অবলম্বন লজ্জাস্কর পতনের কারণ হয়। বঙ্গে এই দুর্দ্দশাই ঘটিয়াছিল।

বণিক্-সম্প্রদায় যদি এ দেশের আগন্তুক হন, তবে কোথা হইতে আসিলেন এ প্রশ্ন স্বাভাবিক। নিঃসন্দেহে তাহার উত্তর দেওয়া সহজ নহে। ভারতের যে কোন্ স্থান হইতে তাঁহারা বঙ্গে আসেন, ভারত-মানচিত্রের ঠিক সেই স্থানে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করা সহজ নহে, তবে এতদ্বিষয়ে চেষ্টা করিতে অবশ্যই বাধা হইতে পারে না। এ বিষয়ে বিচার করিতে হইলে বঙ্গে প্রবেশকালীন এই বণিক্গণের কয়েকটী লক্ষণ স্মরণ রাখা আবশ্যক। প্রথমতঃ তাঁহারা শিবোপাসক, দ্বিতীয়তঃ তাঁহারা জল-বণিক্। এই দুই কারণ হইতে ধরা যাইতে পারে, তাঁহারা ভারতীয় কোন জল-বাণিজ্যপ্রধান শিব-ধর্ম্ম-সঙ্কুল স্থান হইতে আসেন। তেমন স্থান কোথায়? এ সম্বন্ধে পরিব্রাজকের ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টি করিতে পারি। সুবিখ্যাত চীনদেশীয় পরিব্রাজক হিউয়েনসিয়ং শৈবগণের কীর্ত্তি-কলাপের

অনেক পরিচয় তদীয় তীর্থ-ভ্রমণ-গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। "তিনি ৬৪৫ খৃঃঅব্দে এ দেশ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন এবং কাশী, কান্যকুব্জ, করাচী, মালাবার, কান্দাহার প্রভৃতি বহুল স্থানে শিবমন্দির দেখিতে পান"—বিশ্বকোষ ৫৫৭ পৃষ্ঠা।

ভারতের পূর্ব্ব-উপকূলে বাণিজ্য-প্রধান অথচ শিব-প্রধান স্থান অতি অল্পসংখ্যকই, পশ্চিম উপকূলে তত বেশী নহে। পূর্ব্বোদ্ধৃত ভ্রমণ-বৃত্তান্তে দেখা যায়, আর্য্যাবর্ত্ত ও দক্ষিণাপথের সন্ধিস্থল করাচী ও গুজরাট প্রদেশে এইরূপ স্থান ছিল। গুজরাট অঞ্চলই বঙ্গের বণিক্-সম্প্রদায়ের আদি-স্থান হইতে পারে কিনা? এতৎসম্বন্ধে পদ্মাপুরাণ, চণ্ডীকাব্যে বিশেষ কোন উল্লেখ নাই। তবে চণ্ডীর এক স্থানে গুজরাটের যেরূপভাবে উল্লেখ আছে, তাহা উপরোক্ত মতেরই পোষণ করে। বঙ্গীয় কবি বঙ্গের চতুঃপার্শ্বস্থ দেশের নাম নিজেই জানিতে পারেন, কিন্তু দূরদেশ, যথা সিংহলাদি দেশের বৃত্তান্ত অবশ্যই বণিক্-সম্প্রদায়ের নিকট শুনিয়াছিলেন। গুজরাটের সম্বন্ধেও এইরূপ বলা যাইতে পারে অর্থাৎ গুজরাটের সম্বন্ধে বঙ্গীয় কবি এই বণিক্‌গণের নিকট শুনিতে পান। এই অবস্থায় বণিক্‌-গণের সহিত গুজরাটের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। তবে এখানে কেহ বলিতে পারেন, এরূপ অবস্থায় গুজরাটের সহিত বণিক্‌গণের যদি কোন সম্বন্ধ সূচিত হইয়া থাকে, তাহা সিংহলের ন্যায়, তদপেক্ষা অধিক কেন হইবে?

অর্থাৎ যদি কোন অনুমান সম্ভব হয়, তাহা এই মাত্র যে, সিংহলের ন্যায় গুজরাটে বণিক্‌গণ বাণিজ্য করিতেন মাত্র, গুজরাট হইতে আসিয়া-ছিলেন এতদূর বুঝা যায় না। কিন্তু চণ্ডীতে সিংহলসম্বন্ধে যেরূপ ভাবে উল্লেখ আছে, গুজরাট সম্বন্ধে উল্লেখ সেরূপ নহে। সিংহলের প্রশংসাই দেখা যায়। সেখানকার রাজাও চণ্ডীর পূজা গ্রহণ করেন, কিন্তু গুজরাটের

প্রতি নিতান্ত অশ্রদ্ধা ও অবজ্ঞা। চণ্ডীর কৃপাপ্রাপ্ত কালকেতু গুজরাটের বনজঙ্গল কাটিয়া—"মহাবীর কাটে বন"—তথায় রাজ্য স্থাপন করেন। গুজরাট পূর্ব্বে জঙ্গলময় ছিল, পরে ব্যাধের রাজ্যে পরিণত হয়। চণ্ডীর কবির শুধু বণিক্‌গণের প্রতিই অবজ্ঞা নহে, সেই অবজ্ঞা তাহাদের পূর্ব্ব-নিবাস গুজরাট পর্য্যন্ত অগ্রসর করিয়াছে, এই অনুমান নিতান্ত অসঙ্গত নহে। ইহা অত্যন্ত স্বাভাবিক ও এরূপ উদাহরণ ভারতের অন্যান্য গ্রন্থেও পাওয়া যায়। এখানে একটি কথা বলা আবশ্যক। প্রাচীনতর চণ্ডীকাব্য অর্থাৎ কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম প্রণীত চণ্ডীকাব্যের পূর্ব্ববর্ত্তী কোন চণ্ডীকাব্যে গুজরাটপ্রসঙ্গ নাই। কবিকঙ্কণ প্রণীত চণ্ডীতেই প্রথম। এই অবস্থাটিও পূর্ব্বোক্ত অনুমান অর্থাৎ বঙ্গীয় বণিক গুজরাট হইতে আগত এই তথ্যকে বলবৎ করে। কারণ লোক-চরিত্র আলোচনা করিলে দেখা যায়, শত্রুর সহিত সমরে জয়লাভ করিলে জয়োৎফুল্ল হইয়া বিজয়ী অনেক সময় জয়পতাকা কল্পনার চক্ষে অনেক দূরে বহন করিয়া লইয়া গিয়া শত্রুর বাস্তুভিটায় প্রোথিত করিবার স্বপ্ন দেখে। বঙ্গীয় বণিক্‌গণের সহিত বঙ্গীয় দেবদেবীগণের প্রথম সমরে শুধু শত্রুদমনেরই চেষ্টা, তাই পদ্মাপুরাণ বা প্রাচীনতর চণ্ডীগুলিতে গুজরাটবিজয়ের কোন উল্লেখ নাই, পরে ক্রমে বণিক্‌দলনে উল্লাসিত হইয়া কবির মানস-চক্ষুও ঈর্ষা-রোগাক্রান্ত হইয়াছে, তাই বণিকের বাস্তুভূমি গুজরাটও কবির প্রকোপের হাত হইতে রক্ষা পায় নাই। সে গুজরাট আবার জঙ্গলাকীর্ণ, কারণ সেখানকার অধিবাসী বণিক্‌গণ সকলেইত বঙ্গে চলিয়া আসিয়াছে, সেখানে আর লোক কোথায়?

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ইহার অনুরূপ দৃষ্টান্ত ভারতের অন্যান্য গ্রন্থেও পাওয়া যায়, উদাহরণস্থলে শিখগ্রন্থ উল্লেখ করিতে পারি। শিখধর্ম্ম কিছু-কালের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় যখন ভারতের মুসলমানধর্ম্মকে কিঞ্চিৎ প্রতিহত

করিতে সমর্থ হইয়াছিল, তৎপরে শিখ-গুরুগণ, আনন্দের উল্লাসে কল্পনা-চক্ষুর বলে মক্কামদিনা-জয়ের প্রসঙ্গও গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেন। নানকের নাসিন্তনামা গ্রন্থে নানকও মদিনাপতি কেরনের সহিত কথোপকথনস্থলে এইরূপ লিখিত আছে—"আমি নানক দশম অবতাররূপে গুরুগোবিন্দ নাম ধারণ করিয়া জন্মগ্রহণ করিব এবং মক্কা, মদিনা দলন করিব, মুসলমানধর্ম্ম তথা হইতে তাড়াইয়া দিয়া শিখধর্ম্ম তথায় স্থাপিত হইবে, ইত্যাদি।" অবশ্যই শিখগ্রন্থের দম্ভ চণ্ডীকাব্যে নাই, কারণ তাহা অবস্থা ও ক্ষমতার উপরে নির্ভর করে। কালকেতুর ক্ষমতায় যতদূর কুলায়, সেইরূপ ভাবেই গুজরাটের উপর আক্রোশ সাধন করা হইয়াছে। সুতরাং পূর্ব্বোক্তভাবে কবিকঙ্কণের চণ্ডীতে গুজরাটের উল্লেখ হইতেও আমরা অনুমান করিতে পারি। গুজরাটই বঙ্গীয় বণিক্‌গণের প্রধানতঃ সাধারণ আদিস্থান।

এতদ্বিষয়ে আর একটি প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহা আমার নিকট অতি বলবান্ বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু তদ্বিষয়ে সম্পূর্ণ অভিমত প্রকাশ করিতে আমি এক্ষণে সমর্থ নহি, তবে উল্লেখ করিতে পারি। গুজরাট ও বঙ্গদেশ যদিও ভারতের দুই বিভিন্ন প্রান্তে অবস্থিত, তথাপি গুজরাটী ও বঙ্গভাষার মধ্যে এত সাদৃশ্য আছে যে, ভারতের কোন দুই দূরবর্ত্তী ভিন্ন প্রদেশের ভাষায় এত ঐক্য দেখিতে পাওয়া যায় না। গুজরাট-ভ্রমণকারী বাঙ্গালী এ বিষয়ে বেশ সাক্ষ্য দিতে পারেন।

শুধু ভাষা নহে, আচার-ব্যবহার, পরিচ্ছদ ও আকারাদিতেও অনেক ঐক্য আছে। আধুনিক বলিয়া বণিক্ সম্প্রদায়ের আকার পরিচ্ছদে কোন বিশেষত্ব নাই, তাহা অন্যান্য বাঙ্গালীর ন্যায়ই হইয়া গিয়াছে। কিন্তু তাহাদের পরিচ্ছদাদি সম্বন্ধে ধারণা করিবার পূর্ব্বে তাহাদের পূর্ব্বাকৃতির চিত্র যে কোন্ স্থানে পাওয়া যায়, তাহা দেখা কর্ত্তব্য। আমি একস্থলে

লক্ষ্য করিয়াছি, এই বণিক্‌গণ, যখন বঙ্গে প্রথম চৈতন্যমত প্রচার হয়, তখন অনেকে সেই মতে দীক্ষিত হন। যে সব বাঙ্গালী তৎকালে চৈতন্য-মতকে সাদরে আলিঙ্গন করিয়াছিল, তন্মধ্যে বণিকৃজাতি বিশিষ্টসম্প্রদায়। বর্ত্তমানের অধিকাংশ বঙ্গীয় বণিক্‌গণই চৈতন্যমতাবলম্বী। এই বণিক-সম্প্রদায় সেই সময়ে নগর-সঙ্কীর্ত্তনে যোগদানকরতঃ মৃদঙ্গ, করতাল বাজাইয়া চৈতন্যমত প্রচার করিতেন। চৈতন্য-সম্প্রদায়ের এক সংকীর্ত্তনের ছবি যাহা শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য ২য় সংস্করণ" ৩১৮ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত করিয়াছেন এবং যাহা বাঃ ১০৯৮ সালের লিখিত "চৈতন্যভাগবত" পুথির মলাটে প্রদত্ত চিত্রের প্রতিলিপি বলিয়া বর্ণিত আছে, তদ্দৃষ্টে দেখা যাইবে * * * * এই সময়ের বণিক্ বর্ত্তমান মারওয়াড়ীগণের ন্যায় উষ্ণীষধারা, গায়ে আঁটা আঙ্গরাখা পরিহিত। উহাই গুজরাটী ভদ্রসমাজের পরিচ্ছদ। সুতরাং পরিচ্ছদও বণিকগণকে গুজরাটাগত বলিয়া সাব্যস্ত করে।

গুজরাটী ভাষা ও বঙ্গভাষার ঐক্যসম্বন্ধে এখন বেশী কথা বলিতে পারি না। তবে বঙ্গীয় বণিক্‌সমাজের ব্যবহৃত কতকগুলি শব্দের সহিত যে বিশেষ ঐক্য আছে তাহা দেখাইতে পারি। গুজরাটী শেঠ শব্দের অর্থ 'মহাশয়' বঙ্গের শেঠও মহাশয়ত্বসূচক। গুজরাটী 'সাহ' শব্দ হিন্দু ব্যবসায়িগণের উপাধি, বঙ্গেও তাহাই। বঙ্গের বণিকের সোনা গুজরাটী সোন্নুং, বঙ্গের তামা গুজরাটী তাম্বুং, বঙ্গের মণিমুক্তা গুজরাটী মণিমুক্তা, বঙ্গের বণিকের কড়ার করা, গুজরাটী কড়ার বুং ইত্যাদি। গুজরাটী ও বঙ্গভাষার ঐক্য অনুসন্ধানে একখানি গুজরাটী ভাষার অভিধান খুলিয়া দেখিয়াছি এক 'ক'—আরব্ধ শব্দগুলি মধ্যে সংস্কৃতমূলক বা সংস্কৃত সাধারণ বহু সদৃশশব্দ বাদেও বহু প্রাদেশিক শব্দ একরূপ, যথা—গুজরাটী 'কচ' বাঙ্গলায় 'কচায়ন', গুজরাটী 'করাশ' বাঙ্গলায় 'কাঁচা', গুজরাটী 'কজিও'

বাঙ্গলায় 'কাজিয়া', গুজরাটী 'কাপড়' বা 'কাপুড়', বাঙ্গলায় 'কাপড়'। গুজরাটী 'কঠারী' বাঙ্গলায় 'কাটারি' (অস্ত্র), গুজরাটী 'কহিবুং' বাঙ্গলায় কহিব। গুজরাটী 'কাক', 'কুতরো', 'কম্বল', 'কড়রু' বাঙ্গলা যথাক্রমে 'কাকা', 'কুত্তা', 'কম্বল', 'কড়া', গুজরাটী 'কামান' বাঙ্গলা 'কামানী', (বক্র arch) ইত্যাদি। যাহা হউক, ইহা অবশ্যই পর্য্যালোচনার বিষয়। যদি ইহা সত্য হয়, তবে বঙ্গভাষা ও বঙ্গজাতি বঙ্গীয় বণিক্‌সম্প্রদায়ের কাছে বিশেষ ঋণী।

বঙ্গীয় বণিক্‌গণ গুজরাট হইতে আগত সাব্যস্ত হইলে অর্থাৎ তাঁহারা কোন্ দেশীয় লোক নির্দ্ধারিত হইয়া গেলেও তাহারা কোন্ জাতীয় লোক এ প্রশ্নের উত্তর বাকী থাকে এবং এই প্রশ্নের উত্তর না দেওয়া পর্য্যন্ত বঙ্গীয় বণিকের ইতিহাস অসম্পূর্ণ। পূর্ব্বে প্রতিপন্ন হইয়াছে, বঙ্গীয় বণিক-গণ পূর্ব্বে শৈবধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। ভারতীয় শৈবধর্ম্মসম্বন্ধে পূর্ব্বে যে একটু দৃশ্যতঃ বাহুল্যরূপে আলোচনা হইয়াছে তাহার প্রত্যেক কথাগুলি এখন বিশেষ কাজে লাগিবে। সেই কথাগুলি দ্বারা প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছি, পুরাতন ভারতে শৈবধর্ম্ম ও শকসভ্যতা একার্থব্যঞ্জক। সুতরাং পুরাতন বঙ্গীয় বণিক্‌গণ শকসভ্যতার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন ইহা আমরা নিরাপত্তিতে গ্রহণ করিতে পারি। কিন্তু ভারতের বহু জাতি শকসভ্যতা গ্রহণ করিয়াছিল, শুধু শকজাতি আপনাদের মধ্যেই ঐ সভ্যতা আবদ্ধ রাখেন নাই। তবে শকসভ্যতান্তর্ভুক্ত বঙ্গীয় বণিক্‌জাতি কোন্ জাতীয় লোক ছিলেন? তাঁহারা খোদ শকজাতীয় লোক কি শকেতর জাতীয় লোক ইহা এখন প্রশ্ন। রাজশ্রী ও লক্ষ্মীশ্রী দুই সহোদরা। রাজশ্রীর অধিকারিগণ শকজাতীয় ছিলেন, সুতরাং লক্ষ্মীশ্রীর অধিকারী বণিক্‌গণও শকজাতীয় ছিলেন; এরূপ সিদ্ধান্ত নিতান্ত অযৌক্তিক বা অসঙ্গত নহে। আর্য্য ও শকগণের সংঘর্ষে আর্য্যগণ প্রহৃত

হইলে অনেক বিজিত আৰ্য্য ব্যবসায়-বাণিজ্য বা কৃষিকার্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক জীবিকানির্ব্বাহ করিতে আরম্ভ করে, সুতরাং এরূপ প্রশ্নও উঠিতে পারে যে বঙ্গীয় বণিক্‌গণ আর্য্যজাতির লোক কিনা? কিন্তু যে আর্য্যগণ জীবিকানির্ব্বাহের জন্য ব্যবসায়-বাণিজ্য অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছিল, তাহাদের উদ্যম-উৎসাহ, তৎপরতা এত অধিক ছিল যে, তাহারা ভারতের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে আসিয়া ব্যবসায়-বাণিজ্যে লিপ্ত হইবে, সেরূপ ক্ষমতাই বোধ হয় তাহাদের তৎকালে ছিল না। এই শ্রেণীর আর্য্যগণ পঞ্জাব, দিল্লী, এলাহাবাদ অঞ্চলেই আবদ্ধ আছে এবং সাধারণতঃ তাহারা আপনাদিগকে "ক্ষত্রি" বলিয়া পরিচয় দেয় এবং রাজপুত হইতে আপনাদিগকে বিভিন্ন রাখিয়াছে।

দ্বিতীয় কথা, বণিক্-সম্প্রদায়ের বর্ত্তমান সামাজিকহীনতার কারণ কি?

ভারতের হিন্দুগণের জাতিভেদতথ্য-সম্বন্ধে ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের একমত আছে, এদেশীয় পণ্ডিতগণের মধ্যেও ক্রমে তাহাই বলবৎ হইতেছে। এই মত অনুসারে জাতিভেদের মূল কারণ ভারতীয় হিন্দু-সমাজের কার্য্য-বিভাগ। দীর্ঘকাল এক কার্য্য-বিভাগ বা Trade guildএ আবদ্ধ থাকিয়া ক্রমে এক বিভাগ অন্য বিভাগ হইতে পৃথক্ হইয়া ভিন্ন ভিন্ন জাতিরূপে পরিণত হইয়াছে। অর্থাৎ ইহাদের মতে ভারতীয় হিন্দুগণ কোন এক রমণীয় প্রভাতে গাত্রোত্থান করিয়া আপন আপন হাঁড়ি ভাগ করিয়া লইল। একে অন্যের হাঁড়ি স্পর্শ করিবে না, কেহ বড় কেহ ছোট, কেহ প্রভু কেহ ভৃত্য, কেহ প্রণম্য কেহ অস্পৃশ্য। কিন্তু ইহা মনুষ্য-চরিত্রের অনুযায়ী নহে। কেহ হঠাৎ বিনা বাক্যব্যয়ে অযথা অন্যের নিকট হেয়তা স্বীকার করে না। কেহ বিনা ক্ষমতায় অপরের উপর হঠাৎ প্রভুত্ব-স্থাপন করিতেও সমর্থ হয় না। বহুদিন কার্য্য বা ব্যবসায় হিসাবে বিভাগ থাকিলেই তাহা হইতে জাতিভেদের ন্যায় এক

কঠোর প্রভেদ হঠাৎ উত্থিত হইতে পারে না। পৃথিবীতে সর্ব্বজাতিরই কার্য্য-হিসাবে বিভাগ আছে, কিন্তু সর্ব্বত্রই ভারতের ন্যায় জাতিভেদ হয় নাই। মানুষের সামাজিক ব্যাপারই হউক বা অন্য কোন প্রকার পরিবর্ত্তন-বিভাগই হউক, তাহা কোন বিশেষ ক্ষমতার বিনা প্রভাবে ও বিশেষ আবশ্যকের বিনা হেতুতে হয় নাই বা হইতে পারে না। এখন সেই বিশেষ ক্ষমতা কি? তাহা সর্ব্বত্রই রাজক্ষমতা এবং সেই বিশেষ আবশ্যকতা—রাষ্ট্রীয় আবশ্যকতা। ভারতে বা বঙ্গে এই দুই বৃহৎ কারণ ব্যতীত জাতিভেদ কিংবা জাতিবিশেষের উচ্চতা বা হীনতা সংঘটিত হয় নাই। মূলকারণ সর্ব্বত্রই রাষ্ট্রীয় আবশ্যকতা এবং রাজকীয় ক্ষমতা। ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসায় অবলম্বনই ভারতীয় জাতিভেদের মূলকারণ নির্দ্দেশ করা নিতান্ত অদূরদর্শিতা। জল-প্লাবনের পর জোয়ারে নৌকা হইতে অবতরণ করিয়া হঠাৎ ভিন্ন ভিন্ন প্রাণী বিভিন্ন আহার নির্ব্বাচন করিয়াছিল বলিয়াই, অর্থাৎ সিংহ-ব্যাঘ্র মাংসাহার, গো, মহিষ, বানর ও ছাগাদি উদ্ভিজ্জাহার গ্রহণ করিয়াছিল বলিয়াই তাহারা সিংহ, ব্যাঘ্র, গো, মহিষ ইত্যাদি শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে বলাতে যে কথা, ভারতীয় জাতি বিভিন্ন ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছিল বলিয়াই তাহারা বিভিন্ন জাতিতে পরিণত হইয়াছে বলাতে একই কথা। উভয়ই প্রত্যক্ষের কারণ অনুসন্ধান-ব্যাপারে প্রত্যক্ষকেই নির্দ্দেশ করে মাত্র। প্রাণীতত্ত্বের অনুসন্ধান-ব্যাপারে পণ্ডিতগণ যেমন আত্মস্থাপন, দুর্ব্বলের উপর বলীয়ানের স্বাধিকার, আত্মরক্ষা, পারিপার্শ্বিক শক্তি ও প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন, প্রভৃতি মূলকারণ নির্দ্দেশ করেন, ভারতীয় জাতিভেদে রত মূলকারণ ঐ সমস্তই সন্দেহ নাই। আত্মস্থাপন ও আত্মরক্ষার চেষ্টাই ভারতীয় জাতি-ভেদকে নিয়মিত করিয়া আসিতেছে। মানব-সমাজে আত্মস্থাপনই বলবৎ হইয়া রাজশক্তি নাম ধারণ করিয়াছে এবং সেই রাজশক্তিই ভারতে বা বঙ্গে জাতিভেদের

বিধাতা। বলীয়ানের স্বাধিকারক্ষুব্ধ আত্মরক্ষার চেষ্টাই মানব-সমাজে ভীরুতা, কাপুরুষতা, স্থলবিশেষে চতুরতা নামে অভিহিত হইয়াছে। এবং সেই চেষ্টাতেই কালে একদিকে কোমল, সুখান্বেষী, প্রিয়দর্শন, চিত্র-বিচিত্র পরিচ্ছদধারী, প্রাণীজগতের শশক, মৃগ, মেষ প্রভৃতির কিংবা অন্যদিকে ধূর্ত্ত, প্রবঞ্চক, কপট, প্রাণীজগতের শৃগাল, বানর, কাক প্রভৃতির ন্যায় জাতির অভ্যুদয় হইয়াছে ও হইতেছে। আবার পারিপার্শ্বিক শক্তিদ্বারা অভিভূত হইয়া, অবস্থার নিষ্পেষণে নিষ্পেষিত হইয়া প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের ফলে, আপনার উদর-চিন্তার ভার অপরের উপর ন্যস্ত করিয়া প্রাণীজগতের বলীবর্দ্দ, গর্দ্দভ ও অশ্বাদির ন্যায় জাতিরও সৃষ্টি হইয়াছে ও হইতেছে, এইরূপ কাণ্ড যে শুধু ভারতেই সংঘটিত হইয়াছে, ইউরোপে হয় নাই, তাহা নহে। তবে পার্থক্য এই যে, ইউরোপে যখন দুই প্রতিদ্বন্দ্বী জাতির মধ্যে সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছে, তখন জেতা সাধ্যমত তরবারি বা গোলাগুলির সাহায্যে বিজেতাকে সমূলে উচ্ছেদ সাধন করিয়াছে, বিজেতার অবশিষ্টগুলি গা ঢাকা দিয়া জেতার দলভুক্ত হইয়া রক্ষা পাইয়াছে। কিন্তু ভারতে জেতা বিজেতাকে প্রহত করিবার পরে তাহাদিগের সমূলে বিনাশ-সাধনের জন্য তৎপর হয় নাই। আইন-আমলে তাহাদিগকে কিছু খর্ব্ব করিয়া নিজ আয়ত্তাধীন বৃহৎ গণ্ডীর অন্তর্গত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গণ্ডীতে তাহাদের স্থান নির্দ্দেশকরতঃ সাধ্যমত খাটো করিয়া রাখিবার চেষ্টা করিয়াছিল। বিজেতাগণ অবস্থানুসারে উপস্থিত বিপদে কতক অধিকার পরিত্যাগ করিয়া জেতা-প্রদত্ত অনুগ্রহ গ্রহণ করিয়া সন্তুষ্ট ছিল। তাই ভারতে মানবের পুরাতন জাতিগুলির বংশধর এখনও অনেক বিদ্যমান আছে, কিন্তু ইউরোপে পুরাতন অপটু অসমর্থ জাতিগুলি প্রায়ই লোপ পাইয়াছে। পটুতা এবং সামর্থ্য ভিন্ন ইউরোপে কেহই টিকিতে পারে নাই। সেইজন্য ইউরোপ পটুতার খনি, ভারত

আপোষের লীলাক্ষেত্র। এই বিভিন্নতার হেতু প্রাণীবিৎ পণ্ডিতেরা স্থির করিবেন, ঐতিহাসিকের কার্য্য নহে। বোধ হয়, আহারের পার্থক্য একটী বিশিষ্ট কারণ।

যতদিন হিন্দুসমাজে প্রবাহিনীর খরস্রোত চল্‌তি ছিল, হিন্দু-সমাজও ততদিন উঠ্‌তি-পড়্‌তির ক্ষেত্র ছিল। পদ্মার দুকূলের ন্যায় হিন্দু-সমাজ-ক্ষেত্র ভাঙ্গিত এবং গড়িত। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র কথাগুলি চারি-জাতির দৃঢ় সীমাবদ্ধ বিভাগ নহে, চারিটী নাম। আজ যে অজ্ঞাত পার্ব্বত্য-বর্ব্বর ছিল, কল্য সে শক্তি-সঞ্চয় করিয়া, রাজ্যস্থাপন করতঃ ক্ষত্রিয়। আজ যে রাজা, কাল সে রাজশ্রী-বিহীন হইয়া বাণিজ্য-অবলম্বনে বৈশ্য, কিংবা আজ যে বন-প্রান্তরবাসী পশুপালক ও কৃষক, কল্য সে অর্থ সঞ্চয় করিয়া বৈশ্য; আজ যে দেশ-নায়ক-দেশ-পালক-রাজসচিব, কল্য সে বিজেতার প্রকোপে পড়িয়া পুনঃপুনঃ বিধ্বস্ত হইয়া ক্রমশঃ স্থানচ্যুত হইয়া নিম্নগামী হইতে হইতে দোসাধ, শূদ্র! আজ যে আচার্য্য-পুরোহিত, কল্য সে বিরুদ্ধধর্ম্মাবলম্বী, নবোদ্ভূত রাজা ও প্রতিদ্বন্দ্বী পুরোহিতের প্রকোপে অস্পৃশ্য শূদ্রাদপি নিকৃষ্ট ডোম, মুচি; আজ যে পৌরোহিত্য-কার্য্যের সাহায্যকারী মাত্র কিংবা আজ যে চৈনিক বা তিব্বতীয় ব্রাহ্মণের বাড়ীতে এ্যাপ্রেণ্টিসি বা শিক্ষানবিশী করে, কল্য সে কিঞ্চিৎ শিক্ষার বলে সামান্য পারিপাট্য এবং নিষ্ঠা অবলম্বন করিয়া ব্রাহ্মণ, এবং তাহারই সন্তানগণ পরবর্ত্তী বংশে পরম ভট্টারক। যুগে যুগে রাজশ্রী পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে এইরূপ তোলপাড় পরিবর্ত্তন হইত। ইহা হিন্দু-সমাজের জীবন্ত মূর্ত্তি। কিন্তু সে স্রোতস্বিনী এখন প্রবাহহীনা; মরাগাঙ্গের বোদা জলের মতন হিন্দু-সমাজ এখন নিশ্চল। বর্ত্তমান হিন্দু-সমাজে যে শ্রেণীবিভাগ দেখিতেছি, তাহা অন্য কিছু নয়। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের বা বঙ্গের শেষ হিন্দু রাজা হিন্দুসমাজকে যেরূপ ভাবে নির্ম্মাণ করিয়া যে স্থানে যে অবস্থায়

রাখিয়া গিয়াছেন হিন্দু সমাজ ঠিক সেই খানেই দাঁড়াইয়া কাহার অপেক্ষা করিতেছে জানি না। আর আমরা হিন্দু মনে করিতেছি, হিন্দুসমাজের বর্ত্তমান শ্রেণীবিভাগ সনাতন অনাদি কাল হইতেই বিদ্যমান আছে—ইহা অবশ্যই বুদ্ধির ভ্রম। বুদ্ধি একটু পরিষ্কার হইলেই এই ভ্রম যাইবে সন্দেহ নাই, সেটা বড় চিন্তার কথা নয়। কিন্তু পুনরায় মরা-গাঙ্গে বেগ প্রদান করিবে যে, সে কোথায়?

উভয়ই বর্ব্বরের কর্ণে একই রূপ শুনাইত। সমুদ্রগমন জাতিহানির কারণস্বরূপে নির্দ্দিষ্ট হইল। ভারতের জলবাণিজ্য ক্রমে ধ্বংস প্রাপ্ত হইল, বণিক্‌গণ প্রহৃত হইলেন। ভারতময় বণিক্‌সমাজের এই দুর্দ্দশা হইল। কিন্তু বঙ্গের বণিকের দুর্দ্দশার তুলনা ভারতের অন্যত্র খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ভারতের কোথায়ও বণিক্ অনাচরণীয় নহে, কিন্তু বঙ্গে বণিক্‌জাতি অনাচরণীয় জাতি। তাহার বিশেষ কারণও আছে। অন্যান্য প্রদেশে কেবল রাজক্ষমতাই বণিক্‌কে খর্ব্ব করিতে চেষ্টা করিত। কিন্তু বঙ্গে, পূর্ব্বেই দেখাইয়াছে বণিক্‌গণ দেশের দেব-দেবী আপামর সাধারণের আক্রোশভাজন হইয়াছিল। এই দুই কারণ একত্র হইলে, State এবং Church এই উভয়ের নিষ্পেষণে চূর্ণীকৃত ধূলির ন্যায় বঙ্গের বণিক্‌গণ সমাজে এখন হীনতাপ্রাপ্ত হইবেন, তাহাতে আশ্চর্য্য কি? বঙ্গ ভিন্ন ভারতের অন্য কোথায়ও এমন মণিকাঞ্চনের সংযোগ হয় নাই। তাই বঙ্গের বণিক্‌জাতি একেবারে অনাচরণীয় শুঁড়ি জাতিতে পরিণত হইয়াছেন। কোথায় মা মনসা, কোথায় মা চণ্ডী, কোথায় শনিঠাকুর তোমরা কি শেষে অন্ধ হইয়াছিলে? ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর কয়েকবার জাহাজ ডুবি করিয়া ইংরেজ বণিক্‌গণকে একেবারে শুঁড়ি জাতিতে পরিণত করিতে পারিলে সকল গোল চুকিয়া যাইত। ইহা নিতান্ত কৌতুকের কথা নহে, প্রকৃত পক্ষেই ইংরেজ এদেশে উচ্চতর ধর্ম্ম ও উচ্চতর সভ্যতা-

সহ প্রবেশ না করিলে তাঁহাদের অদৃষ্টে কোন অদৃশ্য পথ অনুসরণ করিতে হইত বলা যায় না। আণ্টুনি "ফিরিঙ্গী" "মাতঙ্গীর" ভজনা আরম্ভ করিয়াছিল। জনের (John) বৃষরাশি, ভাগ্যের জোর আছে তাই রক্ষা পাইয়াছে।

যদিও পুরাতন ভারতীয় বণিক্‌গণের জল-বাণিজ্যের কথা দেশী বিদেশী ইতিহাসে প্রসিদ্ধ, তথাপি বর্ত্তমান কালে তাহার চিহ্নমাত্র নাই। ভারতের জলবাণিজ্য একেবারে লুপ্ত হইয়াছে। এই দুর্ভাগ্যের জন্য আজ কাল বিদেশীয় বণিক্‌গণকেই সর্ব্বতোভাবে আমরা দায়ী করি। কিন্তু নিজের কপালে নিজে অগ্নি সংযোগ না করিলে, পরে মানবাদৃষ্টের ন্যায় প্রশস্ত উচ্চ ভূমির সকল থানির দগ্ধ সাধন করিতে পারে না। বণিক্‌সম্প্রদায়ের সহিত রাজসম্প্রদায়ের বিরোধ স্বাভাবিক; এক ক্ষমতা অন্য ক্ষমতাকে সহজে প্রতিষ্ঠাবান্ হইতে দেয় নাই। বর্ব্বর অপরিণামদর্শী রাজশাসনে কালে এই বিরোধ অবশ্যম্ভাবী। সভ্য, দূরদর্শী রাজশাসন সময়ে বণিক্ সম্প্রদায়ের সহিত রাজসম্প্রদায়ের অসদ্ভাব দূর হইয়া ক্রমশঃ সদ্ভাব স্থাপন হইয়া আসে এবং তাহা অতি মঙ্গলপ্রদ হয়। অসভ্য বর্ব্বর রাজশাসনকালে এই অসদ্ভাব যেমন দৃঢ় থাকে তাহা তেমনি অমঙ্গলপ্রদ হয়। এই বিরোধের মীমাংসা না হইলে ক্রমে দেশের সর্ব্বনাশ হয়।

শুধু বঙ্গে নহে, ভারতের সর্ব্বত্রই বৌদ্ধযুগের পরে এক শ্রেণীর বর্ব্বর হিন্দুরাজগণের অভ্যুদয় হইয়াছিল; তৎপূর্ব্বে বণিক্‌শক্তির প্রভাবও অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়াছিল এই শ্রেণীর হিন্দুরাজগণের সময় হইতে সর্ব্বত্রই বণিক্‌শক্তির সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়। রাজগণের স্বাভাবিক আশঙ্কা হইত বণিকের অর্থবল কালে রাজক্ষমতাকে হ্রাস বা গ্রাস করিতে পারে। সহজে সৈন্যবল সংগ্রহ করা যায় এমন দিনে, Cheap militarismএর কালে, বণিকের এই আচরণ নিতান্ত অসম্ভব কাণ্ডও নহে। রাজগণ সর্ব্বদাই

মনে করিতেন, কথন বা "বণিকের মানদণ্ড দেখা দিবে রাজদণ্ডরূপে।" বিশেষতঃ বাণিজ্যকুশল বঙ্গে এই বিরোধ বা সংঘর্ষ অবশ্যম্ভাবী। মুসলমান যুগেও ইহার দৃষ্টান্ত আমরা দেখিয়াছি। যে রাজক্ষমতা হিন্দু বণিক্দিগকে খর্ব্ব করিতে সমর্থ হইয়াছিল, মুসলমানযুগে সেই রাজশক্তি বণিকশক্তির নিকট পরাভূত হইয়াছে, ইহা বিধাতার বিচার এবং আমি বিশ্বাস করি, আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণকর্ত্তৃক বণিকের প্রতি আচরণের যথেষ্ট উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত না করা পর্য্যন্ত আমাদের বিধাতা আমাদের প্রতি সম্পূর্ণ প্রসন্ন হইবেন না।

শুধু ভারতে নহে পৃথিবীর সর্ব্বত্রই ইউরোপাদি অঞ্চলেও রাজশক্তি ও বণিক্শক্তির এই সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল। যখন ইউরোপের অন্যান্য দেশে এইরূপ সংঘর্ষ চলিতেছিল অর্থাৎ খৃঃ ষোড়শ শতাব্দীতে ইংলণ্ডের রাজশক্তি অবস্থার পরিবর্ত্তনে বণিক্শক্তির আনুকূল্য করিতে বাধ্য হয় এবং তাহার পুণ্যফলে ইউরোপের সমুদয় দেশকে ডিঙ্গাইয়া ইংলণ্ড অতি অল্পকাল মধ্যেই ধনে, মানে, জ্ঞানে, গৌরবে সর্ব্বোচ্চ আসন অধিকার করিয়াছিল এবং এই ইংলণ্ডই প্রথম মানবজাতিকে শিক্ষা দিয়াছে রাজশক্তি বণিক্শক্তির আনুকূল্য করিলে দেশের ধনসম্পদ্, সুখসমৃদ্ধি কত দূর বৃদ্ধি হয়। তৎপূর্ব্বে সকল দেশেরই রাজশক্তি শুধু অভিজাতশক্তির আনুকূল্য করিয়াই নিরাপদ সমশক্তি এবং বণিক্শক্তির সহিত প্রতিকূলতা করিত। কিন্তু এই ভ্রম ইদানীং পৃথিবীর সকল দেশ হইতে দূর হইয়াছে, যে দেশের হয় নাই তাহারা মাটিতে গড়াগড়ি যাইতেছে। সুতরাং বণিক্গণকে খর্ব্ব করিয়া রাখা রাজকীয় আবশ্যক ছিল। ব্রাহ্মণগণও রাজগণের ইঙ্গিতে লেখনী চালনা করিতে সর্ব্বদাই নিযুক্ত ছিলেন। ব্রাহ্মণের লেখনী এই যুগের মুদ্রাযন্ত্র, সুতরাং ব্রাহ্মণের কৃতিত্ব বা দায়িত্বের মাত্রা অধিক নহে। কিন্তু এই বর্ব্বর যুগেই সংস্কৃত অক্ষরের স্পর্শমণির

ক্ষমতা জন্মে ; সংস্কৃতে যাহাই লিখিত হইত, দেশময় অশিক্ষিত অসভ্যগণের নিকট তাহার সহিত বেদমন্ত্রের কোন পার্থক্য থাকিত না।

আমার শেষ কথা, বন্ধুগণ, যখনই কোন জাতির সৌভাগ্যের দ্বার উদ্ঘাটিত হয়, ঠিক সেই সময়েই জ্ঞান, ধর্ম্ম, ধন, বিজ্ঞান, গৌরব, মোক্ষ তাহাদের নিকট যুগপৎ উপস্থিত হয় না। সর্ব্বপ্রথমে তাহারা তাহাদের জাতীয় ইতিহাসের প্রকৃত সত্য বুঝিবার চেষ্টা করে ; মোহ, ভ্রান্তি, ভুল, মিথ্যার আচরণ ছিন্ন করিয়া ফেলে ; জাতীয় শক্তির উৎস কোথায় লুক্কায়িত আছে, অনুসন্ধান করিয়া বাহির করে এবং সেই উৎসের উপরি-চাপা প্রস্তরের ভার টানিয়া দূরে নিক্ষেপ করি ; নিজেদের মধ্যে নূতন সঞ্জীবনী শক্তি আনয়ন করে। কিন্তু তাহার সাহায্যে এই অপরূপ কাণ্ড সংঘটিত হয়। রাজশক্তি, আইনকানুনের শক্তি, গোলাগুলি, অসি তরবারির শক্তি এক্ষেত্রে নিতান্তই অনাবশ্যক। ভারতমাতার এক একটী অক্ষরের এক্ষেত্রে যে শক্তি আছে, পৃথিবীর সমুদয় রাজশক্তি একত্র হইলেও তাহার সমকক্ষ নয়। সাহিত্যচর্চ্চাই মৃত জাতির মধ্যে সঞ্জীবনীশক্তি আনয়নের প্রথম ও প্রকৃষ্ট পন্থা। সত্যানুসন্ধান ও সত্যস্থাপনই সাহিত্যচর্চ্চার প্রথম লক্ষ্য। এজন্য আমাদের বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতি সকলেরই নমস্য সন্দেহ নাই। এইরূপ অনুসন্ধানের ফলে ভ্রান্তিময় ঐতিহাসিক প্রহেলিকা দূর হইবে, দেশের সত্য মিথ্যার বিশাল কপটরচনাকে চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া মস্তকোত্তোলন করিবে। এই উপায়েই পৃথিবীর বহু জাতি উত্থিত হইয়াছে। উদাহরণস্থলে ইংরেজী সাহিত্যের ইতিহাস-লেখক ফরাসী Taineএর প্রথম বাক্য উদ্ধার করিতেছি—

History has been revolutionised, within a hundred years in Germany, within sixty years in France, and that by the study of their literatures.

It was perceived that a work of literature is not

a mere play of a imagination, a solitary caprice of a heated brain, but a transcript of contemporary manners, a type of a certain kind of mind. It was concluded that one might retrace, from the monuments of literature the style of man's feelings and thoughts for centuries back. The attempt was made and it succeded.

আমার সর্ব্বশেষ নিবেদন, বন্ধুগণ বঙ্গীয় সাহিত্য-আলোচনা করিতে গেলে বঙ্গীয়সমাজ, রাঢ়ীয় ভিন্ন ভিন্ন জাতির তথ্য ও ইতিহাসের আলোচনা অপরিহার্য্য। একের সহিত অপরটী এরূপভাবে সম্বদ্ধ যে, একটীকে ছাড়িয়া অপরটীর আলোচনা অসম্ভব। কিন্তু তাহাতে একটু বিপদ্ আছে, কেন না বঙ্গীয় সমাজ এবং বঙ্গীয় বিভিন্ন জাতি এখনও ইহাদের দেহে প্রাণ আছে, বর্ত্তমানে সেগুলি এখনও অতীতের কুক্ষিগত হয় নাই।

আপনি কিম্বা আপনারা কোন না কোন জাতির অন্তর্ভুক্ত। আপনার আমার জাত্যভিমান থাকিতে পারে এবং তাহা অস্বাভাবিক নহে। জাত্যভিমানের কোমল তন্ত্রী কোন বেদনা সহ্য করিতে পারে না তাহাও জানি। কিন্তু হে সাহিত্যিক, তোমাদের একটু উচ্চে উঠিতে হইবে, নতুবা তোমার সকল চেষ্টা বৃথা। তোমাকে নিরপেক্ষ বিচারকের উচ্চাসন গ্রহণ করিতে হইবে। ইহা কিছু দুরূহ, কিন্তু তাহা ক্রমে ক্রমে অভ্যাস করিতেই হইবে। 'ভূতার্থ কথনে'—ঐতিহাসিক তথ্য-উদ্ঘাটন ব্যাপারে, তোমাকে 'রাগদ্বেষ'-বিবর্জ্জিত হইতেই হইবে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, অনেকে এখনো সেরূপ নহেন। বর্ত্তমান বঙ্গীয় ঐতিহাসিক জগতের এই অবস্থা দেখিয়া বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির কর্ণধার শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় দুঃখভারাক্রান্ত হৃদয়ে লিখিয়াছেন—

"ইতিহাসের উপাদান সঙ্কলিত না হইলে, ইতিহাস সঙ্কলিত হইতে

পারে না,—তাহা বহু ব্যয়সাধ্য, বহু শ্রমসাধ্য, বহু লোকসাধ্য ;—এ সকল কথা বঙ্গসাহিত্যে পুনঃপুনঃ উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু ইহাকেই একমাত্র অন্তরায় বলিয়া নিশ্চিন্ত হইবার উপায় নাই। কিরূপ বিচার-পদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ করা কর্ত্তব্য, তদ্বিষয়েও সংকীর্ণতার অভাব নাই। ন্যায়নিষ্ঠ বিচারপতির ন্যায় নিয়ত সত্যোদ্ঘাটনের চেষ্টাই যে ইতিহাস-লেখকের প্রধান চেষ্টা, তাহা ভাল করিয়া আমাদের হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। কবি কহ্লণ "রাজতরঙ্গিণীর" উপোদ্ঘাতে লিখিয়া গিয়াছেন—

শ্লাঘ্যং স এব গুণবান্ রাগদ্বেষবহিষ্কৃতা।
ভূতার্থ-কথনে যস্য স্থেয়স্যেব সরস্বতী॥

আমাদের সাহিত্যে এই উপদেশবাক্য এখনও সম্যক্ মর্য্যাদালাভ করিতে পারে নাই। এখনও আমাদিগের ব্যক্তিগত, জাতিগত বা সম্প্রদায়গত অনুরাগ-বিরাগ, আমাদিগকে পূর্ব্ব হইতেই অনেক ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তের অনুকূল বা প্রতিকূল করিয়া রাখিয়াছে।"

বন্ধুগণ আমিও একবার আপনাদিগকে সানুনয়ে অনুরোধ করিতেছি, যাহার যে কোন অনুরাগ-বিরাগ থাকে সত্যদেবের চরণে নিবেদন করিয়া সাহিত্যিকের উচ্চ বেদিতে অধিষ্ঠিত হউন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি—সাহিত্য-চর্চ্চা ভিন্ন দেশের গতি নাই, আপনাদিগের ভিন্ন দেশের অন্যের কাহারও প্রতি তাকাইবার আর নাই। নিজের দায়িত্ব পদ-মর্য্যাদা গৌরব বুঝিয়া প্রকৃত সাহিত্যিক হউন।

এই ক্ষুদ্র ভূতার্থ কথনে যদি কাহারও কোন কোমল তন্ত্রীতে আঘাত করিয়া থাকি, সত্যদেবের মহিমায় আমাকে ক্ষমা করুন। রাগ-দ্বেষ-বিবর্জ্জিত হইয়া আমার বক্তব্য বলিয়াছি, বিশ্বাস করিয়া আমার অপরাধ মার্জ্জনা করুন।

শ্রীযোগেশচন্দ্র দত্ত

তিনখানি পত্র

মুরাদের প্রতি অউরঙ্গজেব

ইতিহাসজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই বিদিত আছেন যে, সম্রাট্ সাজাহানের চারি পুত্রের মধ্যে দারাসেকো সর্ব্বজ্যেষ্ঠ, শুজা মধ্যম, অউরঙ্গজেব তৃতীয়, এবং মুরাদবক্স সর্ব্বকনিষ্ঠ ছিলেন। ইঁহারা সকলেই সাজাহানের এক মহিষীর সন্তান। আগ্রার তাজ যাঁহার নাম চিরজীবিত করিয়া রাখিয়াছে, ইঁহারা সকলেই তাঁহার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন ও তাঁহারই অঙ্কে বর্দ্ধিত হন। ভারতের মোগলরাজবংশে কি অভিসম্পাৎ ছিল পিতৃভক্তি, অপত্য-স্নেহ, এবং সৌভ্রাত্রের দৃষ্টান্ত ইহাতে বিরল। জাহাঙ্গীর, সাজাহান, এবং অউরঙ্গজেব—তিনজনেই পিতৃদ্রোহী ছিলেন; জাহাঙ্গীর আপন পুত্র খসরুকে ক্রমাগত নির্য্যাতন করিয়া এবং কারারুদ্ধ রাখিয়া হত্যাই করেন বলিতে হয়, এবং অউরঙ্গজেব তাঁহার পুত্রগণকে এত অবিশ্বাস করিতেন যে, বৃদ্ধাবস্থায় অন্তিম ব্যাধির কালেও তিনি তাহাদের কাহাকে আপনার শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত থাকিতে দেন নাই। শূরবংশীয় শেরসাহকর্ত্তৃক নানা যুদ্ধে পরাজিত হইয়া হুমায়ুন যখন বিশ্ব অন্ধকার দেখিতেছিলেন, তাঁহার ভ্রাতৃগণ তখন তাঁহাকে সাহায্য করা দূরে থাকুক, তাঁহার ঘোর বিপক্ষতা-চরণই করিয়াছিলেন। কথিত আছে যে, রাজ্য হারাইয়া পারস্যাভিমুখে পলায়নকালে কান্দাহারে তাঁহার শিশুপুত্র আকবর পিতৃব্য মির্জা অস্কেরির হস্তে পতিত হন। পিতৃব্য তাঁহাকে কামানের মুখে স্থাপিত করিয়া হুমায়ুনকে ভীত করিয়া কান্দাহার পরিত্যাগ করিতে বাধ্য করেন। জাহাঙ্গীরের পুত্রগণ ভ্রাতৃ-বিদ্বেষ-বিষে জর্জ্জরিত হইতেন। যুবরাজ

পরভেজ কনিষ্ঠ ভ্রাতা খরমকে আগ্রা হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণাভিমুখে সমস্ত দাক্ষিণাত্যে এবং পূর্ব্বাভিমুখে কলিঙ্গ, বঙ্গ ও বেহারে ক্ষুধার্ত্ত শার্দ্দূলবৎ তাড়না করিয়াছিলেন; এবং অউরঙ্গজেব ভ্রাতা এবং ভ্রাতুস্পুত্রের রক্তে পদপ্রক্ষালন করিয়া ময়ূরাসনে আরোহণ করেন। সর্ব্বত্রই যদি বংশানুক্রমে চরিত্রগঠন হইত, তবে আমি ভাবি যে, যে বাবর পুত্র হুমায়ূনের জীবনরক্ষার্থ তাঁহার রোগশয্যাপার্শ্বে আপন জীবন-বিনিময় করিয়াছিলেন, তাঁহার বংশধরগণের মধ্যে কেহ কেহ পুত্রদ্বেষী হইলেন কেন? এবং যে হুমায়ূন ভ্রাতৃবাৎসল্যবশতঃ পিতার সাম্রাজ্য অম্লানবদনে বিভক্ত করিয়াছিলেন তাঁহার উত্তরপুরুষগণ মধ্যে ভ্রাতৃ-শোণিত-পিপাসা এত প্রবল হইল কেন?

সে যাই হউক, আমি এই প্রবন্ধে অউরঙ্গজেব-মুরাদের জীবন-কাহিনীর একটি স্মরণীয় পরিচ্ছেদ লিপিবদ্ধ করিব। প্রিয়তমা মহিষী মমতাজমহলের অকালমৃত্যুর পর হইতেই শোকে প্রৌঢ় সম্রাট্ সাজাহানের স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছিল; তথাপি তিনি অসাধারণ মানসিক তেজে দৈহিক দৌর্ব্বল্য উপেক্ষা করিয়া যথোচিত বিধানে রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতেছিলেন। ক্রমে তাঁহার জীবনের ষষ্টিতমবর্ষ অতিক্রান্ত হইল; পরবর্ত্তী কয়েক বৎসরে তিনি আরও শোক পাইলেন; প্রিয়তম বন্ধু, ধীমান্ মন্ত্রী, ও চিরসহায় কুশল সেনানায়ক জাফরজঙ্গ, শাদুল্লা খাঁ এবং আলীমর্দ্দান তাঁহাকে ক্রমে ক্রমে পরিত্যাগ করিয়া অনন্তধামে প্রস্থান করিলেন। তখন সাজাহান বার্দ্ধক্যের করাল অঙ্গুলিস্পর্শ অনুভব করিতে লাগিলেন। তিনি ইতিপূর্ব্বেই জ্যেষ্ঠপুত্র দারাকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করিয়াছিলেন এবং অন্য তিন পুত্রকে রাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশত্রয়ে শাসনকর্ত্তৃত্বে নিয়োজিত করিয়া তাঁহাকে নিজের পার্শ্বে রাখিয়াছিলেন। যখন খৃষ্টীয় ১৬৫৭ অব্দে তিনি পুনরায় পীড়িত হইয়া পড়িলেন, তখন তিনি আপন মন্ত্রিসভার

সদস্যগণকে আহ্বান করিয়া তাঁহাদের সমক্ষে দারাকে উত্তরাধিকারিত্বে বরণ করিলেন। দারা পিতৃবৎসল এবং প্রপিতামহ আকবরের ন্যায় ধর্ম্মতত্ত্বপিপাসু ও উদারচিত্ত ছিলেন। আরব্য, পারস্য, এবং সংস্কৃত ভাষায় তাঁহার পাণ্ডিত্য ছিল; এবং ধর্ম্মবিষয়ে কয়েকখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। একে তিনি পিতার জ্যেষ্ঠপুত্র, তাহাতে বহুগুণালঙ্কৃত; তাঁহার সিংহাসনলাভে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতৃগণের ক্ষোভের কোনই কারণ ছিল না। তথাপি মোগলকুলাধিষ্ঠাত্রীর অভিসম্পাৎবশতঃ তাঁহারা জ্যেষ্ঠের প্রাপ্য রাজদণ্ড সমস্ত অধিকার করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। তখনও দারা রাজদণ্ড গ্রহণ করেন নাই, কেন না সাজাহান তখনো জীবিত। বাল্যকাল হইতেই অউরঙ্গজেব ও মুরাদ দারার ভয়ঙ্কর বিরোধী ছিলেন; ইঁহারা তাঁহাকে প্রাণের সহিত ঘৃণা করিতেন এবং সর্ব্বপ্রযত্নে তাঁহার অনিষ্ট-সাধনের চেষ্টা করিতেন। সুজা দারার তত আততায়ী ছিলেন না, তথাপি রাজ্য-লোভে তিনিও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

অউরঙ্গজেবের দারার প্রতি বিদ্বেষ বোধগম্য। তিনি নিজে সঙ্কীর্ণ-হৃদয় ধর্ম্মোন্মাদ মুসলমান ছিলেন। ধর্ম্মবিষয়ে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার উদারতাকে তিনি অবর্ণনীয় ঘৃণার চক্ষে দর্শন করিতেন। কিন্তু মুরাদের ভ্রাতৃবিদ্বেষের মূলে কেবল তাঁহার বিস্ময়কর আত্মম্ভরিতা ও অউরঙ্গজেবের প্ররোচনা। বহুদিন পূর্ব্ব হইতেই অউরঙ্গজেব, মুরাদ, ও সুজা ষড়যন্ত্র করিতেছিলেন এবং পরস্পরের মধ্যে পরস্পরের অভিপ্রায়-জ্ঞাপক সাঙ্কেতিক লিপি পরিচালনের জন্য আপন আপন অধিকারে দলে দলে লিপি-বাহক নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তখন অউরঙ্গজেব দাক্ষিণাত্যে বর্হানপুরে, মুরাদ গুজরাটে এবং সুজা বাঙ্গালায়। গুজরাট ও বর্হানপুরের মধ্যে লিপিবাহকগণের গমনাগমন যেমন সহজসাধ্য ছিল, সেকালে এই দুইস্থান এবং বঙ্গদেশের

মধ্যে সেরূপ ছিল না। সেইজন্য অউরঙ্গজেব ও মুরাদের মধ্যে মন্ত্রণাই প্রথমে পরিপক্ক হইল; তখন তাঁহারা নিষ্প্রয়োজনবোধে সুজার সহায়তা-প্রাপ্তির চেষ্টা পরিত্যাগ করিলেন। সাজাহান অত্যন্ত পীড়িত হইয়া পড়িয়াছিলেন; সে কথা বিদ্যুদ্বেগে দেশময় রাষ্ট্র হইয়া পড়িয়াছিল। তিনি নীরোগ হইলেন; দারা সে সংবাদও রাজ্যের সর্ব্বত্র প্রেরণ করিলেন; সাজাহানের নাম ও মোহর অঙ্কিত আদেশোপদেশ লিপি-সকলও সর্ব্বত্র প্রেরিত হইল; তথাপি মুরাদ ও অউরঙ্গজেব আপনাদের অসদভিপ্রায়ের প্রতিকূল সে সংবাদ ইচ্ছা করিয়াও বিশ্বাস করিলেন না এবং আপনাদের অনুচর ও সহচরগণকেও বিশ্বাস করিতে দিলেন না। তাঁহারা সর্ব্বপ্রযত্নে প্রচার করিতে লাগিলেন যে, পিতার মৃত্যু হইয়াছে, কাফের দারা সিংহাসন অধিকার করিয়াছে। যে পর্য্যন্ত সে সিংহাসনে সুদৃঢ় হইয়া উপবেশন করিতে না পারিবে সে পর্য্যন্ত মৃত্যু-সংবাদ গোপন রাখিয়া আরোগ্যের মিথ্যা সংবাদে সকলকে ভুলাইতেছে।

সাজাহানের চারি পুত্র মধ্যে সর্ব্বকনিষ্ঠ মুরাদ সর্ব্বাপেকা অবিমৃষ্য-কারী ও নির্ব্বোধ ছিলেন। তিনি রাজ্যশাসন কার্য্যেও পারদর্শী ছিলেন না, এবং সর্ব্বদা বিলাস-স্রোতে ভাসমান থাকিতেন। যে যত অকর্ম্মণ্য হয়, গর্ব্বও তাহার তত অধিকমাত্রায় হইয়া থাকে। মুরাদেরও তাহাই হইয়াছিল। যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁহার সাহস না ছিল তাহা নহে, বরং অসংসাহসই ছিল; কিন্তু সমর-পরিচালনার কূটরীতি ও কৌশল তাঁহার পরিজ্ঞাত ছিল না। তাঁহার নির্ব্বুদ্ধিতার প্রকৃষ্ট পরিচয় এই যে, অউরঙ্গজেবের সহিত মন্ত্রণা সমাপন ও তাঁহার সহিত মিলিত হইবার পূর্ব্বেই অধীশ্বর হইয়া তিনি স্বশাসনাধিকৃত গুজরাটের রাজধানী অহম্মদাবাদে মরুয়াজুদ্দিন নামধারণপূর্ব্বক রাজমুকুট পরিধান করিয়াছিলেন।

মুরাদ যেমন স্বল্পধী, বিলাসী, অলস ও আত্মম্ভরী ছিলেন, অউরঙ্গজেব

তেমনি সূচ্যগ্রতীক্ষ্ণবুদ্ধিশালী, ভোগাকাঙ্ক্ষা বিরহিত, কূটনীতিপরায়ণ, অক্লান্তকর্ম্মা এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন। যদিও কনিষ্ঠভ্রাতা মুরাদের প্রতি মন্ত্রণারম্ভ কাল হইতেই অউরঙ্গজেব অত্যন্ত স্নেহের ভাণ করিয়া আসিতে-ছিলেন, তথাপি অল্পবুদ্ধিসত্ত্বেও মুরাদ এ কথা বুঝিয়াছিলেন যে, তিনি নিঃস্বার্থভাবে সমগ্র সাম্রাজ্যের সিংহাসনপ্রাপ্তি বা সাম্রাজ্যের অংশ-বিশেষ লাভ বিষয়ে তাঁহার সহায়তা করিবেন না। সেইজন্য তিনি ভ্রাতাকে বারম্বার অনুরোধ করিয়াছিলেন যে, উভয়ের মধ্যে একটি সর্ত্তপত্র লিখিত হউক, তাহাদ্বারা উভয়ে পরিষ্কার বুঝিতে পারিবেন কাহার কি উদ্দেশ্য, কাহার কত আশা, এবং আগামী মহাতাণ্ডবে কে কি তালে নৃত্য করিবেন। কোন কোন ইংরেজ-ঐতিহাসিক লিখিয়াছেন যে, অউরঙ্গজেব প্রথম হইতেই মুরাদকে বলিতেছিলেন যে, তিনি সংসার-বিতৃষ্ণ ; সমগ্র সাম্রাজ্যে বা উহার খণ্ডবিশেষে তাঁহার কোনই আকাঙ্ক্ষা নাই ; তদপেক্ষা পবিত্র ভূমি মক্কার কোন অজ্ঞাত কোণে ফকীর বেশে দিনযাপন করার লোভ তাঁহার সমধিক। তিনি অপধর্ম্মী, পৌত্তলিক দারাকে বিতাড়িত করিয়া হিন্দুস্থানে ধর্ম্মরাজ্য পুনঃসংস্থাপন করায় একমাত্র উদ্দেশ্যেই স্বধর্ম্মপরায়ণ, পরমস্নেহভাজন মুরাদের সহিত মিলিত হইতেছেন। কিন্তু আমি যে প্রামাণ্য গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া এই যৎসামান্য প্রবন্ধ রচনা করিতেছি, তাহাতে দেখিতে পাই যে, অউরঙ্গজেবের দারাকে অপসৃত করিয়া মুসলমানধর্ম্মের গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখার বাসনার ভাণ করা সত্য ; কিন্তু তাঁহার ফকিরি গ্রহণ করিয়া মক্কার কারবোলার কোন নিভৃত কোণে জীবন অতিবাহিত করার অভিপ্রায় প্রকাশ করা সত্য নহে। তিনি একখানি দীর্ঘপত্রে মুরাদের নিকট আপনার অভিপ্রায় স্পষ্টতঃ প্রকাশ করার ভাণ করিয়াছিলেন। ঐ পত্র মুরাদের সহিত মিলিত হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে খৃষ্টীয় ১৬৫৮ অব্দের প্রথম ভাগে লিখিত

হইয়াছিল। আমি উহার অনুবাদ দিতেছি। কপটতার লীলা এই পত্রে যতদূর বিস্তৃত হইয়াছে এবং ভগবানের ও কোরাণের পবিত্র নামের সহিত মিথ্যা ও ছলনার বাক্য ইহাতে যেরূপ সংযুক্ত হইয়াছে, সেরূপ আর কোথায়ও হইয়াছে বলিয়া আমি জানি না। স্পেনের রাজা দ্বিতীয় ফিলিপসম্বন্ধে এরূপ একটি কথা প্রচলিত ছিল যে, তিনি এরূপ খলপ্রকৃতি ছিলেন যে, স্বয়ং খৃষ্টও যদি কার্য্যব্যপদেশে তাঁহার নিকটে আসিতেন তবে তিনি তাঁহাকেও বঞ্চনা না করিয়া ছাড়িতেন না। অউরঙ্গজেব সম্বন্ধেও অনুরূপ অভিমত প্রকাশ করা যাইতে পারে। এই প্রবন্ধের বিষয়ীভূত তাঁহার পত্রখানি এই :—

প্রাণাধিক প্রিয়-কনিষ্ঠ সহোদর যুবরাজ মুরাদবক্স,

দেখিতেছি যে পিতৃ-পরিত্যক্ত সাম্রাজ্যলাভের অভিপ্রায় বিশদরূপে প্রকটিত হইয়াছে এবং পয়গম্বরের পতাকাসমূহ লক্ষ্যাভিমুখে প্রসারিত হইয়াছে। এ ধর্ম্মযুদ্ধ জেহাদের বজ্রনির্ঘোষ দিগন্তে প্রতিধ্বনিত হউক। আমার অন্তর্নিহিত ঐকান্তিক বাসনা এই যে, ইস্‌লামের প্রিয় বসতি ভূমি এই মোগল-সাম্রাজ্য হইতে অপধর্ম্ম ও পৌত্তলিকতার কণ্টক-তরু সমূলে উৎপাটন করিয়া ফেলি এবং এই অপধর্ম্ম ও পৌত্তলিকতার প্রধান পুরোহিত অবাচ্যনামা শয়তানের ধ্বংস-সাধন করিয়া সত্য-ধর্ম্মের মহিমা পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করি। অধর্ম্ম ও অপধর্ম্মের ধূলি তাহা হইলে আর জনগণের মনকে কলুষিত করিবে না, সাধু ফকিরগণের মুক্তাত্মা তাহা হইলে আর কাতরে বিলাপধ্বনি করিবে না, ইরাণ, তুরাণ, রুম ইত্যাদি জনপদবাসিগণ তাহা হইলে আর আমাদিগকে ঘৃণার চক্ষে অবলোকন করিবে না, হিন্দুস্থান শস্য ও সমৃদ্ধিপূর্ণ হইবে, প্রজাগণ রোগ-শোকের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিবে এবং স্বচ্ছন্দে সুখশান্তি উপভোগ করিবে।

তুমি আমার প্রাণপ্রিয় ভ্রাতা; তুমি এই পবিত্র মহদভিযানে আমার সহিত সম্মিলিত হইয়াছ এবং খোদাতাল্লার নামগ্রহণ ও কোরাণ স্পর্শ করিয়া বহু শপথপূর্ব্বক স্বীকৃত হইয়াছ যে বর্ত্তমানে ও ভবিষ্যতে, যুদ্ধক্ষেত্রে ও রাজপ্রাসাদে, দুর্ভাগ্য ও সৌভাগ্যে, সর্ব্বত্র ও সর্ব্বাবস্থায় তুমি আমার সহায় থাকিবে; এবং সনাতন ধর্ম্মের ও এই ধর্ম্মরাজ্যের পরম শত্রু নিপাত হইলেও তুমি চিরদিন আমার বন্ধু এবং আমার বন্ধুগণের বন্ধু এবং আমার শত্রুগণের শত্রু হইয়া আমার আনন্দবিধান করিবে; এবং তুমি তোমার স্বাধীন ইচ্ছায় নিজের ভোগের জন্য সাম্রাজ্যের যে যে অংশপ্রাপ্তি ও অধিকারের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছ তাহার অধিক আকাঙ্ক্ষা করিবে না ও লাভের চেষ্টা করিবে না। তোমার সরল হৃদয়ের অভিব্যক্তি আমাকে অত্যন্ত তুষ্ট করিয়াছে; তোমার আকাঙ্ক্ষা অতি ন্যায্য। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, তুমি ও আমি চিরদিন একচিত্ত থাকিব, একই অভিপ্রায় সাধনের জন্য আমাদের মিলিত শক্তি প্রযুক্ত হইবে; এবং তুমি কখনো তোমার কোন কার্য্যদ্বারা আমার অভিপ্রায় সাধনের প্রতিকূল হইবে না। আমাদের উভয়ের মঙ্গলপথ এক। আমি জানি তুমি সত্যপ্রতিজ্ঞ; তুমি এ পথ হইতে কখনো বিচলিত হইবে না। তোমার প্রতি আমার স্নেহ ও অনুগ্রহ ক্রমশঃই বর্দ্ধিত হইতে থাকিবে। তোমার লাভ ও ক্ষতিকে আমি আমার লাভ ও ক্ষতি বলিয়া মনে করিতেছি ও চিরকাল করিব। ঈশ্বর-পরিত্যক্ত ও কুকর্ম্মান্বিত এই দারাসেকো পৌত্তলিক হিন্দুর গোলাম, ভক্ত-বিশ্বাসীর শত্রু; ইহার বিনাশের পর তোমার প্রতি আমার কৃপা আরও বর্দ্ধিত হইবে। আমি নিরাবিল মনে তোমার নিকটে আমার অঙ্গীকার সততই পালন করিব; অর্থাৎ সাম্রাজ্য অধিগত হইলে তুমি পাঞ্জাব, কাশ্মীর ও সিন্ধুদেশ গ্রহণ করিয়া ঐ তিন প্রদেশের সম্মিলনে যে বিস্তৃত রাজ্য সংগঠিত হইবে তাহাতে একচ্ছত্র নৃপতি হইবে, তাহাতে

আমি বিন্দুমাত্রও আপত্তি করিব না ; বরং তোমার হস্তে ঐ রাজ্যরক্ষার জন্য প্রয়োজন হইলে আমি তোমার যথাসাধ্য সহায়তা করিব। তুমি তোমার রাজ্যে স্বাধীন নৃপতির ধ্বজা উত্তোলন করিবে, নিজনামাঙ্কিত মুদ্রা প্রচলন করিবে এবং নিজনামে খুদ্‌বা প্রচারিত করিবে। অবশ্যম্ভাবী ধর্ম্মযুদ্ধে জয়লাভ করিলে আমাদের হস্তে ধনরত্নাদি যে সকল মূল্যবান্ বস্তু, দাস-দাসী, অশ্বগজাদি যে সকল জীব এবং যুদ্ধের যে সকল উপকরণ পতিত হইবে, তাহার একতৃতীয়াংশ তোমাকে দিব এবং অবশিষ্ট আমি গ্রহণ করিব। আমি কোরাণ-শরিফ শিরে ধারণ করিয়া এবং আল্লাতালা ও পয়গম্বরকে সাক্ষী করিয়া লিপিযোগে এই সকল অঙ্গীকার করিতেছি। পয়গম্বর যেমন খোদার প্রত্যাদেশে বিশ্বাস-স্থাপন করিয়াছিলেন, তুমিও তেমনি আমার এই প্রতিজ্ঞাপত্রে বিশ্বাস স্থাপন করিও। ধর্ম্মের কণ্টক ও গাজীর চক্ষুঃশূল পৌত্তলিক দারা বিনষ্ট হইলে এবং রাজ্য নিরাময় হইলেই তুমি তোমার স্বরাজ্যে সিংহাসন স্থাপিত করিও ; আমি আপত্তি করিব না এবং কাহাকেও আপত্তি করিতে দিব না। আমি অউরঙ্গাবাদ হইতে সবাহিনী যাত্রা করিয়া সত্বরেই নর্ম্মদা উত্তীর্ণ হইব ; তুমিও তোমার সৈন্যসামন্ত লইয়া অভিযান আরম্ভ করিও, যেন বড়মণ্ডলের নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে আমরা মিলিত হইতে পারি।

অউরঙ্গজেব তাঁহার পুনপুনরুচ্চারিত অঙ্গীকার কতদূর রক্ষা করিয়াছিলেন এবং তাঁহার "প্রাণাধিক প্রিয়" কনিষ্ঠ ভ্রাতা মুরাদ তাঁহার অপরিসীম স্নেহের কি নিদর্শন পাইয়াছিলেন, তাহা ঐতিহাসিকগণ লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা আমার এ প্রবন্ধের বিষয়ীভূত নহে।

অউরঙ্গজেবের প্রতি রাজসিংহ

ভারতের মুসলমান-বিজেতৃগণ দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করিয়া তাঁহাদের প্রত্যেক হিন্দুপ্রজার নিকটে তাহার হিন্দুত্ব-নিবন্ধন যে কর আদায় করিতেন, তদ্দ্বারা হিন্দু-মুসলমানের মনোমালিন্য সঞ্জীবিত রাখিবার পন্থা প্রশস্ত হইয়াছিল। এই কর "জিজিয়া" নামে অভিহিত হইত। মহামতি আকবর দেখিয়াছিলেন যে, হিন্দুস্থানে হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানই মুসলমানের অধিকতর শত্রুতাচরণ করিত। নানাজাতীয় উদ্ধত-চরিত্র মুসলমানে হিন্দুস্থান পরিপূর্ণ হইয়াছিল; তাহাদের মধ্যে সহানুভূতি বা একতাবন্ধন ছিল না, সকলেই স্বকার্য্য উদ্ধারের জন্য ব্যস্ত থাকিত; রাজ্য বা ক্ষমতালাভের জন্য জ্ঞাতিত্ব, সমধর্ম্মিত্ব ইত্যাদি সমস্তই পদদলিত হইত। আকবর হিন্দুগণের সহিত সৌখ্য ও বৈবাহিকসম্পর্ক সংস্থাপন করিয়া মোগল-সাম্রাজ্যের ভিত্তি সুদৃঢ় করিতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। তিনি নিজে রাজপুত-কন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন এবং পুত্র জাহাঙ্গীরকে রাজপুত-কন্যা বিবাহ করাইয়াছিলেন। তিনি রাজপুতগণকে উচ্চ রাজকার্য্যে নিয়োজিত করিয়াছিলেন এবং হিন্দু ও মুসলমানকে সম-দৃষ্টিতে দেখিতেন। তিনি হিন্দুবিদ্বেষাত্মক জিজিয়া কর উঠাইয়া দিয়া হিন্দু-প্রজাগণের প্রীতিও কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছিলেন। তাঁহার এই উদার-নীতির ফলে অম্বরপতি মানসিংহপ্রমুখ রাজপুতবীরগণ তাঁহার রাজ্য-বিস্তার ও রাজ্য-রক্ষার জন্য তুষারকিরীট ককেশস্ পর্ব্বত হইতে পূর্ব্বোপ-সাগরকূলস্থ আরাকান পর্য্যন্ত সর্ব্বদেশে রাজপুত-রক্তে ধরণী সিক্ত করিয়া-ছিলেন; ইহারই ফলে তিনি প্রবল পাঠানগণকে দমন করিয়া ভারতের একছত্রত্ব সাধন করিতে পারিয়াছিলেন এবং ইহারই ফলে তিনি তাঁহার বিশাল সাম্রাজ্য পুত্রপৌত্রাদিক্রমে অবিচ্ছিন্ন ভাবে ভোগ করিতে পারিয়া-

ছিলেন। জাহাঙ্গীর ও সাজাহান তাঁহার পদাঙ্কানুসরণ করিয়া তাঁহাদের হিন্দু-সামন্তগণের সাহায্যপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অতএব তাঁহাদিগকে হুমায়ূনের ন্যায় সিংহাসনচ্যুত ও নির্ব্বাসিত হইতে হইয়াছিল না। অউরঙ্গজেব ভ্রাতৃ-শোণিতে লালসার তর্পণ করিয়া এবং পিতা ও ভগিনীকে কারারুদ্ধ করিয়া সিংহাসনে উপবেশন করিলেন এবং ভ্রাতুষ্পুত্রগণকে হত্যা করিয়া কথঞ্চিৎ নিরুদ্বেগ হইলেন। সিংহাসনের পথ নিষ্কণ্টক করিবার মানসে আর কেহ এতগুলি মহাপাপ সাধন করে নাই। তাঁহার পঙ্কিল হৃদয় সর্ব্বদাই উদ্বেগ-পূর্ণ থাকিত। তিনি প্রায়শ্চিত্তের আবশ্যকতা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন—পাপীমাত্রেই করিয়া থাকে এবং অতি সঙ্কীর্ণ-হৃদয় ধর্ম্মোন্মাদের ন্যায় বিধর্ম্মিগণের প্রতি নানাবিধ অত্যাচার করিয়া আপনার বিবেক-বুদ্ধিকে প্রতারিত করিয়াছিলেন। তাঁহার অত্যাচারে হিন্দু-কৃষক ক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছিল; হিন্দু-শিল্পী কর্ম্মত্যাগ করিয়া অদৃশ্য হইয়াছিল; অতএব রাজকোষে অর্থাভাব হইয়াছিল। এদিকে তাঁহার অবিশ্রান্ত যুদ্ধবিগ্রহে রাশি রাশি অর্থের প্রয়োজন; ঐ অর্থ-সংগ্রহের জন্য তিনি জঘন্য জিজিয়া-কর পুনরায় স্থাপন করিয়াছিলেন। অউরঙ্গজেবের এই অতি দূষণীয় কার্য্যের প্রতিকূলে মিবারপতি বীর রাজসিংহ সম্রাট্‌কে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, কোন বিখ্যাত পাশ্চাত্য ঐতিহাসিক বলিয়াছেন যে, তাহার তুলনা পৃথিবীতে নাই। যে উচ্চ ধর্ম্মনীতি, যে লোকহিতৈষিণা, যে উদারতা এবং যে নির্ভীকতা এই লিপি-মুখে ব্যক্ত হইয়াছে, অন্য কোন ভাষায় লিখিত বাক্যে ইহার অধিক হয় নাই। সে চিরস্মরণীয় লিপিখানি এই—

পাতসাহ, ভগবানের অনন্ত মহিমা কীর্ত্তিত হউক এবং নির্ম্মল আকাশে প্রভাসিত সূর্য্যচন্দ্রমার ন্যায় আপনার বদান্যতার জ্যোতিঃ ধরণীতল পরিব্যাপ্ত হউক। আমি আপনার সান্নিধ্য-সুখে বঞ্চিত আছি, কিন্তু

তথাপি আমি আপনার হিতাকাঙ্ক্ষী এবং রাজভক্তজনোচিত সকল সম্মানার্হ কার্য্যে সর্ব্বদা তৎপর। ভারত-ভূমির স্বাধীন ও অধীন নৃপতি-বৃন্দ, সামন্ত ও জায়গীর-ভোগিগণ এবং ইরাণ, তুরাণ, রুম, চীন ইত্যাদি সর্ব্বদেশবাসিগণ এবং স্থলপথ ও জলপথচারী সর্ব্বাবস্থার লোকপুঞ্জের হিতার্থে আমার হৃদয়ের সকল প্রযত্ন নিয়োজিত, ইহা সকলের নিকটেই বিদিত আছে, আপনিও এ বিষয়ে সন্দেহযুক্ত হইবেন না। সম্প্রতি আমি একটি বিশেষ ঘটনার উল্লেখ করিব; ইহাতে হিন্দুস্থানের জনসাধারণের এবং আমাদের আপন হিত সম্পৃক্ত আছে। আমার পূর্ব্ব কার্য্যকলাপ স্মরণ করিয়া এবং আপনার নিজ হৃদয়ের মহত্ত্বদ্বারা প্রণোদিত হইয়া আপনি এ বিষয়ে ন্যায়সঙ্গত বিধান করিবেন এই প্রার্থনা করি।

শ্রুত হইলাম, এ অকিঞ্চন হিতাকাঙ্ক্ষীর সহিত যুদ্ধবিগ্রহে রাজকোষের বহুধন অপব্যয়িত হইয়াছে এবং ভাণ্ডার পুনরায় পূর্ণ করিবার জন্য আপনি আপনার দরিদ্র হিন্দু-প্রজাগণের নিকট হইতে লুপ্ত জিজিয়া-কর পুনর্গ্রহণ করিবার আদেশ প্রচার করিয়াছেন। আমার বিনীত নিবেদন এই যে, আপনার স্বর্গারূঢ় প্রপিতামহ মহম্মদ জেলালুদ্দিন আকবর শাহ দ্বিপঞ্চাশৎ বর্ষকাল ন্যায়ানুমোদিত প্রণালীতে অথচ অপ্রতিহতপ্রভাবে এ ভারত-সাম্রাজ্য প্রতিপালন ও শাসন করিয়াছিলেন; তাঁহার সিংহাসনের ছায়ায় সকল জাতীয় ও সকল ধর্ম্মাবলম্বী জনগণ সুখে ও স্বচ্ছন্দে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিত। সকলের প্রতিই তাঁহার সমান দৃষ্টি ও বাৎসল্য ছিল। কি ঈশা, কি মুশা, কি দাঊপন্থী, কি মহম্মদের সেবক, কি ব্রাহ্মণ, কি নিরীশ্বরবাদী নাস্তিক প্রত্যেকেই তাঁহার দ্বারা সমভাবে প্রতিপালিত হইত। এইজন্য তাঁহার প্রজাবর্গ তাহাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা, ভক্তি ও প্রেমপ্রদর্শনার্থ তাঁহাকে "জগদ্গুরু" অভিধান প্রদান করিয়াছিল। আপনার স্বর্গগত পিতামহ মহম্মদ নুরুদ্দিন

জাহাঙ্গীর তাঁহার পিতার পদাঙ্কানুসরণ করিয়াছিলেন এবং দ্বাবিংশতি বৎসর সমদর্শিতার সহিত সন্ততিবর্গ প্রতিপোষণ করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার মিত্রজনকে প্রেম ও বিশ্বাসদানে আপ্যায়িত করিতেন এবং কেবল শত্রুগণের বিরুদ্ধেই আপনার অমিত বাহুবল প্রয়োগ করিতেন। পুণ্য-লোকপ্রাপ্ত আপনার পিতা সাজাহানও দয়াশীলতা এবং ন্যায় ও ধর্ম্ম-পরায়ণতার জন্য জগতে কম খ্যাতিলাভ করিয়া যান নাই। তাঁহার দ্বাত্রিংশদ্বর্ষব্যাপী রাজত্বকালে সর্ব্বশ্রেণীস্থ প্রজাবর্গ পরমসুখে কালাতিপাত করিয়াছিল।

আপনার পিতৃপুরুষগণের মতিগতি এইরূপ ছিল; তাঁহারা ন্যায়-পথানুবর্ত্তী ছিলেন, সেইজন্য তাঁহাদের বাসনা সফল হইত, এবং সকল কার্য্যেই জয়শ্রী তাঁহাদের অঙ্কগতা হইতেন। তাঁহারা বহু শত্রু দমন করিয়াছিলেন, বহু পররাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন। আপনার রাজত্বকালে বহু স্বায়ত্তপ্রদেশ পরকরতলগত হইয়াছে এবং আরও হইবে; কেননা রাজ্যে সুশাসন নাই, ন্যায়-বিচার নাই, প্রজা-স্নেহ নাই। কেবল দুর্ব্বলের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠনে ও ধ্বংসসাধনে আপনার ও আপনার প্রতিনিধি-গণের শক্তি প্রযুক্ত হইতেছে। আপনার প্রজাবর্গ পদদলিত এবং প্রদেশসমূহ দারিদ্র-পীড়িত বা উৎসাদিত; আপনি আপজ্জালে বিজড়িত হইতেছেন। আপনি সুবিশাল সাম্রাজ্যের অধিপতি, যদি আপনারই কোষশূন্য, তবে সামন্তরাজগণ ও অন্যান্য পদস্থ ব্যক্তির অবস্থা সহজেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন। আপনার সৈন্যগণ বেতন না পাইয়া মহা অসন্তুষ্ট হইয়াছে, এবং আপনার রাজ্যের বণিক্‌গণ বাণিজ্যাভাবে হাহাকার করিতেছে। মুসলমানগণ যেমন অসুখী ও দীনদশাপন্ন, হিন্দু-গণও তদ্রূপ। নিম্নশ্রেণীস্থ নরনারীকুল অন্নাভাবে বক্ষে করাঘাত করিয়া ধূল্যবলুণ্ঠিত হইতেছে।

অন্নাভাবে শীর্ণ, নির্ব্বিরোধী প্রজাকে উৎপীড়ন করিয়া যে নরপতি কর-সংগ্রহ করেন এবং উহা হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধুগণের নির্য্যাতনের নিমিত্ত নিয়োজিত করেন, সংসারে তাঁহার মর্য্যাদা কিরূপে রক্ষিত হইবে? শুনিতেছি যে, আপনি বিশাল রাষ্ট্রের অধিপতি হইয়াও নিঃস্ব তীর্থযাত্রী হিন্দুকে করের জন্য আক্রমণ করিতেছেন; আপনার প্রবল প্রতাপে যোগী ও সন্ন্যাসী, বৈরাগী ও ভিক্ষু, ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধ—কেহই কর প্রদান না করিয়া উদ্ধার পাইতেছে না; এবং আপনি পিতৃগণের পুণ্যখ্যাতি অতল জলে বিসর্জ্জন দিয়া ভিক্ষোপজীবিগণের প্রতিও বাহুবল প্রয়োগ করিতেছেন। যে সকল গ্রন্থ জগতে ধর্ম্মশাস্ত্র বলিয়া পূজিত, আপনার যদি সে সকলে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস থাকে, তবে আপনি এ কথা অবশ্যই মান্য করিবেন যে, ভগবান্ যেমন মুসলমানের তেমনি হিন্দুর—কেবল মুসলমানের নহেন। মহম্মদপ্রদর্শিত পথাবলম্বিগণ এবং অন্যান্য ধর্ম্মাচারিগণ সকলেই এক পংক্তিতে তাঁহার চরণতলে উপবেশন করিয়া আছে। মনুষ্যকুলে শ্বেত-কৃষ্ণভেদ, জাতি-ধর্ম্মভেদ তাঁহারই অভিপ্রেত, তাঁহারই কার্য্য। তিনি সকলকেই সৃজন করিয়াছেন, পালন ও রক্ষা করিতেছেন। মস্‌জিদে যে নেমাজের ধ্বনি উত্থিত হয় তাহাও যেখানে উপনীত হয়, হিন্দুর দেব-মন্দিরের ঘণ্টা ও মন্ত্রধ্বনিও সেইখানেই গমন করে। মস্‌জিদে যিনি পূজিত হন, প্রতিমাপূর্ণ দেবমন্দিরেও তিনিই। যে অপর ধর্ম্মাবলম্বিগণের ধর্ম্ম ও রীতিনীতির প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করে ও তাহাদিগকে উৎপীড়ন করে সে ঈশ্বরেচ্ছার বিপরীত আচরণ করে। যেমন কোন এক ব্যক্তি কোন একখানি চিত্র বিনষ্ট করিলে উহার চিত্রকর তাহার প্রতি ক্রোধান্বিত হন, তেমনই আমাদের কাহাকেও অপর কেহ নিধন করিলে নিধনকারী জগৎ-স্রষ্টার কোপে পতিত হইয়া থাকে।

হিন্দুদিগকে এই করভারে নিপীড়িত করা ন্যায়ানুমোদিত নহে, ইহা

রাজনীতিসঙ্গতও নহে। ইহা দ্বারা হিন্দুধর্ম্মের অবমাননা করা হইতেছে এবং হিন্দু প্রজা নির্ধনীকৃত হইতেছে। অনুমান করি, ইস্‌লাম-ধর্ম্মের গৌরববর্দ্ধনার্থই আপনি জিজিয়াকর পুনঃ প্রচলন করিয়াছেন। আপনি যেমন আপনার ধর্ম্মের মুখ্য সংরক্ষণকর্ত্তা, তেমনি হিন্দুধর্ম্মের প্রধান সংরক্ষক অম্বরপতি জয়সিংহ। আপনি হিন্দুস্থানের সমস্ত হিন্দুর স্থলে তাঁহাকে করপ্রদানের আদেশ করুন; আমাকেও করিতে পারেন। আমি দুর্ব্বল; আমার নিকট হইতে কর গ্রহণ করিতে আপনার বিশেষ আয়াস না হইবারই কথা। ক্ষুদ্রপ্রাণ কৃষক ও বণিক্, নির্ব্বিরোধী যতি, সন্ন্যাসী, বৈরাগী প্রভৃতির প্রতি অত্যাচার করা আপনার ন্যায় প্রতাপান্বিত নরপতির শোভা পায় না। আমি বিস্মিত হইতেছি যে, আপনার বিচক্ষণ মন্ত্রিগণের মধ্যে কেহ আপনাকে এতদিনও এ বিষয়ে সৎ-পরামর্শ প্রদান করেন নাই।

স্যর্ ফিলিপ ফ্র্যান্সিসের প্রতি হেষ্টিংস্

মুসলমান রাজত্বের অবসানে এবং ইংরেজ রাজত্বের উন্মেষ সময়ে অমিততেজা হেষ্টিংস সাহেব বঙ্গে শাসনদণ্ড পরিচালন করিতেছিলেন। তাঁহার পূর্ব্বেই অনরেবল ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানি এ দেশের রাজস্ব সংগ্রহের ভারপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন; এবং দেশরক্ষার ভার বাতব্যাধিগ্রস্ত তথাকথিত নবাব মীরজাফর বাৎসরিক ৫৩ লক্ষ টাকা দক্ষিণাসহ ইংরেজের হস্তে দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন। হেষ্টিংস যখন গভর্ণর জেনারল নিযুক্ত হন, তখন মুর্শিদাবাদের রাজ-প্রাসাদ নীরব, অযোধ্যার নবাবের মন হইতে তখনো কোরার রণক্ষেত্রের বিভীষিকা তিরোহিত হয় নাই, এবং আকবর ও অউরঙ্গজেবের বংশধর সম্রাট্ দ্বিতীয় শাহআলম্ তখন উদরান্নের জন্য

ইংরেজের পেন্‌সনের উপর নির্ভর করিয়া থাকেন। হেষ্টিংস্ প্রথমে কেবলমাত্র বঙ্গের গভর্ণর ছিলেন; ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দের "রেগুলেটিং এ্যাক্ট্" নামক ভারত-শাসন-পদ্ধতির প্রচলনের পর তিনি ভারতে সমগ্র ইংরেজাধিকারের গভর্ণর-জেনারল হন। তাঁহার সহায়তার জন্য একটি মন্ত্রণা-সভা গঠিত করিয়া দেওয়া হয়। ঐ মন্ত্রণা-সভার প্রথম নিয়োজিত সভ্য জেনারল ক্লেভারিং, কর্ণেল মনসুন্, ফ্র্যান্সিস্, এবং ব্যারোয়েল সকলেই অল্পাধিক পরিমাণে হেষ্টিংসের বিরোধী ও বিরুদ্ধাচারী ছিলেন। কি রাজকার্য্যে কি অপরাপর বিষয়ে হেষ্টিংস যাহা করিতেন বা করিতে চাহিতেন, ইঁহারা তাহার বিপরীতাচরণ করিতেন। অতএব তাঁহার মনে শান্তি ছিল না; শাসনকার্য্যপরিচালনে সুখ ছিল না। নন্দকুমারের ফাঁসি, অযোধ্যার বেগমগণের প্রতি উৎপীড়ন, বারাণসীরাজ চৈৎসিংহকে দলন ইত্যাদি কয়েকটি কার্য্যে ইতিহাসে হেষ্টিংসের নৈতিক চরিত্রে অনপনেয় কলঙ্ক আরোপিত হইয়াছে; কিন্তু তাঁহার চিত্তে যে দার্ঢ্য ছিল, স্বদেশ-হিতৈষিতা ছিল, অদম্য উৎসাহ ও অক্লান্ত শ্রমশীলতা ছিল, আপন মন্ত্রণা-সভায় পরম শত্রু সদস্যগণের দ্বারা প্রতি পদে বাধাপ্রাপ্ত ও অপমানিত হইয়াও তিনি যে কৌশলে বুদ্ধিপ্রাখর্য্যে ভারতে ইংরেজ-শক্তির ও ইংরেজ-শাসনের বিস্ময়কর উন্নতিসাধন করিয়াছিলেন, যে অসামান্য সাহসে তিনি বহিঃশত্রুনিক্ষিপ্ত বিপজ্জাল ছিন্ন করিয়া আপনাকে বারবার মুক্ত করিয়াছিলেন এবং নানা বিপত্তিমধ্যেও যে ধৈর্য্য ও গাম্ভীর্য্যগুণে তিনি আপনার পদ-গৌরব রক্ষা করিয়াছিলেন, তাহার তুলনা নাই। তাঁহার সম্বন্ধে ভারত-গভর্ণমেণ্টের সরকারী পুস্তকাগারে এবং বিলাতের ইণ্ডিয়া-কৌন্সিলের দপ্তরখানায় যে সকল অতি গোপন-কাগজ-পত্র ফরেষ্ট সাহেব সম্প্রতি প্রকাশ করিয়াছেন, আমি তাহা মনোযোগ-পূর্ব্বক পাঠ করিয়া বুঝিয়াছি যে, তিনি পুরুষসিংহ ছিলেন। মানসিক

বীর্য্যে ও প্রাখর্য্যে তাঁহাকে ভারতের চন্দ্রগুপ্ত বা অউরঙ্গজেব এবং য়ূরোপের ফ্রেডারিক বা বিস্মার্কের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। সমধিক বিস্ময়ের বিষয় আরো এই যে, এই পুরুষসিংহ তরল উপন্যাসের নায়কের ন্যায় প্রেমাতুর ছিলেন। নেপোলিয়ন যেমন প্রলয়কর রণতাণ্ডবমধ্যে বজ্রবর্ষী কামানের উপর কাগজ পাতিয়া প্রেয়সী জোসেফাইনকে প্রেমপত্রিকা লিখিতেন, ইনিও তেমনি চিত্তবিক্ষেপকারী কঠোর কর্কশ রাজকার্য্যে নিমজ্জিত থাকিয়াও দূরগত পত্নী মেরিয়া এপোলোনিয়ার উদ্দেশ্যে বিরহবিধুর-হৃদয়ের প্রলাপপদ্য রচনা করিতেন। সমালোচক বলিয়াছেন যে, রস ও লালিত্যের হিসাবে সে সকল কবিতা অপদার্থ, কিন্তু আমি বলি যে, কর্ম্মক্লান্ত দেহে ও উদ্বেগক্লান্ত মানসে নিদ্রাকে অপসারিত করিয়া দুপ্রহর রাত্রিতে তাঁহার যে যতি ও ছন্দ মিলাইয়া পদ্য লিখিবার প্রবৃত্তি হইত এবং শক্তি থাকিত ইহাই অলোকসামান্য।

মন্ত্রণা-সভায় হেষ্টিংসের যে শক্রগণের কথা বলিয়াছি, তন্মধ্যে ফ্র্যান্সিস্ অতি বিষম ছিলেন। হেষ্টিংসের বিদ্বেষে তাঁহার হৃদয় জর্জ্জরিত ছিল। এরূপ ঘোর বিদ্বেষ সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না। তিনি অতি তীক্ষ্ণবুদ্ধি, বাক্য-রচনাপটু ও ক্ষমতাশালী ছিলেন। সকল শক্র অপেক্ষা হেষ্টিংস ইহাকেই অধিক ভয় করিতেন। তিনি ইহাকে তুষ্ট করিতে ও ইহার মিত্রতালাভ করিতে অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হন নাই। হেষ্টিংসের সৌভাগ্যবশতঃ অল্পকাল মধ্যে ক্ল্যাভারিঙ্গের মৃত্যু হয় এবং ইহার কিছুকাল পরে হলোয়েল কি যেন কি ভাবিয়া হেষ্টিংসের পৃষ্ঠ-পোষণ করিতে থাকেন; তখন তাঁহার অবস্থা কিঞ্চিৎ পরিমাণে সহনীয় হইয়াছিল। ১৭৭৯ খৃষ্টাব্দে পুনার মহারাষ্ট্রীয়গণের সহিত বোম্বের ইংরেজ-কর্ম্মচারিগণ অদূরদর্শীর ন্যায় যুদ্ধ বাঁধাইয়া তাহাদের হস্তে যেরূপ অপদস্থ হন, তাহা ইতিহাসজ্ঞ জানেন। হেষ্টিংস সাহেব ইংরেজের

তরবারির অপমান সংবাদ পাইয়া, উহার মলিন-গৌরব উদ্ধারের জন্য আপন মন্ত্রণাসভার সম্মতি অনুসারেই যুদ্ধস্থলে সেনা ও সেনাপতি প্রেরণ করেন এবং কয়েক মাস যুদ্ধ চালাইতে থাকেন। ফ্র্যান্সিস্ কোন বিষয়েই অনেকক্ষণ তাঁহার সহিত একমত হইতে পারিতেন না; তাঁহার কার্য্যের ছিদ্রানুসন্ধান, তাঁহার দোষ উদ্‌ঘাটন করা, পদে পদে তাঁহাকে বাধা দেওয়া এবং তাঁহাকে অপদস্থ করা তাঁহার জীবনের ব্রত ছিল। অনতিবিলম্বে ফ্র্যান্সিস্ হেষ্টিংসের যুদ্ধ পরিচালন-পদ্ধতির ও কার্য্যের নানাপ্রকার বিরুদ্ধ সমালোচনা করিতে লাগিলেন। তিনি কোম্পানির অনেক অর্থ অসংযতভাবে ব্যয় করিতেছেন, তাঁহার অবলম্বিত রণ-পদ্ধতি সিদ্ধির অনুপযোগী, এ যুদ্ধ অন্যায় এবং ইহা দ্বারা কখনই কোম্পানির লাভ হইতে পারে না, মন্ত্রণা-গৃহে প্রতিদিন এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার প্ররোচনায় সভা হইতে তাঁহার বারম্বার কৈফিয়ৎ তলব হইতে লাগিল। হেষ্টিংস অশ্রান্তভাবে মন্তব্যের পর মন্তব্য লিখিয়া, তর্কের পর তর্ক করিয়া, একমাত্র অন্যতম সদস্য ব্যারোয়েলের সাহায্যে আপনার মত ও কার্য্য সমর্থন করিতে লাগিলেন। মন্ত্রণা-সভায় অধিকাংশ সভ্যের মতে কর্ত্তব্য-নিরূপণ হইত। প্রায় প্রত্যেক মন্ত্রণাতেই এক পক্ষে ফ্র্যান্সিস্ ও মনসুন্ থাকিতেন, অপর পক্ষে হেষ্টিংস ও ব্যারোয়েল থাকিতেন; এইরূপে মতচতুষ্টয় সমভাগে বিভক্ত হইত; তাহাতে কোন সিদ্ধান্তেই উপনীত হওয়া যাইত না। কিন্তু মন্ত্রণা-সভার সভাপতিরূপে হেষ্টিংসের আর একটি অতিরিক্ত মত ছিল, তিনি তাহা নিজ পক্ষে অর্পণ করিয়া আপনার অভিপ্রায় সাধন করিয়া লইতেন। সর্ব্বদা এইরূপে কাজ করা নিরাপদও নহে, সুখের ও নহে; এরূপ অবস্থায় সিদ্ধিও সর্ব্বদা নিশ্চিত থাকে না। যদি কদাচিৎ ব্যারোয়েল অপর পক্ষের আনুকূল্যে অভিমত প্রকাশ করিতেন, তবেই হেষ্টিংসের

পরাজয় হইত; তবেই ফ্র্যান্সিস্ তাঁহাকে পেষণ করিতেন। এই দুই প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী দুই মল্লের ন্যায় রণাঙ্গনের দুই বিপরীত প্রান্তে পরস্পরকে আক্রমণ করিবার জন্য মুষিক-লোলুপ মার্জারের ন্যায় লম্ফনোদ্যত হইয়া থাকিতেন। গর্ব্ব উভয়েরই সমান ছিল; কেহ কাহারো নিকট মস্তক অবনত করিতেন না। তবে গভর্ণর-জেনরলের পদে অধিষ্ঠিত থাকায় কোম্পানির শুভাশুভের জন্য হেষ্টিংস সর্ব্বাধিক দায়ী ছিলেন; ফ্র্যান্সিসের অপেক্ষা তাঁহার স্বদেশ-প্রেমও অনেক পরিমাণে অধিক ছিল। পাছে তাঁহার জেদে বা তাঁহার বুদ্ধিভ্রমে বা তাঁহার কার্য্যদোষে ভারতে ইংরেজ-রাজ্য ও রাজশক্তির ন্যূনতা ঘটে, ফ্র্যান্সিসের সহিত উদ্দণ্ড কলহ করিতে করিতেও এ ভয় তাঁহাকে ব্যাকুল করিত। সেইজন্য যখন মহারাষ্ট্রীয়-গণের সহিত যুদ্ধ চলিতেছিল, তখন তিনি একদিন আপন গর্ব্ব গলাধঃ-করণপূর্ব্বক সহযোগী গৃহশত্রুর নিকট মস্তক অবনত করিয়া মৈত্রী ভিক্ষা করিলেন। ফ্র্যান্সিস্‌ও কপট সরলতার সহিত তাঁহাকে সর্ব্ববিষয়ে সমর্থন ও সহায়তা করিতে সম্মত হইলেন। ইহার কিছুদিন পূর্ব্বে ব্যারোয়েল স্বদেশে যাইবার জন্য বিদায় লইয়াছিলেন; তাঁহার জন্য জাহাজ দুই তিন মাস ঘাটে অপেক্ষা করিতেছিল; কিন্তু তিনি গেলে মন্ত্রণাসভায় একেবারেই অসহায় হইবেন এই ভাবনায় হেষ্টিংস্ তাঁহাকে যাইতে দেন নাই। এখন পরম শত্রুর সহিত মিত্রতা হইল; তিনি আর তাঁহার বিপক্ষতা করিবেন না, এই আশ্বাস পাইয়া হেষ্টিংস্ ব্যারোয়েলকে যাইতে দিলেন। কিন্তু যেই ব্যারোয়েলের তিরোধান, অমনি ফ্র্যান্সিসের স্বমূর্ত্তিধারণ। তিনি দ্বিগুণ উৎসাহে চিরবিদ্বেষভাজনের শত্রুতাসাধন করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন হেষ্টিংস্ তাঁহার চিরাভ্যস্ত ধৈর্য্য হারাইয়া ফ্র্যান্সিস্‌সম্বন্ধে তাঁহার মনের কথা স্পষ্টভাষায় লিপিবদ্ধ করিলেন এবং উহা মন্ত্রণাসভায় সর্ব্ব-সমক্ষে পাঠ করাইলেন। সে মন্তব্যলিপির অনুবাদ নিম্নে দিতেছি।

সভায় উহার পাঠ-সমাপনের পর সভাভঙ্গ হইলে রোষকষায়িত-লোচন ফ্র্যান্সিস্ হেষ্টিংস্‌কে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করিলেন ; ঘোর অভিমানী হেষ্টিংসও ঐ ভীষণ আমন্ত্রণ সস্নেহে গ্রহণ করিলেন। পরদিন ১৭ই অগষ্ট তারিখে প্রাতঃকালে যুদ্ধ হইল। হেষ্টিংসের গুলি তাঁহার প্রতিপক্ষের দেহ ভেদ করে ; কিন্তু তাহাতে তাঁহার মৃত্যু হয় না। তিনি প্রায় মাসেক কালে ক্ষতমুক্ত হইয়া পুনরায় আপন কার্য্যে রত হন। যদি ফ্র্যান্সিসের গুলি হেষ্টিংসের প্রাণবায়ু বিনির্গত করিত, তবে কে জানে, ভারতবর্ষের পরবর্ত্তী ইতিহাসে অন্য কোন সফল বৃত্তান্ত বর্ণিত হইত ?

লিপিখানি এই,—

মন্ত্রণা-সভার অন্যতম সদস্য, আমার স্বদেশবাসী সহযোগী স্যর্ ফিলিপ ফ্র্যান্সিসের ব্যবহার ও কার্য্য-কলাপ দেখিয়া, তাঁহার সহায়তা ও সহানুভূতি প্রাপ্তি বিষয়ে আমি নিরাশ হইয়াছি। আর আমার মনের ভাব গোপন করিবার প্রয়োজন কি ? আজ আমি উচ্চকণ্ঠে স্পষ্টভাষায়, এই মন্ত্রণাসভায় তাঁহার চরিত্রের ব্যাখ্যা করিব। মহারাষ্ট্রীয়গণের সহিত যুদ্ধে যে যুদ্ধপদ্ধতি অনুসৃত হইতেছে, তাহার এবং সমস্ত যুদ্ধ-ব্যাপারের বিরুদ্ধে তিনি যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে আমি ক্ষুব্ধ নহি, আমার ক্ষোভের কারণ, আমার প্রতি অভিমতে, প্রতিকার্য্যে তাঁহার প্রতিদিনের নানাপ্রণালী উদ্ভাবন করিয়া আমি একে একে সে সকলই এই সভার বিচারের জন্য ইহার সমক্ষে উপস্থিত করিয়াছি ; স্যর্ ফিলিপের প্ররোচনায় তৎসমুদায় একে একে পরিত্যক্ত হইয়াছে। তিনি যখনই যে আপত্তি করিয়াছেন, আমি আমার পরবর্ত্তী প্রচেষ্টায় এমন পথ অবলম্বন করিয়াছি যে, তাহাতে ঐ আপত্তি আর তিষ্ঠিতে পারে নাই। তথাপি আমি তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিতে পারি নাই। ডিরেক্টরগণ আমাকে গভর্ণর-জেনারলের পদে আসীন করিয়াছেন, স্যর্ ফিলিপকে

মন্ত্রণা-সভার সদস্য করিয়াছেন; অতএব আমারও অধিকার আছে যে, এই রাজ্য-সংক্রান্ত সমস্ত কাজে নেতৃত্ব গ্রহণ করি, এবং তাঁহার পক্ষে ইহাই কর্ত্তব্য-বুদ্ধির অনুমোদিত যে, তিনি আমার সাহায্য করেন; প্রতি পদে আমার বিরুদ্ধাচরণ করা তাঁহার উচিত নহে। মহারাষ্ট্রীয় যুদ্ধ-সম্বন্ধে আমার এতগুলি বিপদ প্রকল্পনা, তাঁহার দৃষ্টি-গোচর হইয়াছে, তথাপি আমাকে বিরক্ত করিবার জন্য তিনি আবার আমার নিকট আমার সমস্ত অভিসন্ধি পুঙ্খানুপুঙ্খ ব্যাখ্যা-সহ জানিতে চাহিয়াছেন; অনুগ্রহ করিয়া বলিয়াছেন যে, ঐ বিবরণ তাঁহার হস্তগত হইলে তিনি সরলচিত্তে উহার যথোচিত বিচার বিবেচনা করিবেন। বিচার-বিবেচনা তাঁহার প্রকৃত-অভিপ্রায় নহে, হইলে বহুদিন পূর্ব্বেই তিনি তাহা করিতে পারিতেন; তাঁহার অভিপ্রায়-ছলে বিলম্ব করিয়া আমার অভিপ্রায়-সিদ্ধির পথে কণ্টক ন্যস্ত করা ও আমাকে অপদস্থ করা। কিছুকাল পূর্ব্বে তিনি আমাকে পদচ্যুত করিবার চেষ্টায় বিফল মনোরথ হইয়াছেন; এখন আমার আরব্ধ কার্য্যের দুর্গতি করিয়া সেই সূত্রে সেই মনোরথ সিদ্ধ করিবেন। আমি তাঁহার সরলতায় বিশ্বাস করি না। সরলতা তাঁহার প্রকৃতি-বিরুদ্ধ! আমার কোন কার্য্যে ভারতে বৃটিশরাজ্যের ও বৃটিশ-গৌরবের উন্নতি হইলেও যদি উহাদ্বারা তৎসঙ্গে আমার কৃতিত্বের কিঞ্চিন্মাত্রও প্রশংসা হয়, তবে তিনি প্রাণপণে ঐ কার্য্যে বাধা দেন ও দিতেছেন। তাঁহার বাধা সত্ত্বেও যদি ঐ কার্য্য এতদূর অগ্রসর হয় যে, পশ্চাৎপদ হইবার আর উপায় না থাকে, কার্য্য চলিতে থাকে, তথাপিও তিনি কণ্টক-স্থাপনে শৈথিল্য করেন না, অক্লান্ত যত্নে বিরুদ্ধ ব্যবহার করিতেই থাকেন। আমাকে বিরক্ত, বিত্রস্ত, উন্মাদগ্রস্ত না করিলে তাঁহার মনে শান্তি হয় না। আমার প্রত্যেক আশা তাঁহার দ্বারা নৈরাশ্যে পরিণত এবং প্রত্যেক নিরাশা তাঁহার ব্যবহারে অধিকতর দুঃখদায়ক

হইয়া থাকে। আমার বিপক্ষে যাহার একটি কথাও বলিবার আছে, তাহার নিমিত্ত তাঁহার দ্বার সর্ব্বদাই উন্মুক্ত এবং তাঁহার সেই কথাটির ধ্বনি ও প্রতিধ্বনি তিনি সহস্র কর্ণে গ্রাস করেন। তিনি আমার সুখের মাত্রা লাঘব এবং দুঃখের ভার গুরুতর করিতে সতত যত্নশীল। তিনি একাগ্র চেষ্টায় বুঝাইতে চাহিতেছেন যে, আমারই দোষে আমাদের সেনাসমূহ সমরাঙ্গনে দলে দলে বিনষ্ট হইতেছে এবং অবশিষ্টেরা আহারাভাবে মৃত্যুমুখ; যে আমারই দোষে প্রতিবৎসর কোম্পানির আয়ের হ্রাস এবং ধনকোষের খর্ব্বতা সংঘটিত হইতেছে, এ সকল কথা সমস্তই মিথ্যা। তবে আমাকে ইহাও বলিতে হয় যে, আমাদের গৃহে এরূপ অনৈক্য থাকিলে, যাঁহারা রাজ্যের নেতা ও কর্ত্তা তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে এরূপ অহি-নকুলভাব আর কিছুদিন পোষিত হইলে রণক্ষেত্রে আমাদের চিরবিজয়ী সেনা বিজিত ও বিনষ্ট হইবে এবং তাহারা অনাহারে মরিবে, রাজ্যের আয় কমিয়া যাইবে ও ধনাগার শূন্য হইবে।

আমি স্যর্ ফিলিপের প্রতি যে সকল কু-অভিপ্রায় আরোপ করিলাম, তিনি হয়তো সে সকল অস্বীকার করিবেন; কেন না, তিনি জানেন যে, অভিপ্রায়ের অকাট্য প্রমাণ দেওয়া কঠিন। তিনি হয়তো বলিবেন যে, তিনি কি অভিসন্ধিতে কি কাজ করিয়াছেন তাহা তিনি যেমন জানেন, তেমন আর কেহ জানিতে পারে না; অতএব আমার দ্বারা তাঁহার এ অভিসন্ধির ব্যাখ্যা আমার পক্ষে ধৃষ্টতা এবং অন্যায়; এবং প্রতিশোধ তুলিবার জন্য তিনি আমার অভিপ্রায়গুলির যথেচ্ছ বিশ্লেষণ করিতে পারেন। আমার পক্ষে আমার চিরদিনের চরিত্রই প্রধান সাক্ষ্য; উহাই আমার আত্মরক্ষার অবলম্বন। তবে আমার কু-অভিপ্রায়ের এমন কোন দৃষ্টান্ত যদি থাকে যাহা ফ্র্যান্সিস্ জানেন, আমি জানি না, তবে তিনি উহা স্বচ্ছন্দে এই সভায় প্রকাশ করিতে পারেন।

তিনি আমার সহিত মিত্রতার ভাণ করিয়া মধুর-বাক্যে কৃত আশ্বাস দিয়াছিলেন, সেই আশ্বাস-বাক্যে বিশ্বাস করিয়া আমি আমার একমাত্র সহায় ও হিতৈষী বন্ধু ব্যারোয়েলকে বিদায় দিই। আমি তাঁহার উপর কতদূর বিশ্বাস-স্থাপন করিয়াছিলাম আমার এই কার্য্যই তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ। যদি তাঁহার বিন্দুমাত্রও আত্মসম্মানবোধ থাকিত, যে তাঁহাকে প্রত্যয় করিয়া তাঁহার সহায়তার আশায় অন্য আশ্রয় পরিত্যাগ করিয়াছে তাহার প্রতি সম্মানাভিমানীর কিরূপ অনুকম্পা করা উচিত সে বোধের লেশমাত্রও যদি তাঁহার থাকিত, তবে এই লিপি লিখিয়া আজ আমাকে আমার লেখনী কলঙ্কিত করিতে হইত না।

মন্ত্রণা-সভায় ফিলিপ ফ্র্যান্সিস্ যে অসচ্চরিত্র প্রকটন করিতেছেন, তাহা অন্যত্র অন্যান্য সকল বিষয়ে তাঁহার চরিত্রের অনুরূপ। উহার উপাদানে সত্য নাই, মহত্ত্ব নাই—মানাস্পদ কিছুই নাই। আমার এই কথা অতি কঠোর। কিন্তু আমি স্থিরচিত্তে বিশেষ বিবেচনা করিয়া ইহা বলিলাম। ইঁহার চরিত্রের জঘন্যতা সংযতভাষায় প্রকাশ করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও ইহার কম বলা অসম্ভব হইল। ভবিষ্যত ঐতিহাসিককে সত্যজ্ঞাপনার্থে, আমার নিজের প্রতি সুবিচারার্থে, এবং ভারতবর্ষে ইংরেজের এই তরুণ রাজ্যের কল্যাণার্থে আমি ফিলিপ-ফ্র্যান্সিসের চরিত্রের দোষ এইরূপে উদ্ঘাটন করিলাম। দেশের আইন যে দোষের দণ্ডবিধান করিতে পারে না, লোকচক্ষুরসমক্ষে উদ্ঘাটন করিয়া তাহার কৌৎসিত্য প্রদর্শন করাই তাহার একমাত্র শাস্তি।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ নিয়োগী

ভারতে পর্ত্তুগীজ

ইতিহাসাতীত যুগ হইতেই য়ুরোপের সহিত ভারতের বাণিজ্য-বিনিময় অব্যাহত-ভাবে চলিয়া আসিতেছে,—ইহা বর্ত্তমান সময়ে একরূপ অবিসম্বাদিত সত্য এবং আধুনিক যুগের প্রায় সকল সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিকই ইহা নতমস্তকে স্বীকার করিয়া লইতে প্রস্তুত।

১৮৬১ খৃঃ অব্দে ইংলণ্ডের অন্তঃপাতী কোন গ্রামে একখানি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হয়। উক্ত তাম্রশাসন পাঠে আমরা জানিতে পারি যে খৃঃ পূর্ব্ব প্রায় সার্দ্ধ-দ্বিসহস্র বৎসর পূর্ব্বে ভারতীয় বণিক্‌গণ বাণিজ্য-ব্যপদেশে ইংলণ্ডে গমনাগমন করিতেন (১)।

খৃষ্ট-জন্মের প্রায় দুইশত বৎসর পূর্ব্বে ভারতীয় নাবিকগণ ভারতীয় পণ্য-সম্ভার লইয়া জর্ম্মাণদেশে গমনাগমন করিতেন,—ইহাও তদ্দেশবাসিগণেরই উক্তি (২)।

ইতিহাসাতীত যুগ হইতে ভারতীয় বণিক্‌গণ অন্যান্য পণ্য-সম্ভারের সহিত য়ুরোপের অতি প্রয়োজনীয় নীল লইয়া জলপথে পারস্য-উপসাগর উত্তীর্ণ হইয়া স্থলপথে য়ুরোপে গমন করিত,—বীকম্যান (Beekman) প্রভৃতি স্বনামধন্য ঐতিহাসিকবর্গ এ মতের পরিপোষক (৩)।

খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে কুশনবংশীয় নরপতি ক্যাড্‌ফাইসিস্ দ্বিতীয় (Kadphisis II) ব্যাক্‌ট্রিয়া প্রদেশে রাজত্ব করিতেছিলেন। তৎকালে

(১) Asiatic Researches.

(২) 'যবদ্বীপে হিন্দু' হিতবাদী, চৈত্র, ১৩১৮।

(৩) Johnston's translation of Beekman's History of Inventions and Discoveries.

উক্ত সাম্রাজ্য সিন্ধুনদের দক্ষিণতট হইতে পারস্যের পূর্ব্বপ্রান্ত পর্য্যন্ত প্রসারিত ছিল। রোম-সাম্রাজ্যও তখন পারস্যের পশ্চিমপ্রান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কোন কোন লব্ধপ্রতিষ্ঠ ঐতিহাসিক মনে করেন, সাম্রাজ্য-দ্বয়ের এবম্প্রকার নৈকট্য উভয়ের মধ্যে বাণিজ্য-বিনিময় সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে সহায়তা করিয়াছিল।

এদেশ হইতে য়ুরোপে তখন নানাপ্রকার বেণেমস্‌লা, মূল্যবান্ প্রস্তর, নীল, কার্পাসসূত্র এবং অন্যান্য আবশ্যকীয় দ্রব্য প্রেরিত হইত।

এই সমস্ত অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রী-সম্ভারের পরিবর্ত্তে আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষগণ আনয়ন করিতেন শুধু মুদ্রা। ইহা হইতে কেহ কেহ অনুমান করেন যে, বর্ত্তমানকালে দারিদ্র্য-পীড়িত ভারতবর্ষ যেমন আপন আবশ্যকীয় দ্রব্যের নিমিত্ত বৈদেশিক বণিকৃগণের মুখাপেক্ষী, প্রাচীন কালে য়ুরোপও সেইরূপ সর্ব্বপ্রকার প্রয়োজনীয় সামগ্রী-সম্ভারের জন্য 'নিলিখ-শরণা' ভারতভূমির মুখাপেক্ষী ছিল।

ফাহিয়ানের ভারত-ভ্রমণ পাঠে আমরা জানিতে পারি যে, ভারতীয় নাবিকগণ মিশর হইতে ভূমধ্যসাগর অতিক্রমপূর্ব্বক য়ুরোপের নানা স্থানে বাণিজ্য করিত।

খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দী হইতে বাণিজ্যের প্রাচীন ধারা একটু পরিবর্ত্তিত হইল। আমরা এই সময়ে আরবগণকে য়ুরোপ ও ভারতের মধ্যবর্ত্তী (Intermediate) হইয়া বাণিজ্য করিতে দেখিয়াছি।

প্রাগুক্ত শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে আরব বণিকৃগণ দলে-দলে আগমন করতঃ কালীকটে উপনিবেশ স্থাপন করিতে লাগিল। তাহাদের মধ্যে যে সম্প্রদায় বাণিজ্য-প্রতিযোগিতায় অপর সম্প্রদায়গুলিকে পরাভূত করিয়াছিল; সেই সম্প্রদায়ই সাধারণ্যে 'মপলাই' নামে অভিহিত হইত। ভবিষ্যতে এই মপলাইগণই সমস্ত দক্ষিণ-ভারতে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল।

আরবদিগের আগমনকালে কালীকট দক্ষিণ-ভারতের সর্ব্বপ্রধান বাণিজ্য-কেন্দ্র ছিল। তথায় নানাস্থান হইতে বাণিজ্যরত বণিক্-সম্প্রদায় আসিয়া বাস করিত। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য-সম্ভার কালীকটে আহৃত হইয়া জলপথে আফ্রিকা, য়ুরোপ প্রভৃতি মহাদেশে প্রেরিত হইত। পর্ত্তুগীজগণের উন্নতি-অবনতির লীলাক্ষেত্র কালীকট, আজিও কত শত বৎসরের পর, তাহাদের অবিনশ্বর স্মৃতি বক্ষে ধারণ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। তাহাদের শত অমানুষ অত্যাচারেও কালীকট আপনার অস্তিত্ব হারাইয়া ফেলে নাই!!

নীলনদীর মোহনাস্থিত আলেক্‌জান্দ্রিয়া নগর তখন প্রাচ্য-প্রতীচ্য-বাণিজ্য-বিনিময়ের কেন্দ্রস্থল ছিল। এই স্থানে একদিকে যেমন য়ুরোপ হইতে তদ্দেশীয় পণ্য আনীত হইত; অন্যদিকেও সেইরূপ এদেশ হইতেও এতদ্দেশীয় পণ্য প্রেরিত হইত। মপলাইগণ কালীকট হইতে সুলভ মূল্যে এতদ্দেশীয় পণ্য ক্রয় করিয়া আলেক্‌জান্দ্রিয়া নগরীতে পূর্ব্ব-য়ুরোপের নিকট তৎসমুদায় অধিকতর মূল্যে বিক্রয় করিত। পূর্ব্ব-য়ুরোপের বণিক্‌গণ আলেক্‌জান্দ্রিয়া নগরীতে যে সমুদায় দ্রব্য বিক্রয় করিতে আনয়ন করিত, মপলাইগণ কর্ত্তৃক তাহা কালীকটে আনীত হইয়া ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে প্রেরিত হইত।

এই যুগে কালীকট হইতে য়ুরোপে স্বর্ণ, তাম্র, পারদ, নীল, রেশম, বহুমূল্য প্রস্তর, গজদন্ত, কৌস্তুরী প্রভৃতি প্রেরিত হইত। পূর্ব্ব-য়ুরোপের বণিক্‌গণ এই সমুদায় দ্রব্য আরও অধিকতর মূল্যে পশ্চিম-য়ুরোপের নিকট বিক্রয় করিত। ভারত ও য়ুরোপের মধ্যে সপ্তম শতাব্দীতে, এইরূপে অপ্রত্যক্ষ (Indirect) বাণিজ্যের সূত্রপাত হইয়াছিল।

আরব-বণিক্‌গণ দুইভাবে বাণিজ্য করিতেছিল। প্রথমতঃ পারস্য, আফগানিস্থান, এশিয়া-মাইনরের মধ্য দিয়া স্থলপথে—দ্বিতীয়তঃ আরব-

সাগর, লোহিতসাগর অতিক্রম করিয়া মিশরের মাঝখান দিয়া ভূমধ্যসাগর উত্তীর্ণ হইয়া জলপথে।

খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ভারতীয় নাবিকগণ পণ্য-পরিপূর্ণ তরণী লইয়া য়ুরোপে বাণিজ্য করিতে যাইত, কিন্তু য়ুরোপীয় বণিক্‌গণ তখনও ভারতে বাণিজ্য করিতে আগমন করে নাই। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর পর হইত পণ্য-পূরিপূর্ণ রোমক-তরণী সপ্তগ্রাম প্রভৃতি বন্দরে দৃষ্ট হইত—ইহা অনেকেই অবগত আছেন।

সপ্তম শতাব্দীর পূর্ব্বে যে সমুদায় য়ুরোপবাসী ভারতবর্ষে পদার্পণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের কেহ বা অদম্য বিজয়-বাসনা চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত, আর কেহ বা নদী-নির্ঝর-শোভিতা বর্ষীয়সী ভারতের অপর্য্যাপ্ত শোভা-সম্পদ্ সন্দর্শন করিবার জন্য।

এই সমস্ত অতৃপ্ত বিজিগীষু ও স্বেচ্ছাপর্য্যাটকগণ স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ভারতের অতুল ঐশ্বর্য্য ও অপরিচিত শোভাসম্পদের কাহিনী প্রচার করিতেন।

যাহা হউক, খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে আরবীয়-বণিক্‌গণ যখন এশিয়া ও য়ুরোপীয় বাণিজ্যে আপনাদের একাধিপত্য বিস্তার করিতেছিল, তখন পর্য্যাটক-মুখে ভারতের অতুল ঐশ্বর্য্যের কাহিনী শ্রবণ করিয়া বর্দ্ধিত-বাসন পশ্চিম-য়ুরোপীয় বণিক্‌গণের অন্তঃকরণে, ভারতের সহিত প্রত্যক্ষ-বাণিজ্য-সংস্থাপনের অত্যুচ্চ আশা ধীরে ধীরে জাগিয়া উঠিতেছিল।

ভারতের অতুল ঐশ্বর্য্য, কালীকটের বাণিজ্য-বহুলতা তাহাদিগকে ভারতের সহিত প্রত্যক্ষভাবে বাণিজ্য করিবার জন্য চুম্বকের মত আকর্ষণ করিতে লাগিল। এই দুর্নিবার আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া, পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে, দুঃসাহসী পর্ত্তুগীজগণ পর্ব্বতপ্রমাণ অন্তরায়ের সম্মুখীন হইয়াও

ভারত-অন্বেষণে বহির্গত হইয়াছিল, এবং বার-বার বিফল-মনোরথ হইলেও অসীম ধৈর্য্য-সহকারে সর্ব্বপ্রথম ভারতের পথ আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

ভারতের বিপুল ঐশ্বর্য্য ও বাণিজ্য-বহুলতার কথা অবগত হইয়া বাণিজ্য-লিপ্সু পর্ত্তুগীজগণ যখন ভারতে আগমন করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল, তখন অলক্ষিতে তাহাদিগের সম্মুখে একটি বিপুল বিঘ্ন আসিয়া দণ্ডায়মান হইল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে আরবীয় বণিক্‌গণ বাণিজ্যে আপনাদিগের একাধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল। স্থল-পথেই হউক আর জলপথেই হউক, তাহাদের অপরিসীম প্রভুত্ব চূর্ণ করিতে না পারিলে, তাহাদের সর্ব্বোন্নত মস্তক অবনত করিতে না পারিলে, পর্ত্তুগীজগণ ভারতের সহিত প্রত্যক্ষভাবে বাণিজ্য করিতে পারিবে না, ইহা তাহারা সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিল।

পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে আরব ও তুর্কীর বণিক্‌গণ সম্মিলিত হইয়া ভারত ও য়ুরোপের বাণিজ্যপথ অবরুদ্ধ করিয়াছিল। য়ুরোপীয় বণিক্‌গণ ইহাতে যথেষ্ট হতবুদ্ধি হইয়া পড়িল, তাহাদের বহুকাল সঞ্চিত উচ্চ-আশার মূলে কুঠারাঘাত হইল।

দুঃসাহসী পর্ত্তুগীজগণ ইহাতে হতবুদ্ধি হইয়া পড়িল ও ভারতের সহিত প্রত্যক্ষভাবে বাণিজ্য করিবার আশায় জলাঞ্জলি দিতে পারিল না। সমুদ্র-পথে অনাবিষ্কৃত নূতন পথ আবিষ্কার করিয়া, ভারতের সহিত প্রত্যক্ষ বাণিজ্যের জন্য পর্ত্তুগীজগণ কৃতসংকল্প হইল।

কলম্বসের জন্মের পূর্ব্বে, ১৪১৫ খৃঃ অব্দে পর্ত্তুগ্যালের রাজকুমার হেন্‌রী ভারত-অন্বেষণে আগমন করিয়া আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলে উপনীত হয়েন এবং এই স্থান হইতেই তিনি আফ্রিকার সর্ব্বদক্ষিণ অন্তরীপে গমন করিবার পন্থা নিরূপণ করিয়াছিলেন। তাঁহার দৃঢ়বিশ্বাস ছিল যে

একবার আফ্রিকার বিস্তীর্ণ ভূভাগ উত্তীর্ণ হইতে পারিলে ভারত-গমনের পথ সুগম হইবে।

হেন্‌রীর পর অলঞ্জো (Alonzo V) এবং তৎপর দ্বিতীয় জন (John II) স্বর্ণপ্রসূ ভারতভূমি আবিষ্কার করিবার জন্য অনন্য-সাধারণ চেষ্টা করিয়াছিলেন। অর্থের অসচ্ছলতা হেতু পর্ত্তুগ্যাল-নরপতি দ্বিতীয় জন অংশীদার জুটাইবার আশায় ঘোষণা করিলেন যে, যদি কেহ ভারত-অভিযানে অংশীদার হইতে ইচ্ছা করেন, তবে তাহাকে উপযুক্ত অর্থ, সৈন্য ও জলযান দ্বারা সাহায্য করিতে হইবে। অংশীদার না হইলে কেহই ভারত-বাণিজ্যের অংশ গ্রহণ করিতে পারিবেন না।

দ্বিতীয় জনের সকাতর অনুনয় অরণ্য-রোদনে পরিণত হইল। কেহই তাঁহার ঘোষণা-পত্র বিশ্বাসের সহিত গ্রহণ করিতে পারিলেন না। নিরুপায় জন ইহাতেও পশ্চাদ্‌পদ হইলেন না। তাঁহার অন্তরে ভারত-আবিষ্কারের যে অদম্য-আশা মুকুলিত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা তাঁহাকে কিছুতেই নিরস্ত হইতে দিল না। পোপের (Pope) নিকট হইতে সনন্দ গ্রহণ করিয়া এক বিরাট অভিযানের আয়োজন করিলেন। ডিগো (Diego Cam) এই অভিযানের অধিনায়কত্ব গ্রহণ করিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তিনি আফ্রিকার পশ্চিম-দক্ষিণ প্রান্ত হইতেই প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইলেন।

ইহাতেও জন হতোদ্যম হইয়া পড়িলেন না, বরং অধিকতর অধ্যবসায়ের সহিত পুনর্ব্বার বিপুল আয়োজন করিয়া বারথোলেমো উইয়াজ (Bartholemo Wiaz) নামক কোন সাহসী পর্ত্তুগীজকে ১৪৮৫ খৃঃ অব্দে ভারত-সন্ধানে প্রেরণ করিলেন। বারথোলেমো ডিগোর পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া ১৪৮৬ অব্দে আফ্রিকার দক্ষিণ উপকূল পর্য্যন্ত আগমন করিয়াছিলেন। এই স্থানে দৈব তাহার প্রতিকূল হইল,—অবিচ্ছিন্ন বারিবর্ষণ ও প্রবল বাত্যায় বারথোলেমোর জলযানগুলি বিধ্বস্ত হইতে লাগিল। এই

দুর্দ্দিনে নাবিকগণ অপরিজ্ঞাত সাগরে জলযান চালনা করিতে অসম্মত হইল। নিতান্ত অনিচ্ছায় নিরুপায় বারথোলেমো স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইলেন। প্রবল-বাত্যা-বিতাড়িত হইয়া ভগ্নাশ ও হতোদ্যম বারথোলেমো যে অন্তরীপ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, তিনি তাহাকে 'Cape of Storms' নামে অভিহিত করেন।

বারথোলেমোর ব্যর্থ অভিযানের এক বৎসর পরে, ১৪৮৭ খৃঃ অব্দে Covilham নামক কোন দুঃসাহসী পর্ত্তুগীজ বীর অশেষ বিপৎপাত ও প্রবল অন্তরায় পদদলিত করিয়া স্থলপথে পারস্য-উপসাগরের পশ্চিম প্রান্ত পর্য্যন্ত আগমন করেন এবং তথা হইতে আরবীয় অর্ণবপোতে আরোহণ করিয়া কালীকটে উপনীত হয়েন। কেহ কেহ বলেন Covilham ডিগোর অধিনায়কত্বে আফ্রিকার পশ্চিম উপকূল পর্য্যন্ত আগমন করিয়াছিলেন। তাহার পর ডিগো (Diego Cam) যখন ভারতীয়-ভৈষজ্য-বিক্রেতৃ ভেনিস বণিক্‌গণের অনুসন্ধানার্থ লোক প্রেরণ করেন, তখন কভিলহাম (*Pedro de Covilham*) বহু পরিশ্রমে ও অক্লান্ত অনুসন্ধানে ঐশ্বর্য্যময় ভারতের উর্ব্বর সৈকতে উপনীত হয়েন। যাহা হউক, আমরা বহু অনুসন্ধানেও তাহার ঘটনা-বহুল জীবনের লুপ্তকাহিনী উদ্‌ঘাটিত করিতে পারি নাই।

পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে পর্ত্তুগীজগণ ভারত-অন্বেষণের জন্য যে অক্লান্ত চেষ্টা ও বিপুল আয়োজন করিতেছিল, তাহার ফলে উক্ত শতাব্দীর শেষভাগে তাহারা আফ্রিকার স্বর্ণ-উপকূলের সহিত মৃদু মন্দ-ভাবে বাণিজ্য করিতে আরম্ভ করিয়াছিল।

কভিলহামের ভারত-আগমনের পাঁচ বৎসর পরে, ১৪৯২ খৃঃ অব্দে খৃষ্টোফার কলম্বস্ (Christopher Colombus) স্পেনের জাতীয় পতাকা উড্ডীয়মান করিয়া ভারত-অন্বেষণে বহির্গত হইয়াছিলেন। এই

অভিযানের ফলে স্বর্ণপ্রসূ ভারত-ভূমি আবিষ্কৃত না হইলেও সম্পূর্ণ এক অভিনব মহাদেশ আবিষ্কৃত হইয়াছিল। বিপুল আনন্দে ও বিস্ময়োল্লাসে কলম্বসের ফলপ্রসূ প্রত্যাবর্ত্তন অভিনন্দিত হইল।

কলম্বসের সার্থক অভিযানের পাঁচ বৎসর পরে, ১৪৯৭ খৃঃ অব্দে এনামুয়েল (Enamuel) পর্ত্তুগীজরাজ-সিংহাসনে অধিরূঢ় হইলেন। রাজ-সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া ভারতবর্ষের সহিত প্রত্যক্ষ বাণিজ্য-সংস্থাপন করিবার জন্য তিনখানি জলযান সুসজ্জিত করিয়া তিনি যে বিরাট-অভিযানের আয়োজন করিলেন, ভাস্কোদাগামা (Vascodegama) নামক একজন বিচক্ষণ পর্ত্তুগীজ বীরপুরুষকে তাহার নেতৃত্বপদে বরণ করা হইয়াছিল। ১৪৯৭ খৃঃ অব্দে লিসবন্ হইতে যাত্রা করিয়া ভাস্কোদা-গামা বহু কষ্টে আফ্রিকার দক্ষিণ উপকূলে আসিয়া উপনীত হইলেন। বারথোলেমো ভগ্নাশ হইয়া আফ্রিকার যে উপকূল হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, সেই অন্তরীপে আগমন করিয়া গামার আশার সঞ্চার হইল। তিনি তথায় কতকগুলি ভারতীয় বণিকের সাক্ষাৎ লাভ করেন এবং তাহাদের নিকট হইতে ভারতসম্বন্ধীয় অনেক তথ্যের আবিষ্কার করিয়া কৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ 'Cape of Storm' নাম পরিবর্ত্তিত করিয়া উহাকে উত্তমাশা বা Cape of Goodhope নামে অভিহিত করেন। আজি প্রায় চারি শতাব্দী পরেও উহা ঐ নামেই অভিহিত হইয়া বিশ্ব-সমক্ষে গামার অসমসাহসের অপূর্ব্বকাহিনী স্মরণ করাইয়া দিতেছে।

উত্তমাশা অন্তরীপ হইতে উত্তর-পূর্ব্বাভিমুখে যাত্রা করিয়া ১৪৯৮ খৃঃ অব্দের ২০শে মে তারিখ গামা কালীকটে উপনীত হইলেন। আশাহীন কার্য্যে (desperate services) নিযুক্ত করিবার নিমিত্ত গামার সহিত একজন লোক ছিল। কালীকটে উপনীত হইয়া গামা তাহাকে

উপকূলে প্রেরণ করেন। কিন্তু এতদ্দেশীয় ভাষা হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারায়, উক্ত লোকটী বন্দী হইয়া টিউনিসের (Tunis) কোন মুর-ভবনে নীত হইল। গৃহ-স্বামী স্পেন ও পর্ত্তুগ্যালের ভাষায় বিলক্ষণ কথোপকথন করিতে পারিতেন। তিনি গামার জলযানের সমীপবর্ত্তী হইয়া আপনার তরণী হইতে পর্ত্তুগীজ ভাষায় চীৎকার করিয়া বলিলেন,—'আপনাদের সৌভাগ্যবশতঃই আপনারা এই মণিমুক্তাগর্ভা ভারতে পদার্পণ করিয়াছেন। বেনেমশলা ও ভৈষজ্যদ্রব্য, বহু মূল্য প্রস্তর ও মণিমুক্তা এবং জগতের যাবতীয় ঐশ্বর্য্যের আকরভূমি এই ভারতবর্ষে পদার্পণহেতু আপনারা জগৎপিতা পরমেশ্বরকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপন করুন।' দ্বিভাষীর (Interpreter) সহিত এই সাক্ষাৎকারে পর্ত্তুগীজগণের অন্তঃকরণ বিপুল পুলকে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল! তাহারা অকূল সমুদ্রে কূল পাইলেন !!

গামা মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব না করিয়া স্থানীয় শাসনকর্ত্তা জামোরীণের নিকট আপনাদের আগমন-সংবাদ প্রেরণ করিলেন। তিনি তখন রাজধানী হইতে কিয়দ্দূরে অবস্থান করিতেছিলেন। ইত্যবসরে গামা কোন নিরাপদ স্থানে আপনাদের জলযানগুলি 'নঙ্গর' করিলেন।

২৮শে মে দ্বাদশ জন অনুচর পরিবৃত হইয়া গামা জামোরীণদর্শনে যাত্রা করিলেন। 'পাল্কী' আরোহণ করিয়াও বৃহৎ জনতা-পরিবেষ্টিত হইয়া গামা উৎকণ্ঠ-চিত্তে জামোরীণের রাজধানী পনিয়ানিতে (Poniany) উপনীত হইলেন। জামোরীণের অতুল-ঐশ্বর্য্য, অপর্য্যাপ্ত ধন-সম্পদ এবং চাকচিক্যময় হর্ম্ম্যাবলী সন্দর্শন করিয়া গামা ও তাঁহার অনুচরবর্গ বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইল!

আদর-আপ্যায়ন সমাপ্ত হইলে গামা ও তাঁহার অনুচরবর্গ একটি নির্জ্জনগৃহে জামোরীণের সহিত সাক্ষাৎকার করিয়া সবিস্তারে আপনাদের

আগমনের কারণ বিবৃত করিলেন। জামোরীণও ঔৎসুক্য ও আনন্দের সহিত তাঁহাদের বিবরণ শ্রবণ করিতে লাগিলেন।

পরদিবস পর্ত্তুগীজগণ জামোরীণকে চারিখানি রক্তবস্ত্র, ছয়টি টুপী, চারিটি প্রবাল, কতকগুলি ব্রাস, একবস্তা চিনি, দুই পিপা তৈল এবং এক পিপা মধু উপঢৌকন প্রদান করিলেন। জামোরীণের অতুল-ঐশ্বর্য্যের নিকট এ উপহার নিতান্ত তুচ্ছ হইলেও তিনি অত্যন্ত সন্তুষ্টচিত্তে বিদেশীর উপঢৌকন গ্রহণ করিয়াছিলেন।

পর্ত্তুগ্যাল-নরপতি জামোরীণের নিকট কয়েকখানি পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন। পত্রগুলির মধ্যে একখানি আরবীয় ভাষায় লিখিত হইয়াছিল। জামোরীণ তাহা সসম্ভ্রমে গ্রহণ করিয়া গামাকে বাণিজ্য করিবার আদেশ প্রদান করিলেন।

যে মপলাই-বণিক্‌গণ কালীকটের বাণিজ্যে আপনাদিগের একাধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল, তাহাদিগেরই সহিত পর্ত্তুগীজগণের প্রথম কোন্দল আরব্ধ হইল। পর্ত্তুগীজগণকে আপনাদের বিপুল স্বার্থের বিষম অন্তরায় মনে করিয়া তাহারা জামোরীণের নিকট তাহাদিগের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করিল—তাহাদিগকে নানাপ্রকারে উৎপীড়ন করিতে লাগিল।

মপলাইদিগের অত্যাচারে কালীকট বিপৎসঙ্কুল মনে করিয়া গামা-প্রমুখ পর্ত্তুগীজগণ আপনাদিগের স্বদেশজাত নগণ্য পণ্যদ্রব্যের বিনিময়ে বহুমূল্য ভারতীয় পণ্যসম্ভার সংগ্রহ করিয়া অর্দ্ধবৎসর অবস্থানের পর কালীকট পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কোন কোন ঐতি-হাসিক বলেন যে, কালীকট পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বে মপলাইগণকর্ত্তৃক গামাকে কঠোর যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইয়াছিল। অনুকূল সমীরণসংযোগে গামা ১৪৯৯ খৃঃ অব্দের সেপ্টেম্বর মাসে স্বদেশে উপনীত হইয়াছিলেন। জামোরীণ গামার সহিত পর্ত্তুগীজ নরপতির নিকট একখানি পত্র প্রেরণ

করিয়াছিলেন। অনেক ঐতিহাসিকের বিশ্বাস, জামোরীণের অত্যাচারেই গামা এদেশ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। প্রাগুক্ত পত্রপাঠে পাঠকের সে বিশ্বাস অপনোদিত হইবে, এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া আমরা পত্রখানি উদ্ধৃত করিবার প্রলোভন সংবরণ করিতে পারিলাম না। পত্রখানি এইরূপ,—'Vasco de Gama, a nobleman of your household has visited my kingdom and has given me great pleasure. In my kingdom, there is abundance of cinnomon, cloves, ginger, pepper and precious stones what I seek from thy kingdom is gold, silver, coral and scarlet' অর্থাৎ 'আপনাদের দেশের, ভাস্কোদাগামা নামক জনৈক সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক আমার সাম্রাজ্য পরিদর্শন করিয়া আমাকে বিমল আনন্দ প্রদান করিয়াছেন। আমাদের দেশে দারুচিনি, লবঙ্গ, আদা, লঙ্কা, বহুমূল্য প্রস্তর প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। আমি আপনাদিগের দেশ হইতে স্বর্ণ, রৌপ্য, প্রবাল ও রক্তবস্ত্র চাই।'

লিসবন নগরে কলম্বসের প্রত্যাগমন যেমন মহাসমারোহে অভিনন্দিত হইয়াছিল, গামার প্রত্যাগমনও সেইরূপ বিপুল উৎসব ও জাতীয় বিজয়-উল্লাসে সুসম্পন্ন হইল। স্পেন-পর্ত্তুগালের দিগ্‌দিগন্তে আনন্দধ্বনি পড়িয়া গেল। পর্ত্তুগীজগণ ভারতে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার অলীক-কল্পনায় আত্মহারা হইয়া উঠিল।

গামা স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়া ভারতের সম্পদ্ ও ঐশ্বর্য্যের কাহিনী বর্ণনা করিয়া স্বদেশবাসিগণের হৃদয়ে অদম্য ঔৎসুক্য জাগাইয়া দিল। ইহার পর নবনব অভিযানে ভারতের পথ সুগম ও সহজসাধ্য হইয়া আসিল।

গামার স্বদেশে প্রত্যাগমনের পর বৎসর ফিরিতে না ফিরিতে রাজ্য-

লিস্বন্ পর্ত্তুগীজগণ পুনর্ব্বার এক বিরাট্ অভিযানের আয়োজন করিয়া পিড্রো অলভেরেস কেব্রাল (*Pedro* Alvares Cabral) নামক জনৈক সাহসী ও বুদ্ধিমান পর্ত্তুগীজ বীরকে উহার নেতৃত্বপদে বরণ করিলেন। ত্রয়োদশখানি অর্ণবপোতে দ্বাদশশত সৈন্য লইয়া কেব্রাল ১৫০০ খৃঃ অব্দের ৯ই মার্চ্চ ভারতঅভিমুখে যাত্রা করিলেন। ডিগো ও বারথোলেমো এবার কেব্রালের সঙ্গীরূপে আসিয়াছিলেন।

প্রতিকূল-পবনে বিতাড়িত হইয়া কেব্রাল ব্রাজিল আবিষ্কার করিলেন। এই স্থানে প্রবল-বাত্যায় বারথোলেমোর জলযানখানি আরোহী সমেত নিমজ্জিত হইল। প্রবল-বাত্যার অবসানে অবশিষ্ট জলযানগুলি অনুকূল বায়ুর সাহায্যে মেলিন্দায় (Melinda) আগমন করিয়া 'নঙ্গর' করিল। এই স্থান হইতে গুজরাট-নাবিকগণের পরিচালনায় পর্ত্তুগীজগণ ১৩ই সেপ্টেম্বর তারিখে কালীকটে আসিয়া উপনীত হইল।

গামা স্বদেশে প্রত্যাগমন করিবার সময় গোয়ার জলযানগুলির উপর অমানুষিক অত্যাচার করিয়া যান। মপলাইগণের প্ররোচনায় ও গামার কৃতঘ্নতায় জামোরীণ এবার আর পর্ত্তুগীজদিগকে আশ্রয় প্রদান করিতে সাহসী হইলেন না। মপলাইগণ একদিন সকলের অজ্ঞাতসারে পর্ত্তুগীজগণের কালীকটস্থিত কুঠী আক্রমণ করিয়া গুপ্তভাবে তাহার অধ্যক্ষ কোররিয়া (Ayres Correa)-কে নিহত করিয়া যায়।

ক্রুদ্ধ কেব্রাল ভয়ানকভাবে ইহার প্রতিশোধ লইয়াছিলেন। তিনি মপলাইগণের দশখানি জলযান অধিকার করিয়া, সমস্ত দ্রব্যসম্ভার আপনাদের জলযানে স্থানান্তরিত করেন ও তাহাদের অর্ণবপোতগুলি অগ্নিপ্রয়োগে ভস্মীভূত করিয়া ফেলেন। ইহার পর তিনি অনর্গল গোলাবর্ষণে নগরটির ধ্বংস-সাধন করিয়া কোচীন-অভিমুখে পলায়ন করেন।

কোচীনে পর্ত্তুগীজগণ সসম্ভ্রমে অভ্যর্থিত হইল। বাণিজ্যের জন্য সে

স্থানে তাহাদিগকে বিশেষ বেগ পাইতে হয় নাই। ইতোমধ্যে জামোরীণ পঞ্চদশ সহস্র সৈন্য সমেত ২৫।৩০ খানি জলযান সুসজ্জিত করিয়া কেব্রালের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন।

কেব্রাল কোচীন হইতে ক্যানানোর (Cannanore) অভিমুখে পলায়ন করিলেন এবং তথায় এতদ্দেশীয় দ্রব্যসম্ভারে আপনাদের জলযান-গুলি পরিপূর্ণ করিয়া ১৫০১ খৃঃ ৩১শে জুলাই স্বদেশে উপনীত হইলেন।

কেব্রালের স্বদেশে পদার্পণের পূর্ব্বেই তিনখানি জলযান নুয়েভার (Juan de Nueva) অধিনায়কত্বে ভারত অভিমুখে যাত্রা করিয়া গোয়ার নিকটবর্ত্তী অঞ্চিদ্বীপে (Anchideva) প্রবেশ করে, এবং তথা হইতে পুনর্ব্বার যাত্রা করিয়া কোচীনে উপনীত হইল। কোচীনরাজ কোচীনস্থিত পর্ত্তুগীজগণের সহিত সদয় ব্যবহার করিতেছিলেন, ক্যানানোর-অধিপতিও নুয়েভাকে ধারে লঙ্কা, লবঙ্গ প্রভৃতি আপন দ্রব্য-সম্ভার প্রদান করিয়া তৎপ্রতি সহানুভূতির পরিচয় প্রদান করিয়া-ছিলেন।

জামোরীণ তখনও গামা ও কেব্রালের অপ্রত্যাশিত ব্যবহার ভুলিতে পারেন নাই। তাঁহার অন্তর নিরন্তরই প্রতিহিংসানলে দগ্ধ হইতেছিল। কোচীনে নুয়েভার সৌভাগ্য-সূত্রপাত অবলোকন করিয়া তিনি তাঁহার বিরুদ্ধে এক বিপুল বাহিনী প্রেরণ করেন। নুয়েভার সাহসী ও সুশিক্ষিত সৈন্যের নিকট জামোরীণ-সৈন্য পরাজিত হইল। ইহার পর জামোরীণ নুয়েভাকে আপন প্রাসাদে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন। বিশ্বাসঘাতকতার ভয়ে নুয়েভা নিমন্ত্রণ-গ্রহণে অসম্মত হইলেন এবং জল-যানগুলি এতদ্দেশীয় দ্রব্যসম্ভারে পূর্ণ করিয়া য়ুরোপ অভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

নুয়েভার স্বদেশপ্রত্যাগমনে পর্ত্তুগীজগণ ভারতের ঐশ্বর্য্য ও রাজ-

শক্তির সঠিক সংবাদ প্রাপ্ত হইল। ভারত হইতে মুসলমানগণের বাণিজ্য সমূলে উৎপাটিত করিয়া পর্ত্তুগীজবাণিজ্যের প্রতিষ্ঠা করাই পর্ত্তুগীজ বণিক্‌গণের একান্ত ইচ্ছা ছিল, এবং তাহারা ইহাও সম্যক্‌ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিল যে, পূর্ব্ব-অপেক্ষা বৃহৎ বৃহৎ অভিযান প্রেরিত না হইলে মুসলমান-বাণিজ্যের উচ্ছেদসাধন করা যাইবে না।

এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া পর্ত্তুগাল-নরপতি বিংশতি অর্ণবপোত-সংযোগে এক বিপুল নৌদল সংগৃহীত করিয়া কেব্রালকে উহার অধিনায়কত্বে বরণ করিতে চাহিলেন। কিন্তু কেব্রাল অসম্মত হওয়ায় গামা ঐ পদ গ্রহণ করিলেন এবং স্বীয় অনুজ ষ্টিফেন, (Stiphen) ও ভিন্সেণ্টোর (Vincento) সহিত সংমিলিত হইয়া ভারত-অভিমুখে ধাবমান হইলেন।

আফ্রিকার উপকূলে বাণিজ্যকুঠী সংস্থাপন করিয়া, এই সমস্ত জল-যান মেলিন্দায় একত্রিত হইল। যখন তাহারা ক্যানানোরের নিকটবর্ত্তী হইয়াছে, তখন একখানি মুসলমান অর্ণবপোত অগণিত মক্কাযাত্রী লইয়া মক্কা যাইতেছিল। দুর্দ্ধর্ষ পর্ত্তুগীজগণ অদ্ভুত রণ-কৌশলে ও বিপুল পরাক্রমে মুসলমান জলযানখানি অধিকার করিল। মক্কাযাত্রী মুসলমান-গণের উপর যে বিষম অত্যাচার অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহা সহজে বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। শিশুযাত্রিদিগকে বন্দী করিয়া পর্ত্তুগীজ জল-যানে প্রেরণ করা হইল। পর্ত্তুগীজগণের অত্যাচারে তাহারা খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। বন্দী যাত্রী ও নাবিকগণকে মুসল-মান অর্ণবপোতে অবরুদ্ধ করিয়া অগ্নিসংযোগে ভস্মীভূত করা হইল। হায়, ধর্ম্মনিষ্ঠ মুসলমানগণের অন্তিম অভিশাপেই বুঝি এত শীঘ্র ভারত হইতে পর্ত্তুগীজগণের প্রভুত্ব বিলুপ্ত হইয়াছিল।

দুইশত ধর্ম্মনিষ্ঠ মুসলমানকে অগ্নিদগ্ধ করিয়া গামা, কালীকট উচ্ছেদ-

সাধন-মানসে ক্যানানোর ও কোচীনের নরপতি ও কুইনলনের সাম্রাজ্ঞীর সহিত সংমিলিত হইয়া কালীকট অভিমুখে ধাবিত হইলেন।

কালীকটের নিকটবর্ত্তী স্থান হইতে কতকগুলি ধীবরকে বন্দী করিয়া গামা জামোরীণের নিকট সংবাদ প্রেরণ করিলেন যে, যদি তাহাদিগকে কালীকটে উপনিবেশ স্থাপন করিবার অনুমতি প্রদান না করা হয়, তবে অচিরেই বন্দীদিগকে নিষ্ঠুরতার সহিত নিহত করা হইবে। জামোরীণের নিকট হইতে উত্তর আসিবার প্রতীক্ষা না করিয়াই গামা বন্দী ধীবর-দিগকে নিহত করিলেন এবং তাহাদের ছিন্নমস্তক ও ছিন্ন চরণ জামোরীণ-সকাশে প্রেরণ করিলেন। ইহার পর তিনি অগ্নি-সংযোগে নগর ভস্মীভূত করিলেন, অধিবাসিগণের যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিলেন এবং মুসলমান বাণিজ্য-তরণী সকল করায়ত্ত করিয়া কোচীন অভিমুখে পলায়ন করিলেন।

বিবাদ নিষ্পত্তি করিবার জন্য জামোরীণ গামাকে আহ্বান করিয়া পাঠাইলেন। অর্দ্ধপথে জামোরীণের বিশ্বাসঘাতকতা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়া গামা ১৫০৩ খৃঃ অব্দের ২০শে ডিসেম্বর য়ুরোপ-অভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

য়ুরোপে প্রত্যাগমন করিবার পূর্ব্বেই তিনি কোচীন ও ক্যানানোর নরপতিগণের সহিত বন্ধুত্ব-সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন এবং ভিন্সেণ্টোকে কোচীন ক্যানানোরস্থিত পর্ত্তুগীজ বাণিজ্যকুঠীর অধ্যক্ষরূপে নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

গামার পলায়নে সুযোগ বুঝিয়া, জামোরীণ কোচীনরাজ্যের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিলেন এবং পর্ত্তুগীজগণকে আপনার হস্তে অর্পণ করিতে আদেশ প্রদান করিলেন। কোচীনরাজ অদম্য উৎসাহে যুদ্ধ করিলেন। ভিন্সেণ্টো আপনার সৈন্য-সামন্ত লইয়া সমুদ্রবক্ষে অবস্থান করিতেছিলেন, তিনি কোন পক্ষে যোগ দেওয়া অভিপ্রেত মনে করিলেন না। ইতোমধ্যে

আলবুকার্ক (Alonzo Albuquerque) ফ্রানসিস্কো (Fransisco) এবং আণ্টোনিয়া নামক তিনজন দুর্দ্ধর্ষ পর্ত্তুগীজের অধিনায়কত্বে ৯ খানি সৈন্য-পরিপূর্ণ জলযান আসিয়া যুদ্ধস্থানে উপস্থিত হইল। পর্ত্তুগীজ-সৈন্যের আগমনে হতাশ-কোচীনরাজ ট্র্যাম্পারার (Triampara) অন্তঃকরণে আশার সঞ্চার হইল। জামোরীণের সৈন্য পর্ত্তুগীজগণের প্রচণ্ড আক্রমণ-সহ্য করিতে পারিল না। জামোরীণ পরাজিত হইয়া সন্ধি করিতে বাধ্য হইলেন।

পর্ত্তুগীজগণের ব্যবহারে সন্তুষ্ট হইয়া কোচিন-রাজ তাহাদিগকে দুর্গ নির্ম্মাণ করিতে আদেশ প্রদান করিলেন। এই আদেশ অনুসারে পর্ত্তুগীজগণ কুইনলনে (Quinlon) একটী সুরক্ষিত ও অভেদ্য কুঠী নির্ম্মাণ করিলেন।

এই সময়ে পেচিকো (Duarte *Pacheco*) নামক কোন সাহসী পর্ত্তুগীজকে কোচীন-কুঠীতে স্থাপন করিয়া আলবুকার্ক প্রভৃতি পর্ত্তুগীজ-বীরগণ স্বদেশাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

সুযোগ বুঝিয়া জামোরীণ ৫০,০০০ সৈন্য সমভিব্যাহারে কোচিন আক্রমণ করিলেন। কোচীনরাজ প্রমাদ গণিলেন! তাঁহার সমস্ত আশা-ভরসা অন্তর্হিত হইল!!

এই দুর্দ্দিনে পেচিকো আপনার অলৌকিক বীরত্বের প্রকৃষ্ট পরিচয় প্রদান করিলেন। অল্পমাত্র সৈন্য লইয়া পেচিকো জামোরীণের বিপুল বাহিনী পরাজিত করিলেন। হতাবশিষ্ট ৩২০০০ সৈন্য লইয়া জামোরীণ পলায়ন করিলেন।

ইতোমধ্যে ত্রয়োদশখানি জলযানের অধিনায়করূপে সোয়ারেজ (Lope Soarez) কালীকট অবরোধ করিলেন, আপনার সমস্ত প্রার্থনা পুর্ণ করাইয়া লইলেন।

ইহার পর জামোরীণের সপ্তদশখানি অর্ণবযান বলপূর্ব্বক কাড়িয়া লইয়া সোয়ারেজ ১৫০৬ খৃঃ ২২শে জুলাই য়ুরোপ অভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

১৫০৭ খৃঃ ফ্রান্সিস আলমিডা (Don Franseis Almeida) ভারতের রাজপ্রতিনিধিরূপে দ্বাবিংশখানি অর্ণবযান ও পঞ্চদশসহস্র সৈন্যের অধিনায়করূপে ভারত-অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

গোয়ার নিকটবর্ত্তী অঞ্জিদ্বীপে একটী সুরক্ষিত দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া, ট্র্যাম্পারার জন্য রত্নখচিত স্বর্ণময়-রাজমুকুট লইয়া তিনি কোচীন অভিমুখে ধাবমান হইলেন। কোচীনরাজ ট্র্যাম্পারা রাজকার্য্য হইতে ইতোমধ্যে অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন। তৎস্থানে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র অভিষিক্ত হইয়াছিলেন।

অকস্মাৎ আসন্ন বিপদে পর্ত্তুগীজগণের ভাগ্য-গগন মেঘাচ্ছন্ন হইল। সমস্ত দেশীয় রাজন্যবৃন্দ সংমিলিত হইয়া পর্ত্তুগীজদিগের উচ্ছেদ-সাধনে বদ্ধপরিকর হইলেন। চৌলের (Choule) নিকট উভয়-পক্ষীয় সৈন্যের সংঘর্ষ হইল। একশত নাবিক সমভিব্যাহারে পর্ত্তুগীজ-সেনাপতি আলমিডা (Lorengo Almeida—Franseisএর পুত্র) দেশীয় রাজন্যবৃন্দের হস্তে বন্দী ও নিহত হইলেন। পর্ত্তুগীজগণের সৌভাগ্য-রবি ক্ষণকালের জন্য মেঘম্লান হইল !!

১৫০৯ খৃঃ ২রা ফেব্রুয়ারী পর্ত্তুগীজগণের সহিত মিসরবাসী ও মপলাইগণের সহিত ডিউ দ্বীপের নিকট এক বিষম যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধে মপলাইগণ ও মিসরবাসিগণ সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত ও পরাজিত হইয়াছিল।

ইহার পর আলবুকার্ক পর্ত্তুগীজ-ভারতের শাসনকর্ত্তা হইয়া আসিলেন। ইহার সময় পর্ত্তুগীজ-ভারত উন্নতির অত্যুচ্চ সীমায় আরোহণ করিয়াছিল।

১৫০৯ খৃঃ অব্দে কণ্টিন্‌হো (Marshal Don Fernando Continho) কালীকট আক্রমণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার মনোরথ সিদ্ধ হয় নাই। কণ্টিনহোর ব্যর্থ আক্রমণ সার্থক করিবার অভিপ্রায়ে আলবুকার্ক এ বৎসরই তিন সহস্র সৈন্য লইয়া কালীকট আক্রমণ করিলেন। পর্ত্তুগীজ-সৈন্যগণ অগ্নিসংযোগে নগরটী ধ্বংসীভূত করিয়া ফেলিল। জামোরীণের ঐশ্বর্য্যপরিপূর্ণ রাজপ্রাসাদ লুণ্ঠিত হইল। উপায়ান্তর না দেখিয়া জামোরীণ পলায়নপর নায়র-সৈন্য একত্র করিয়া হুহুঙ্কারে শত্রুসৈন্যের উপর পড়িল। রণোন্মত্ত দুর্দ্ধর্ষ নায়র-সৈন্যগণের সম্মুখে পর্ত্তুগীজগণ স্থির থাকিতে পারিল না। আলবুকার্ক স্বয়ং গুরুতররূপে আহত হইলেন। পর্ত্তুগীজ-সৈন্যগণ ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল।

১৫১১ খৃঃ অব্দে ইস্‌মাইল আদিলখাঁর সুযোগ্য সেনাপতি কমল খাঁ গোয়া অধিকার করেন। গোয়ার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য ও বাণিজ্যের উপকারিতা হৃদয়ঙ্গম করিয়া আলবুকার্ক উহা পুনর্গ্রহণ করিতে মনস্থ করেন।

এইরূপ মনস্থ করিয়া আলবুকার্ক অকস্মাৎ একদিন অগণিত সৈন্য-সমভিব্যাহারে গোয়া অবরোধ ও অধিকার করিলেন। ইহার অল্পদিন পরেই তিনি গোয়াকে পর্ত্তুগীজ-ভারতের রাজধানী বলিয়া ঘোষণা করিলেন। চারিশত বৎসর পর আজিও গোয়া পর্ত্তুগীজ-ভারতের রাজধানীরূপে বিদ্যমান থাকিয়া আলবুকার্কের কীর্ত্তি উদ্‌ঘোষিত করিতেছে।

১৫১৪ খৃঃ অব্দে আলবুকার্ক অরমজ্ (Ormoz) অধিকার করেন ও তথায় একটী সুদৃঢ় দুর্গ নির্ম্মাণ করেন।

অরমজ অধিকারের এক বৎসর পরে ১৫১৫ খৃঃ অব্দের ১৬ই ডিসেম্বর আলবুকার্ক মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন।

আলবুকার্ক আপনার অসাধারণ বীরত্বে ও অধ্যবসায়ে স্বজাতির গৌরব বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন—ভারতমহাসাগরে পর্ত্তুগীজ-প্রভুত্ব বিস্তৃত করিয়াছিলেন।

আলবুকার্কের পরবর্ত্তী শাসনকর্ত্তা সোয়ারেজ (Lopé Sourez) আদন অধিকার করিবার নিমিত্ত একদল সৈন্য পরিচালনা করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাহার চেষ্টা সার্থক হয় নাই।

১৫১৭ খৃঃ অব্দে ফার্ণাণ্ডো (Fernando *Perez* de Andrada) কাণ্টনে উপনীত হইয়া চীনের সহিত য়ুরোপের প্রথম বাণিজ্য-সম্বন্ধ সংস্থাপিত করেন।

১৫২১ খৃঃ অব্দে ডিগো লোপেজ (Diego Lopez) চল্লিশখানি জলযান ও ৩০০০ সৈন্য লইয়া ডিউ দ্বীপ-অভিমুখে গমন করেন। ডিউ দ্বীপে উপনীত হইয়া তিনি তত্রস্থ শাসনকর্ত্তার নিকট একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করিবার আদেশ প্রার্থনা করিলেন, কিন্তু প্রত্যাখ্যাত হইয়া যখন ফিরিয়া আসিতেছিলেন, তখন মালিক ইয়াজ নামক জনৈক সাহসী সেনাপতি তাঁহার নিকট হইতে একখানি জলযান কাড়িয়া লয়েন।

১৫২৪ খৃঃ অব্দে গামা তৃতীয়বার পর্ত্তুগীজ-ভারতের শাসনকর্ত্তা হইয়া আসিলেন, কিন্তু মাত্র তিনমাসকাল শাসন করিবার পর কোচীনে দেহত্যাগ করেন।

১৫০০ খৃঃ অব্দ হইতে ১৬০০ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত পর্ত্তুগীজগণ এশিয়ার বাণিজ্যে সম্পূর্ণরূপে একাধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল। 'তাহারা জাপান হইতে উত্তমাশা অন্তরীপ পর্য্যন্ত ভূভাগের একমাত্র শাসনকর্ত্তা ছিলেন।'

প্রাচ্যমহাদেশে তাহাদের এইরূপ বিপুল প্রভাব পরিলক্ষিত হইলেও এরূপ বিস্তৃত সাম্রাজ্য রক্ষা করিবার জন্য যে অপরাজেয় রাজশক্তি এবং

নৈতিক-চরিত্রের প্রয়োজন, তাহা তাহাদিগের ছিল না। খৃষ্টান-ধর্ম্মে তাহাদিগের অবিচল রক্ষণশীলতা বিধর্ম্মীদিগকে তাহাদের শত্রুরূপে পরিগণিত করিয়াছিল। যাঁহারা পর্ত্তুগীজ-ভারতের তাৎকালিক ইতিবৃত্ত অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন, পর্ত্তুগীজগণ কিরূপ কুসংস্কারাপন্ন ও নিষ্ঠুর ছিল। তাহাদিগের নির্ম্মম নিষ্ঠুরতায় ভারত-ইতিহাসের কত পৃষ্ঠা যে মসী-নিন্দিত হইয়া রহিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। পর্ত্তুগীজ-শাসনকর্ত্তৃগণের মধ্যে একমাত্র আলবুকার্কই এদেশবাসিগণের মঙ্গল-সাধনে তৎপর ছিলেন। একমাত্র তিনিই দেশীয় নরপতিগণের সহিত সখ্যতা সংস্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার ন্যায়পরায়ণতা ও সুবিচারে রাজ্যলক্ষ্মী একদিকে যেমন তাঁহাকে কৃপা করিতেন, তাঁহার অতুলনীয় সাহস ও প্রোজ্জ্বল প্রতিভায় বিজয়-লক্ষ্মীও তেমনই তাঁহার কণ্ঠদেশে জয়মাল্য পরাইয়া দিয়াছিলেন। পর্ত্তুগীজগণের মধ্যে একমাত্র তিনিই এদেশবাসিগণের আন্তরিক প্রীতি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। গোয়ার হিন্দুগণ এমন কি মুসলমানগণও আলবুকার্কের মৃত্যুর পর তাঁহার জীর্ণ সমাধির পুনঃসংস্কার করিয়া যথার্থ কৃতজ্ঞতার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। আলবুকার্কের অযোগ্য উত্তরাধিকারী শাসনকর্ত্তৃগণ যখন গোয়ার হিন্দু-মুসলমানগণের উপর নির্য্যাতন করিতেছিলেন, তখন তাহারা তাহাদিগের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার নিমিত্ত আলবুকার্কের সমাধি-মন্দির-দুয়ারে নতজানু হইয়া ভগবান্‌কে প্রাণ ভরিয়া ডাকিত।

আলবুকার্কের উত্তরাধিকারিগণের মধ্যে যে সকলেই অযোগ্য উৎপীড়ক মাত্র ছিল—এমন কথা কেহ জোর করিয়া বলিতে পারে না। তাহাদিগের মধ্যেও কেহ কেহ ভারত-আকাশে সমুজ্জ্বল নক্ষত্রের ন্যায় প্রতিভাত হইত।

নুনো (Nuno da Cunho) ১৫২৪ খৃঃ অব্দ হইতে ১৫৩৮ খৃঃ অব্দ

পর্য্যন্ত পর্ত্তুগীজ-ভারতের শাসনকর্ত্তার পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তাহারই সময় পর্ত্তুগীজ-বণিক্‌গণ সর্ব্বপ্রথম বঙ্গদেশে বাণিজ্য করিবার জন্য গমন করে এবং রীতিমতভাবে বঙ্গদেশের সহিত বাণিজ্য করিতে প্রবৃত্ত হয়। এই সময়ে একটী বিশেষ ঘটনায় পর্ত্তুগীজগণের ভাগ্য-গগন সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিল। এবং এই ঘটনায় বঙ্গদেশে তাহাদের প্রতিপত্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

পর্ত্তুগীজগণ যখন বঙ্গদেশে পদার্পণ করিল, তখন বিজয়লক্ষ্মীর অনুগ্রহ-ভাজন সেরশাহ ধীরে ধীরে মস্তক উন্নত করিয়া দাঁড়াইতেছিলেন। অদ্ভুত-কর্ম্মা ও অনন্য-সাধারণ যোদ্ধা সেরশাহ যখন সদলবলে বঙ্গদেশ আক্রমণ করিলেন, তখন বঙ্গদেশের আফ্‌গানবংশীয় স্বাধীন নরপতি বড়ই প্রমাদ গণিলেন।

তিনি পূর্ব্ব হইতেই পর্ত্তুগীজগণের সাহসিকতা ও বীরত্বের-কাহিনী অবগত ছিলেন। এ দুর্দ্দিনে পর্ত্তুগীজগণের শরণাপন্ন হওয়া অপেক্ষা তিনি আর কোন উপায় দেখিলেন না। পর্ত্তুগীজগণও এ স্বর্ণসুযোগ পরিত্যাগ করিল না। তাহারা অচিরে বঙ্গাধিপের সাহায্যার্থ ৫০০ সৈন্য প্রেরণ করিল। পর্ত্তুগীজদিগের কৃপায় বঙ্গেশ সে যাত্রা অব্যাহতি লাভ করিলেন।

কৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ বঙ্গেশ পর্ত্তুগীজগণকে বঙ্গের কতিপয় স্থানে বাণিজ্যাবাস নির্ম্মাণ করিবার অনুমতি প্রদান করিলেন। এই আদেশ-অনুসারে বঙ্গদেশের যে সমুদায় স্থানে বাণিজ্যাবাস নির্ম্মিত হইয়াছিল, হুগলি তাহাদিগের অন্যতম।

যাহা হউক, ক্যাষ্ট্রো (Joao de Castro) সুনোর পর পর্ত্তুগীজ-ভারতের শাসনকর্ত্তা হইয়া আসিলেন। তিনি ১৫৪৫ খৃঃ অব্দ হইতে ১৫৪৮ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত এদেশে অবস্থান করিয়াছিলেন। আলবুকার্ক ও

সুনোর ন্যায় তাঁহার যশঃসৌরভও পর্তুগীজভারতের দিগ্‌দিগন্তে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। ক্যাষ্ট্রো ডিওদ্বীপ পর্তুগীজগণের শাসনাধীন করিয়াছিলেন। তিনি গুজরাট-সুলতানের নিকট হইতে কৃতকার্য্যতার সহিত গোয়া নগর রক্ষা করিয়াছিলেন।

ক্যাষ্ট্রো যে শুধু একজন দুর্দ্ধর্ষ সৈনিকমাত্র ছিলেন তাহা নহে, তিনি পর্তুগীজশাসনপদ্ধতি সংস্কার করিবার জন্যও যথাসাধ্য প্রয়াস পাইয়াছিলেন। জোয়াও ডি ক্যাষ্ট্রোর অন্তর্দ্ধানের সঙ্গেসঙ্গেই ব্র্যাগাঞ্জা (Constantino de Braganza) পর্তুগীজ-ভারতের সর্ব্বময় শাসনকর্ত্তা হইয়া এদেশে আগমন করিলেন। তিনি রাজ-পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। ক্যাষ্ট্রো যে কার্য্য-সম্পাদনে অসমর্থ হইয়াছিলেন, ব্র্যাগাঞ্জা স্বীয় প্রজ্ঞাবলে তাহা সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়াছিলেন।

দমন-বিজয়ে ব্র্যাগাঞ্জার অমর যশঃ সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া রহিয়াছে। আজিও 'দমন' পর্তুগীজ ভারতের অন্যতম রাজ্যরূপে বিদ্যমান থাকিয়া বিজয়ী ব্র্যাগাঞ্জার অমরকীর্ত্তি উদ্‌ঘোষিত করিতেছে।

ব্র্যাগাঞ্জার পর এথেড্ (Luis de Athaide) পর্তুগীজ ভারতের শাসন-কর্ত্তা হইয়া আসিলেন। তিনি দুইবার প্রতিনিধির পদে নিযুক্ত ছিলেন। প্রথমবার ১৫৬৮ খৃঃ অব্দ হইতে ১৫৭১ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত। দ্বিতীয়বার ১৫৭৮ খৃঃ অব্দ হইতে ১৫৮১ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত।

তাঁহার প্রথমবার শাসনকালে তিনি কোন বৃহৎ-সন্ধি-ব্যাপারে বিজড়িত ছিলেন।

১৫৬৫ খৃঃ অব্দে বিজয়-নগরের হিন্দুরাজ মুসলমানগণের নিকট সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হয়েন। বিজয়-লক্ষ্মীর বরমাল্য লাভ করিয়া মুসলমানগণ পর্তুগীজগণের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন। অচিনের অর্দ্ধ-অসভ্য রাজাও এই ষড়যন্ত্রে যোগদান করিয়াছিলেন।

মালাক্কা এবং মালাবর-কূলের সমুদায় পর্ত্তুগীজউপনিবেশ মুসলমান-গণের বিপুল-বাহিনীকর্ত্তৃক অবরুদ্ধ হইল। অসীম সাহসে দুঃসাহসী পর্ত্তুগীজ-সেনাপতিগণ তাহাদের সম্মুখীন হইয়া তাহাদিগকে পরাজিত করিতে লাগিলেন।

১৫৭০ খৃঃ অব্দে পর্ত্তুগীজ-রাজপ্রতিনিধি দশমাস কাল ধরিয়া বিজাপুর নৃপতির নিকট হইতে গোয়া রক্ষা করেন। ভারতের অশিক্ষিত সৈন্যগণ যুদ্ধ-বিশারদ পর্ত্তুগীজ সৈন্যগণের নিকট পুনঃপুনঃ পরাজিত ও বিধ্বস্ত হইতে লাগিল।

মালক্কায় দুইশত মাত্র পর্ত্তুগীজ-সৈন্য গোলাবারুদের সাহায্যে ১৫০০০ পঞ্চদশ সহস্র ভারতীয় সৈন্যকে পরাজিত করে। ১৫৭৮ খৃঃ অব্দে মালাক্কা পুনর্ব্বার অচিনরাজকর্ত্তৃক অবরুদ্ধ হয়, কিন্তু সে যাত্রাও অত্যল্পসংখ্যক পর্ত্তুগীজসৈন্য দশসহস্র অচিনসৈন্য পরাজিত করিয়া তাহাদের সমস্ত গোলাবারুদ কাড়িয়া লইল। ১৬১৫ ও ১৬২৮ খৃঃ অব্দে মালক্কা অচিনরাজকর্ত্তৃক আরও দুইবার আক্রান্ত হইয়াছিল, কিন্তু দুইবারই তাহারা পর্ত্তুগীজ-সৈন্যগণের নিকট পরাজয় স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিল।

১৫৮০ খৃঃ অব্দে দ্বিতীয় ফিলিপের সময় পর্ত্তুগীজ রাজসিংহাসন স্পেন-রাজসিংহাসনের সহিত সংযুক্ত হয়। এই সময় হইতেই পর্ত্তুগীজগণের বাণিজ্য-প্রাধান্য ক্রমশঃ হ্রাস পাইতে থাকে। ওলন্দাজ, ইংরেজ প্রভৃতি স্পেনের শত্রু পর্ত্তুগীজ-বাণিজ্যতরণী আক্রমণ ও লুণ্ঠন করিতে লাগিল।

যাহা হউক, ১৬৪০ খৃঃ অব্দে পর্ত্তুগীজ-রাজ-সিংহাসন পুনর্ব্বার পৃথক্ হইল, ইতোমধ্যে ওলন্দাজ, ইংরেজ প্রভৃতি য়ুরোপের অন্যান্য জাতি ভারতে প্রবেশ লাভ করিয়াছিল। নবাগতদিগের সহিত প্রতিযোগিতায় পর্ত্তুগীজগণ আর পারিয়া উঠিতেছিল না। তাহাদের দৃপ্ত উৎসাহ ও

অদম্য উদ্যমে 'ঘুণ' ধরিয়াছিল। নবাগতদিগের অপরাজেয় প্রতিযোগিতার সম্মুখে উৎসাহশূন্য পর্ত্তুগীজদিগের ভারতীয় সাম্রাজ্য তপ্ত-মরুভূমিতে বারি-বিন্দুর মত দেখিতে দেখিতে মিলাইয়া গেল।

১৫৯০ খৃঃ অব্দ হইতে ১৬১০ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত পর্ত্তুগীজগণের চরম-উন্নতির যুগ। ইহার পর হইতে তাহাদিগের শক্তি ক্রমশঃ হ্রাস পাইতে থাকে।

সপ্তদশ শতাব্দীর কিঞ্চিদধিক প্রারম্ভে পর্ত্তুগীজগণ নির্ব্বুদ্ধিতাবশতঃ সম্রাট্ সাজাহানের বিরক্তি উৎপাদন করিল। ক্রুদ্ধ সম্রাট্ পর্ত্তুগীজদিগকে বঙ্গদেশ হইতে বিতাড়িত করিতে আদেশ প্রদান করিলেন। তাঁহার আদেশ প্রতিপালিত হইতে মুহূর্ত্তমাত্রও বিলম্ব হইল না। বঙ্গদেশের বাণিজ্যজীবী মুসলমানগণ পর্ত্তুগীজগণের উপর প্রথম হইতে বিদ্বেষ পোষণ করিত। এই সুযোগে তাহারাও সম্রাট্‌সৈন্যগণের সহিত যোগদান করিল।

একে তো পর্ত্তুগীজগণ, ইংরেজ, ওলন্দাজ প্রভৃতি য়ুরোপীয় বণিক্-গণের সহিত প্রতিযোগিতায় হীনবল হইয়া পড়িতেছিল, তাহার উপর সাজাহানের এই নির্ম্মম আদেশে তাহারা হতবুদ্ধি হইয়া পড়িল। শত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার তাহাদের আর সামর্থ্য ছিল না। অবিলম্বে সাজাহানের আদেশ প্রতিপালিত হইল—বঙ্গদেশের বণিক্-সম্প্রদায় হইতে পর্ত্তুগীজ বণিক্‌গণের নাম চিরকালের জন্য মুছিয়া গেল। হায়, যদি তাহারা সাজাহানকর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়া চিরকালের জন্য বঙ্গদেশ পরিত্যাগ করিত, তবে হয়ত তাৎকালিক বঙ্গবাসিগণকে নির্ম্মমভাবে নিপীড়িত হইতে হইত না, তবে হয়ত নিঃসহায় বাঙ্গালীদিগকে ফিরিঙ্গি-গণের দারুণ অত্যাচার হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য আত্মহত্যা প্রভৃতি ঘৃণিত কার্য্যে লিপ্ত হইতে হইত না !!

সাজাহানকর্ত্তৃক বঙ্গদেশ হইতে বিতাড়িত হইয়া পর্ত্তুগীজগণ চিরকালের জন্য এদেশ পরিত্যাগ করিল না। যাহারা পর্ব্বতপ্রমাণ অন্তরায় পদ-দলিত করিয়া, অলঙ্ঘ্য সিন্ধু লঙ্ঘন করিয়া সুদূর ভারতে বাণিজ্যের জন্য আগমন করিয়াছিল, তাহারা সামান্য কারণে ভারত পরিত্যাগ করিতে পারে না। বঙ্গদেশ হইতে বিতাড়িত হইয়া তাহারা চট্টগ্রাম, আরাকান, প্রভৃতি নিম্ন-বঙ্গে আশ্রয় গ্রহণ করিল এবং জীবিকাসংস্থান করিবার জন্য দলে-দলে জলপথে দস্যুতা করিয়া বেড়াইতে লাগিল।

বার্ণিয়ার, টেভার্ণিয়ার প্রভৃতি তদানীন্তন পরিব্রাজকের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত পাঠে আমরা জানিতে পারি যে, পর্ত্তুগীজ জলদস্যুগণের দারুণ অত্যাচারে লোকের ধনপ্রাণ নিরাপদ ছিল না। তাহারা অতর্কিত আক্রমণে এদেশবাসীর ধনপ্রাণ বিপন্ন করিত, টাকা-কড়ি লুণ্ঠন করিত, ঘরবাড়ী জ্বালাইয়া দিত। তাহাদের অত্যাচারে প্রকৃতির রম্যকানন, শ্যামল-শস্য সমাচ্ছন্ন পল্লী-জননী শ্মশানের বিভীষিকায় পরিণত হইত।

পর্ত্তুগীজ জলদস্যুগণ পূর্ণবয়স্ক পুরুষ ও অল্পবয়স্ক বালকদিগকে বল-পূর্ব্বক ধরিয়া লইত এবং দাঁড় টানিবার নিমিত্ত আপনাদের দলভুক্ত করিয়া লইত। তাহারা সতীর সতীত্বনাশ করিত, সম্মানীর সম্মান ক্ষুণ্ণ করিত। কখনও বা তাহারা আপনাদিগেরই মধ্যে পরস্পর মারামারি কাটাকাটি করিত, পুরোহিতদিগকে নিষ্ঠুররূপে নিহত করিত। স্বজাতি ও স্বধর্ম্মীর রক্তে আপনাদিগের হস্ত কলঙ্কিত করিত। দস্যুতা, লুণ্ঠন, পরপীড়ন প্রভৃতি ঘৃণিত কার্য্যই তাহাদিগের জীবিকা ছিল।

কখনও কখনও পর্ত্তুগীজ জলদস্যুগণ আরাকানের মগগণের সহিত মিলিত হইয়া নদীতে নদীতে বিচরণ করিত, নদীপার্শ্বস্থিত গ্রাম্য অধি-বাসিগণের বিপণি-শ্রেণী লুণ্ঠন করিত, উৎসবাদি ভাঙ্গিয়া দিত, বরযাত্রি-গণের উপর দারুণ অত্যাচার করিত। কখনও বা তাহারা পরিবারের

পুরুষগণকে নিষ্ঠুরভাবে নিহত করিয়া স্ত্রীলোকগণকে বন্দী করিয়া লইয়া যাইত। এইরূপ বন্দীকৃত স্ত্রীলোকগণকে কখনও বা তাহারা স্থানীয় বিপণিতে বিক্রয় করিত আর কখনও বা গোয়ার পর্ত্তুগীজগণের নিকট বিক্রয় করিয়া হৃদয়হীনতার পরিচয় প্রদান করিত। এই সমুদয় পর্ত্তুগীজ জলদস্যুগণের নিমিত্ত সুন্দরবনের নিকটবর্ত্তী মনোরম দ্বীপাবলী জনশূন্য হইয়া পড়িয়া থাকিত।

কবিকঙ্কণ চণ্ডী এক স্থানে পর্ত্তুগীজ জলদস্যুদিগের স্পষ্টতঃই উল্লেখ করিয়াছেন, যথা,—

"ফিরাঙ্গির দেশ খান বাহে কর্ণধারে।
রাত্রিতে বাহিয়া যায় হরমাদের ডরে॥"*

বার্ণিয়ার পাঠে আমরা আরও জানিতে পারি যে, পর্ত্তুগীজ জলদস্যুগণ যে শুধু সমুদ্রের উপকূলবর্ত্তী ভূভাগেই দস্যুতা করিত, তাহা নহে, তাহারা সমুদ্র-উপকূল হইতে ৬০।৭০ মাইল দূরবর্ত্তী ভূভাগেও লুণ্ঠন করিত।

বঙ্গদেশ তখন মোগল-সরকারের অধীন হইলেও পুলিসের সুবন্দোবস্ত না থাকায় বাঙ্গালার নিরীহ প্রজাবৃন্দ এই সমুদায় পর্ত্তুগীজ জলদস্যুগণের নির্ম্মম নিষ্ঠুরতা হইতে নিষ্কৃতি পাইত না।

আরাকান-বাসী মগের অত্যাচার, রক্ষকরূপে ভক্ষক জমীদারের দারুণ নিপীড়ন ও সর্ব্বোপরি পর্ত্তুগীজ জলদস্যুগণের আকস্মিক আক্রমণ এই সমস্ত মিলিয়া বাঙ্গালা দেশকে বাস্তবিকই তখন 'মগের মুলুক' করিয়া তুলিয়াছিল।

পর্ত্তুগীজগণের সংস্পর্শে আসিয়া ভারতবাসিগণের মধ্যে একটী কুৎসিত

---

* হরমাদ শব্দ স্পেনিস্ armada শব্দের অপভ্রংশ।

রোগের সৃষ্টি হইয়াছিল। আধুনিক বৈদ্যগ্রন্থে ঐ রোগটী 'ফিরিঙ্গ' নামে অভিহিত,—

'গন্ধরোগঃ ফিরঙ্গোঽয়ং জায়তে দেহিনাং ধ্রুবম্।
ফিরঙ্গিণোঽতিসংসর্গাৎ ফিরঙ্গিণ্যাঃ প্রসঙ্গতঃ॥
ফিরঙ্গসঙ্গকে দেশে বাহুল্যেনৈব যদ্ভবেৎ।
তস্মাৎ ফিরঙ্গ ইত্যুক্তো ব্যাধির্ব্যাধিবিশারদৈঃ॥'

ফিরঙ্গদেশীয় স্ত্রী বা পুরুষগণের সহিত সংসর্গ করিলে এই রোগ উৎপন্ন হয় এবং উক্ত দেশে ইহার বহুল প্রচার বলিয়া ব্যাধিবিশারদগণ ইহার 'ফিরঙ্গ' নাম রাখিয়াছেন।

পর্ত্তুগীজগণ জলদস্যুরূপে বঙ্গে দারুণ অত্যাচার করিলেও আমরা অনেক আবশ্যক সামগ্রীসম্ভারের জন্য তাহাদের নিকট ঋণী। আমাদিগের মধ্যে ও আমাদের ভাষার মধ্যে এখনও পর্ত্তুগীজপ্রভাব পরিলক্ষিত হইয়া থাকে।

পেয়ারা, আনারস, আতা, নোনা, সপেটা, কামরাঙ্গা, বিলাতী বেগুণ, কাজুবাদাম, চীনা-বাদাম এবং সন্তরা প্রভৃতি ফল পর্ত্তুগীজগণই এদেশে আনয়ন করে।

পর্ত্তুগালের অন্তঃপাতী সিন্ত্রা (Cintra) নগর হইতেই বোধ হয় 'সন্তরা' ফলের নামকরণ হইয়াছে এবং বৃন্দাবনদাস রচিত চৈতন্যভাগবতে উল্লিখিত 'সমতারা' ফলও বোধ হয় এই 'সন্তরা' নামের অপভ্রংশ।

বার্ণিয়ার পাঠে আমরা জানিতে পারি, পর্ত্তুগীজগণ নানাবিধ ফলের মোরব্বা প্রস্তুত করিতে পারিত।

পর্ত্তুগীজগণ সূর্য্যমুখী, রজনীগন্ধা, মুকুটফুল, বিলাতী-তুলসী, পীত-করবী, গাঁদা ও অন্যান্য সুন্দর সুন্দর পুষ্প মেক্সিকো হইতে এ দেশে আনয়ন করিয়া ভারতীয় পুষ্পের শ্রীবৃদ্ধিসাধন করে।

ওলন্দা, কপি, কড়াইসুটী প্রভৃতি য়ুরোপীয় তরিতরকারীও আমাদিগকে পর্ত্তুগীজগণের কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়।

সালসা, আনারস এবং জোলাপ প্রভৃতি ভৈষজ্য-তরুও পর্ত্তুগীজগণই দক্ষিণ আমেরিকা হইতে এ দেশে আনয়ন করে।

পাঁউরুটী, বিস্কুট প্রভৃতি রোগীর পথ্য প্রস্তুতকরণ আমরা পর্ত্তুগীজগণের নিকটই প্রথম শিক্ষা করি। 'পাক-রাজেশ্বর' নামক আধুনিক সংস্কৃত গ্রন্থে 'ফিরঙ্গরোটী' বা পাঁউরুটী প্রস্তুত করিবার প্রণালী লিখিত আছে।

যে আরামদায়ক তাম্রকূটের ধূমপান করিয়া লক্ষ লক্ষ শ্রমজীবী নূতন উত্তম পাইতেছে, তাহাও আমাদিগকে পর্ত্তুগীজদিগেরই নাম স্মরণ করাইয়া দেয়। খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে এদেশে তামাকুর প্রথম আমদানী হয়।

পর্ত্তুগীজগণ সুনিপুণ বেহালা-বাদক ছিল। তাহারাই এদেশীয় যাত্রায় বেহালার প্রচলন করে।

পর্ত্তুগীজদিগের অনুকরণের ফলে এদেশীয় পুরুষ ও নারীর মধ্যে এক সময়ে লবেদার ও ফিরিঙ্গি খোপার বহুল প্রচার ছিল।

কুপন, বিস্তি, প্রমারা খেলা এবং স্ফূর্ত্তি ও নিলাম দ্বারা দ্রব্যাদি ক্রয়-বিক্রয়ের প্রথা পর্ত্তুগীজগণই এদেশে প্রথম প্রবর্ত্তিত করে।

আজিও অনেক বাঙ্গালী পর্ত্তুগীজগণের অনুকরণে যীশুমাতা মেরীর নাম গ্রহণ করিয়া শপথ করে। 'মাইরি' শব্দ 'মেরী'র অপভ্রংশ ভিন্ন কিছুই নহে। এলিজাবেথের শাসনসময়ে ইংলণ্ডেও 'ম্যারী' শব্দ এই অর্থেই প্রযুক্ত হইত।

দারুণ গ্রীষ্মে যে আমরা টানাপাখা ব্যবহার করি, তাহার জন্যও আমরা পর্ত্তুগীজগণের নিকট ঋণী।

বঙ্গভাষায় যে সমুদায় পর্ত্তুগীজ শব্দ ব্যবহৃত হয়, তাহার একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রদান করিয়াই আমি আমার নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধের পরিসমাপ্তি করিব।

মূল পর্ত্তুগীজ শব্দ	বঙ্গভাষায় ব্যবহৃত পর্ত্তুগীজ শব্দ
Ananarz	আনারস
Aia	আয়া
Alcatrao	আলকাৎরা
Almario	আলমারি
Alfinite	আলপিন
Hollanda	ওলন্দা
Couve	কপি
Catatua	কাকাতুয়া
Caju	কাজুবাদাম
Canastra	কানেস্তারা
Carambola	কামরাঙ্গা
Cris	কিরিচ
Coupon	কুপন
Cathedra	কেদারা
Gamella	গামলা
Egreja	গীর্জ্জা
Chavi	চাবি
Janella	জানালা
Jalapa	জোলাপ
Tabaco	তামাকু

Tendedeira	তুন্দুর বা তুন্দুল
Toalha	তোয়ালে
Leilao	নিলাম
Annona	নোনা
Prato	পরাত
Padre	পাদরি
Pao	পাঁউরুটি
Pipa	পিপা
Pistol	পিস্তল
Peru (পক্ষীবিশেষ)	পেরু
Posta	পোস্তা
Prego	প্রেক
Forma	ফরমা
Sorte	সুর্ত্তি
Sabao	সাবান
Viola	বেহালা
Marria	মাইরি
Salsaparrilha	সালসা
Mastro	মাস্তুল
Marca	মার্কা
Sagu	সাগু
Sapotilla	সপেটা
Botelha	বোতল
Fita	ফিতা
Baldi	বাল্‌তি
Sacola	সাঁকালি (থলিয়া)

শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত

গো-দুগ্ধ

বাঙ্গালীর প্রধান খাদ্য ভাত, মাছ এবং দুগ্ধ। যাঁহারা মাংস আহার করেন না, তাঁহাদের শরীরের সর্ব্বাঙ্গীন পুষ্টির জন্য দুগ্ধ অতি আবশ্যকীয়। আমাদের শরীর-ধারণের জন্য যে যে মৌলিক পদার্থের যে পরিমাণে প্রয়োজন, দুগ্ধে সে সবই প্রায় সেই সেই পরিমাণেই বিদ্যমান আছে। সেইজন্যই আবশ্যক হইলে, শুধু দুগ্ধ পান করিয়াই প্রাণধারণ করা যাইতে পারে। কিন্তু আজকাল দুগ্ধ আর সহজপ্রাপ্য নহে। এমন একদিন ছিল, যে দিন সমস্ত গোয়ালেই দুই একটা গরু থাকিত, তাহাতে গৃহস্থের প্রয়োজনমত দুধ পাওয়া যাইত। কিন্তু আজকাল সহরের ত কথাই নাই, অধিকাংশ গ্রামিক ভদ্রলোকেরও কেনা দুধের উপর নির্ভর করিতে হয়। গত ২।৩ বৎসর যাবৎ আমাকে সরকারী কার্য্যোপলক্ষে রাজসাহী ও ঢাকা-বিভাগের অনেক জায়গায় ঘুরিতে হইয়াছে, যেথানে গিয়াছি, সকলেই আমাকে অনুরোধ করিয়াছেন, গবর্ণমেণ্ট হইতে বিশুদ্ধ দুগ্ধের সরবরাহের জন্য যাহাতে কোন একটা বন্দোবস্ত করা হয়। এমন সহর নাই, এমন গ্রাম নাই, যেখানে দুধের মূল্য গত ১০।১২ বৎসরে ৩।৪ গুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত না হইয়াছে। অধিকাংশ জায়গাতেই আজ কাল তিন আনা চারি আনার কমে একসের দুধ পাওয়া যায় না। তাহার ভিতর কয়ভাগ যে গাইয়ের বাঁটের আর কয়ভাগ যে পচাপুকুরের তাহা কাহারও জানা অসাধ্য। সরকারী রিপোর্টে প্রকাশ বঙ্গদেশে শতকরা ১৫(?) শিশু এক বৎসরের ভিতর মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

ইহার ভিতর ১০ লিভার-সংক্রান্ত পীড়ারোগে আক্রান্ত। আমি ডাক্তার নহি, বিশেষজ্ঞদের মুখে শুনিয়াছি, যে দূষিত দুগ্ধই অথবা দুগ্ধের অভাবই

ইহার প্রধান কারণ। অনেক বাড়ীতে দুগ্ধের পরিবর্ত্তে কন্‌ডেন্সড্‌ মিল্ক, হরলিকস্‌ মিল্ক ব্যবহৃত হইয়া থাকে। দেশের এই যে অবস্থা হইয়া দাঁড়াইয়াছে, ইহার প্রতীকার আবশ্যক, তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। রোগ প্রতীকারের পূর্ব্বে রোগের কারণ নির্ণয় করা আবশ্যক। আমাদের কৃষকেরা যে শুধু অতিরিক্ত লাভের লালসায় দুধে জল মিশাইয়া টাকায় চারিসের দুধ বিক্রয় করে, তাহা নহে। বিশ বৎসর পূর্ব্বে গাভী পালন করার যে সুবিধা ছিল, আজ-কাল আর তাহা নাই। পূর্ব্বে যে গ্রামে দুইশত গাই অনায়াসে চরিয়া বেড়াইত, আজকাল সেই গ্রামে বিশটি প্রাণীর গোচারণ ভূমি নাই। এজন্য কৃষকগণ কতটা দায়ী এবং জমিদারগণ কতটা দায়ী, তাহা বলা দুঃসাধ্য। এক, ধানের খড় ভিন্ন যে অন্য কোনও রকম ঘাস জন্মাইয়া গরুকে খাওয়ান যাইতে পারে অথবা খাওয়ান আবশ্যক, এ ধারণা আমাদের কৃষকদের নাই। সে নিজে দুবেলা পেট ভরিয়া খাইতে পায় না, গরুর খাবার কোথায় পাইবে? দেশে গো-চারণের ভূমি নাই, গাই-বলদ সব অস্থি-কঙ্কালসার, তাহার ফলে আমাদের শিশুরাও রুগ্ন, দুর্ব্বল। সম্প্রতি এ সম্বন্ধে অনেক আন্দোলন হইতেছে, এই আন্দোলনের ফলে এ বিষয়ে গবর্ণমেণ্টেরও মনোযোগ আকর্ষিত হইয়াছে। ভারত-গবর্ণমেণ্টের আদেশে প্রত্যেক প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে তদন্ত করিতেছেন। কিন্তু যাঁহারা এ বিষয়ে কিছু চিন্তা করিয়াছেন, তাঁহারা সকলে বোধ হয় নিম্নলিখিত কয়েকটী বিষয় লক্ষ্য করিয়াছেন। বঙ্গদেশে বিশেষতঃ উত্তরবঙ্গে, হালের জন্য বেহারী বলদের ব্যবহার ক্রমশঃই বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হইতেছে এবং দেশীয় বলদ ও গাভী উভয়ই দ্রুত গতিতে অধোগতি প্রাপ্ত হইতেছে। নানা কারণে আমাদের দেশে গোজাতির এরূপ দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে। ইহার মধ্যে নিম্নলিখিত ৩টি কারণ প্রধান বলিয়া বোধ হয়।

(১) গোচারণ-ভূমির অভাব।

(২) পোয়াল অথবা অন্য কোন উপযুক্ত খাদ্যের অভাব।

(৩) বংশবৃদ্ধির জন্য অল্পবয়স্ক এবং দুর্ব্বল ষাঁড়ের ব্যবহার।

লোকসংখ্যা-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উপযুক্ত পরিমাণে শস্য উৎপাদন আবশ্যক।

ইহা দুই উপায়ে সাধিত হইতে পারে। প্রথমতঃ সারপ্রয়োগ এবং অন্যান্য উন্নত কৃষিপ্রণালী অবলম্বন দ্বারা প্রতি বিঘা জমি হইতে অধিক পরিমাণে শস্য উৎপাদন, অথবা অধিক পরিমাণ ভূমি আবাদ। প্রথম উপায় অবলম্বন যৎকিঞ্চিৎ শ্রম ও অর্থসাপেক্ষ, পুরাকাল হইতে যে সমস্ত প্রণালী চলিয়া আসিতেছে, আমরা সহজে তাহার পরিবর্ত্তন করিতে চাই না। কাজেই যে উপায় সহজসাধ্য, তাহাই অবলম্বন করি, আমরা বেশী পরিমাণ জমি আবাদ করি। ফল এই হইয়াছে যে, খুব কম গ্রামেই গাই চরাইবার স্থান আছে। যে সমস্ত যৎসামান্য শ্রমসাধ্য উপায়ে জমির উৎপাদিকা-শক্তি বৃদ্ধি হইতে পারে, আমরা তাহাও অবলম্বন করি না। আমি একটা সাধারণ দৃষ্টান্ত দিতেছি। রেলভ্রমণের সময় অনেকেই লাইনের দু'ধারে স্তূপীকৃত গো-হাড় দেখিয়া থাকিবেন। ইহার উদ্দেশ্য অনেকেই হয়ত জানেন না। এই রাশিকৃত হাড় কলিকাতায় চালান হয়। সেখানে কলে চূর্ণীকৃত হইয়া চাবাগানে অথবা ইংলণ্ড-জার্ম্মনি ইত্যাদি জায়গায় রপ্তানী হইয়া, সেই সমস্ত দেশের ভূমির উৎপাদিকাশক্তি বৃদ্ধি করে। আমরা গাভীর মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইয়া সেই জমিতে ধান বুনি এবং আরও অধিক পরিমাণে গো-হাড় সঞ্চয়ের সহায়তা করি। সম্প্রতি বঙ্গীয় কৃষিবিভাগ হাড়ের গুঁড়া সারের প্রচলনের জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছেন, গবর্ণমেণ্ট এ সব বিষয়ে কি করিতেছেন—এস্থলে তাহা আমার বক্তব্য নহে। আমাদের দেশের জমিদারগণ যদি স্থিরপ্রতিজ্ঞ

হন, যে গো-চারণভূমি চাষের জন্য পত্তনি দিবেন না, এবং যে সমস্ত ভূমি পত্তনি দেওয়া হইয়াছে তাহার পুনরুদ্ধার সাধনের চেষ্টা করেন; তবে এই দুরবস্থার অনেকটা প্রতীকার করিতে পারেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সারব্যবহার ও অন্যান্য উপায় দ্বারা ভূমির উৎপাদিকা-শক্তি বৃদ্ধির উপায়ও করিতে হইবে। নতুবা "গরু মারিয়া জুতা দান" করা হইবে। এই বিষয়ে আর একটি বক্তব্য আছে, ইংরাজিতে যাহাকে Inertia বলে, আমাদিগের ভিতর সেই বৃত্তিটি খুব প্রবল। আমরা সহজে স্থান-পরিবর্ত্তন করিতে চাই না, আমরা শুইতে পারিলে বসিতে চাই না, বসিতে পারিলে উঠিতে চাই না; পিতৃ-পিতামহ যে গ্রামে বাস করিয়া গিয়াছেন, অর্দ্ধাহারঅনাহারে থাকিলেও আমরা সহজে তাহার পরিবর্ত্তন করিতে চাই না। নিম্নলিখিত তালিকায় দেখা যাইবে, আমাদিগের দেশে এখনও চাষ-উপযোগী কত জমী পতিত রহিয়াছে। কারণ চাষের জমীর বিস্তৃতি বন্ধ রাখিতে হইলে যাহাতে অল্প জমিতেই সেই পরিমাণ শস্য উৎপন্ন হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। আমাদের কৃষকেরা এই সমুদায় জায়গায় না যাইয়া হাতের কাছে যাহা পায় তাহাই চাষ করিয়া ফেলে।

২। ঘাসের পর ধানের খড়ই আমাদের দেশের গো-জাতির প্রধান খাদ্য। কিন্তু আজকাল ইহাও খুব দুর্ম্মূল্য হইয়া উঠিয়াছে। সহরের আশে-পাশে গ্রামের খড় প্রায় সমুদয় সহরে চলিয়া যায়, বিদেশী বলদের আমদানী বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নানাস্থানে গো-হাট এবং মেলার সৃষ্টি হইয়াছে। এই সমস্ত স্থানের অধিকাংশ খড় হাটে চলিয়া যায়, গ্রাম্য গো-পালের ভাগ্যে জোটে না। সমুদয় পাশ্চাত্য-দেশেই গো-জাতির আহারের জন্য মকাই, বিট ইত্যাদি নানা রকম ফসল উৎপন্ন করা হইয়া থাকে; বেহার-অঞ্চলেও গরুর জন্য জোয়ারের চাষ করা হইয়া থাকে। কিন্তু বঙ্গদেশে

ইহার প্রচলন নাই। কোন কোন জায়গায় বিশেষতঃ চর-জমিতে ধানের পর মাষকলাই ছিটাইয়া দেওয়া হয়, এবং তাহা গরুর খাদ্যের জন্য ব্যবহৃত হয়। এই রীতির আরও প্রচার বাঞ্ছনীয়। অনেক জেলাতে ধান কাটিবার কিছু পূর্ব্বে কলাই অথবা খেসারি ছিটাইয়া দিলে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে গরুর আহার জুটিতে পারে। যখন টাকায় আধমণ দুধ পাওয়া যাইত, এবং গো-চারণের অভাব ছিল না, যখন ২৫৲ টাকায় উৎকৃষ্ট গাভী পাওয়া যাইত, তখন গরুর আহারের জন্য কোনও ফসল উৎপাদনের আবশ্যক ছিল না। কিন্তু আজকাল ১৲ টাকায় ৫।৬ সেরের বেশী দুধ খুব কম জায়গাতেই পাওয়া যায়। ৬০।৭০৲ টাকার কম একটী ভাল গাই পাওয়া যায় না, গো-চারণ ভূমি নাই বলিলেও চলে। এই অবস্থায় গরুর আহারের প্রতি আরও বিশেষ দৃষ্টি আবশ্যক। জোয়ার ইত্যাদি ফসলের চাষ প্রবর্ত্তন দরকার।

৩। সুস্থ ও সবলকায় পিতামাতা হইতেই সুস্থ সন্তান আশা করা যাইতে পারে। সতেজ বৃক্ষের বীজ হইতেই সতেজ চারা আশা করা যাইতে পারে, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত সত্য। কিন্তু দুঃখের বিষয় চাষের প্রধান সহায়, গোজাতির সম্বন্ধে একথা আমরা ভুলিয়া যাই। অধিকাংশ স্থলেই বলবান্ ষাঁড়গুলিকে বলদ করিয়া দুর্ব্বল ষাঁড়গুলিকে বংশবৃদ্ধির জন্য রাখা হয়। সাধারণতঃ তিন বৎসরের পূর্ব্বে ষাঁড় পূর্ণাবয়বপ্রাপ্ত হয় না, এবং ইহার পূর্ব্বে ষাঁড়কে গাভীর সঙ্গে মিশিতে দেওয়া উচিত নহে। কিন্তু এই নিয়ম কোনও স্থলেই রক্ষিত হয় না, অনেক স্থলেই ষাঁড়গুলিকে প্রথমতঃ দুই তিন বৎসর গাভীর সঙ্গে মিশিতে দিয়া, পরে বলদ করা হয়, ইহাতে সন্ততি সবল অথবা সুস্থকায় হইবে, কি প্রকারে আশা করা যাইতে পারে? ফলে পুরুষানুক্রমে গোজাতির অতি দ্রুতগতিতে অবনতি হইতেছে।

অনেকেই হয়ত ভাবিয়া দেখেন নাই যে, একটি ষাঁড় হইতে তাহার জীবিত দশায় প্রায় সহস্রাধিক বৎস উৎপন্ন হয়। ইহা হইতে পাঠকগণ উপলব্ধি করিতে পারিবেন। উৎকৃষ্ট ষাঁড়ের নির্ব্বাচনের উপর সমস্ত গোজাতির উন্নতি কতটা নির্ভর করিতেছে। পূর্ব্বে শ্রাদ্ধাদির সময় বৃষোৎসর্গ মহাপুণ্য কার্য্য বলিয়া পরিগণিত হইত। দেশের লোকের নিকট এই সমস্ত ষাঁড় পবিত্র বলিয়া বিবেচিত হইত। এই সমস্ত ষাঁড় যথেচ্ছা বিচরণ করিত, এবং সবল ও সুস্থকায় ছিল, বংশবৃদ্ধির জন্য প্রায়শঃই এই সমস্ত ষাঁড়ই ব্যবহৃত হইত; এবং তাহাদের সন্ততিগণ সবল ও সুস্থকায় হইত। আমরা আজকাল সুশিক্ষিত হইয়া, কুসংস্কার কাটাইয়াছি। মুনিঋষিগণ যে সমস্ত লোকাচাব প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন, তাহার অধিকাংশই কুসংস্কার বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছি। এই বৃষোৎসর্গ যে আমাদের গোজাতির উন্নতির একটি প্রধান উপায় ছিল, তাহা আমরা কখনও ভাবিয়া দেখি নাই। "মরা গরু ঘাস খায় না" বলিয়া আমরা শ্রাদ্ধশান্তি পরিত্যাগ করিয়াছি, কিন্তু তাহার এই ফল হইয়াছে যে, আমরা জিয়ন্তগরুকে মারিতে বসিয়াছি। যে দুই চারিটি ষাঁড় আছে, তাহাদেরও আহার নাই, ক্রমশঃ অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছে এবং অনেক স্থানে সেগুলি অযথা অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া থাকে। ইহার প্রতীকার অতি সত্বর আবশ্যক। গ্রাম্য পঞ্চায়তগণ মিলিয়া যদি একটি অথবা ততোধিক উপযুক্ত ষাঁড় প্রত্যেক গ্রামে রাখিবার ব্যবস্থা করেন এবং গাই-পিছু (প্রতি) সামান্য কিছু ধরিয়া লন, তবে বোধ হয়, বিনা-খরচে ইহার একটা প্রতীকার হইতে পারে। জমিদারগণও তাঁহাদের মফস্বলের কাছারীতে এইরূপ একটা ষাঁড় রাখিতে পারেন।

তবেই দেখা যাইতেছে, আমরা তিন উপায়ে গবাদি পশুর কথঞ্চিৎ উন্নতিসাধন করিতে পারি—(১) বংশবৃদ্ধির জন্য বলবান্ ও সুলক্ষণ-

যুক্ত, ষাঁড়ের ব্যবহার এবং অধিক পরিমাণ দুগ্ধবতী গাভীর নির্ব্বাচন; (২) গোচারণভূমি বৃদ্ধি, (৩) জোয়ার ও তজ্জাতীয় ঘাস উৎপাদন।

আমাদের দেশের জমিদার ও ভূম্যধিকারিগণ এ বিষয়ে একটু দৃষ্টি-পাত করিলে, অনেক কাজ করিতে পারেন। কিন্তু সাধারণতঃ দেখা যায় যে, আমাদের দেশের ভূম্যধিকারিগণ খাজনা লইয়া প্রজা পত্তনেরই পক্ষপাতী, কারণ আমাদের সাধারণ ধারণা যে, নিজের তত্ত্বাবধানে খামার করিয়া লাভ করা যায় না, বস্তুতঃ এরূপ বিশ্বাসের যথেষ্ট ভিত্তি আছে। নিজে চাষ করিয়া খুব কম ভদ্রলোকেই লাভবান্ হইয়াছেন, বরং অনেকেই এ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া নিবৃত্ত হইয়াছেন।

ইহার কারণ আমার যাহা মনে হয় এইখানে তাহার একটু আলোচনা দরকার, আমি আমার মূল বিষয় হইতে একটু দূরে সরিয়া পড়িতেছি, কিন্তু এ বিষয়টি কিছু আলোচনা না করিলে আমার মূল বক্তব্য পরিস্ফুট করিতে পারিব না, আশা করি শ্রোতৃ-মহোদয়গণ মার্জ্জনা করিবেন। যাঁহারা এইরূপ ভাবে চাষে প্রবৃত্ত হন, তাঁহাদের অনেকেরই এ সব বিষয়ে অভিজ্ঞতা নাই। প্রায়ই বেতন-ভোগী কর্ম্মচারীর উপর নির্ভর করিতে হয়। ইহাদের এ সব বিষয়ে বিশেষ কোন অভিজ্ঞতা নাই। সাধারণতঃ কৃষকগণ যাহা বোঝায়, ইহারা তাহাই বোঝেন, নূতন কিছু শিখিতে চাহেন না। অনেকে মনে করেন, মূল্যবান্ বৈদেশিকযন্ত্র ব্যবহার ব্যতীত আমাদের প্রচলিত কৃষি-প্রণালীর বিশেষ কোনও উন্নতি হইতে পারে না, এ ধারণাও সম্যক্ ঠিক নহে। বৈদেশিক শুধু ২।১টী যন্ত্রই এ পর্য্যন্ত আমাদের ব্যবহারোপযোগী বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। আমাদের ভদ্র চাষাদের প্রধান অন্তরায় তাঁহারা প্রতিযোগিতায় সাধারণ কৃষকদের সঙ্গে পারিয়া উঠেন না। কৃষকেরা স্ত্রীপুত্র সবাই মিলিয়া কাজ করে, ইহাদের মজুরি তাহারা ধর্ত্তব্যের মধ্যেই গণ্য করে না। কিন্তু ভদ্র-

লোকদের প্রত্যেক কাজ বেতনভুক্ ভৃত্যদ্বারা করাইতে হয়। বিশ্বাসী ভৃত্য, যে প্রভুর কাজ নিজের কাজের ন্যায় মনে করিবে, এমন বিশ্বাসী ভৃত্য পাওয়া যায় না, কাজেই তাহার খরচ বেশী পড়িয়া যায়। কিন্তু এরূপ অনেক ফসল আছে, যাহার আবাদ-প্রণালী আমাদের কৃষকেরা সম্যক্‌রূপে জানে না, অথবা জানিলেও অর্থাভাবে অথবা অন্য কোনও কারণে সেই সমস্ত প্রণালী যথাযথভাবে অনুসরণ করিতে পারে না। এই সমস্ত ফসলের চাষ ভদ্রচাষাদিগের পক্ষে বিশেষ উপযোগী এবং লাভজনক। ইক্ষু, আলু, তামাক ইত্যাদি এই শ্রেণীর অন্তর্গত। বঙ্গীয়-কৃষি-বিভাগ আমাদের কৃষি-প্রণালীর উন্নতি সম্বন্ধে সর্ব্বদাই নানাবিধ পুস্তকাদি প্রকাশ করিয়া থাকেন, কিন্তু সাধারণ কৃষকগণের ভিতর এই সমস্ত উপদেশ পৌঁছায় না। অথবা পৌঁছাইলেও তাহাদের রক্ষণশীলতা-নিবন্ধন তাহারা সেই সমস্ত উপদেশানুসারে কার্য্য করিতে চাহে না। যাহাতে কৃষকগণের ভিতর এই সমস্ত উপদেশ পৌঁছায় সেইজন্য বঙ্গীয় কৃষি-বিভাগ এইবার বিশেষ বন্দোবস্ত করিয়াছেন, কিন্তু তাহা এই প্রবন্ধে বক্তব্য নহে। ভদ্র চাষীগণ কৃষি-বিভাগের উপদেশ অনুযায়ী বিজ্ঞান-সম্মত প্রণালী অনুসারে, এই সমস্ত শস্যের আবাদ করিলে, বিশেষ লাভবান্ হইতে পারেন। মধ্যবিত্ত অবস্থাপন্ন ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক পরিচালিত এই সব কৃষিক্ষেত্রে কয়েকটি গাভী রাখিবার বন্দোবস্ত অনায়াসেই করা যাইতে পারে। গোময় সাররূপে ব্যবহৃত-ক্ষেত্রের উৎপাদিকাশক্তি বৃদ্ধি করিবে এবং দুগ্ধ বিক্রয় করিয়া লাভ তো হইবেই, অধিকন্তু দেশের একটী মস্ত অভাব দূর হইবে।

পশ্চিম-দেশীয় গাই হইতে প্রথম বেশী দুধ পাওয়া যায় বটে, কিন্তু দুই তিনটী বাছুর হইবার পরই আর সেরূপ দুধ থাকে না। বিশেষতঃ গাভীর উপযুক্ত ষাঁড় সব সময় পাওয়া যায় না। এইরূপ গাভীর

যেরূপ যত্ন দরকার, আমাদের কৃষকগণের তাহা ক্ষমতার অতীত। কাজেই এই সব গাভীদ্বারা দেশের গোজাতির চিরন্তন কোনও উন্নতি হইতে পারে না, উপযুক্ত যত্নের অভাবে এই সমস্ত গাই অনেক সময় দেশীয় গাই অপেক্ষাও নিকৃষ্ট হইয়া পড়ে।

বঙ্গীয় কৃষি-বিভাগ দেশের এই অসুবিধা দূরীকরণার্থে সম্প্রতি একটি ডেয়ারী ফার্ম খুলিয়াছেন। সে সম্বন্ধে ২।৪টী কথা বলিয়াই এই প্রবন্ধের শেষ করিব।

এই কৃষি-ক্ষেত্রের প্রধান উদ্দেশ্য স্থানীয় গো-জাতির উন্নতিসাধন, কিন্তু চাষবাস করিয়া লাভ করা যাইতে পারে, ইহা প্রমাণ করা দ্বিতীয় উদ্দেশ্য। যদি দেখা যায় যে, এই কৃষিক্ষেত্রে অনুষ্ঠিত প্রণালী দ্বারা চাষ করিলে লাভ দাঁড়াইতে পারে, তাহা হইলে আমাদের দেশের যুবকবৃন্দের অর্থাগমের একটী নূতন উপায় হইবে। এই কৃষিক্ষেত্রের আয়তন ১০০০ বিঘা। আপাততঃ ইহাতে ১০০ গাভী রাখার বন্দোবস্ত করা হইতেছে। গোচারণ-ভূমি ব্যতিরেকে অন্যান্য জমিতে ধান, পাট, ইক্ষু, তামাক ও আলুর চাষ করা হইবে। একটী সবজী বাগানও থাকিবে, গাভী ব্যতীত হাঁস, ছাগ, মুরগী এবং সুবিধামত অন্যান্য পশু রাখা হইবে। নানাবিধ ফলবান্ বৃক্ষ রোপণ করা হইবে। এই ক্ষেত্রে একটী এঞ্জিন্ থাকিবে, আকমাড়াই, সর্ষপ হইতে তৈল-প্রস্তুত, গরুর দানা ভাঙ্গা, জাবকাটা, জলতোলা ইত্যাদি কার্য্য এই এঞ্জিনের সাহায্যে সংসাধিত হইবে। চাষের যে প্রধান অন্তরায় মজুরের অভাব তাহা অনেক পরিমাণে, এই এঞ্জিনের দ্বারা দূরীভূত হইবে, আশা করা যায়।

এই কৃষিক্ষেত্র সম্বন্ধে যদি কেহ বিশেষরূপে জানিতে চান, তবে কৃষি-বিভাগের অধ্যক্ষ মহোদয়ের নিকট চিঠি লিখিলেই জানিতে পারিবেন। যদি উপস্থিত শ্রোতৃগণের ভিতর কেহ কখনও রঙ্গপুরে আগমন করেন,

তাহা হইলে আমরা যথাসাধ্য তাঁহাদিগকে কৃষিক্ষেত্র দেখাইতে এবং তাহার কার্য্য বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

প্রাচীন ভারতে ধাত্রীবিদ্যা

আমাদের দেশে আজকাল ধাত্রীর কার্য্য নীচজাতীয়া স্ত্রীলোকেরা করিয়া থাকে। একে অশিক্ষিতা, তাহাতে সামাজিক প্রথানুযায়ী অস্পৃশ্যা হওয়ায় ধাত্রীরা স্বভাবতঃ অপরিষ্কারভাবে থাকিয়া নানাপ্রকার আধি-ব্যাধির মন্দির। এক কথায় চলিষ্ণু দাতব্যচিকিৎসালয় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আমরা জ্ঞানের অপব্যবহার করিয়া এমনই জ্ঞানশূন্য হইয়াছি যে, জানিয়া দেখিয়া, পরীক্ষা করিয়াও এই শ্রেণীর স্ত্রীলোকের হাতে আমাদের গৃহলক্ষ্মীর, আমাদের ভবিষ্যৎ বংশের, জীবন অকাতরে ন্যস্ত করিয়া নিশ্চিন্ত ভাবে শান্তিলাভ করিয়া থাকি। সূতিকাগৃহে বর্ষীয়সী জননীগণ অস্পৃশ্যা হইবার ভয়ে, তীর্থাদিদর্শনের ফল লোপ হইবার ভয়ে, গঙ্গাস্নানের মহিমা নষ্ট হইবার আশঙ্কায় যাইতে চাহেন না। দূর হইতে সমবেদনা দেখাইয়া অজ্ঞানান্ধকারাচ্ছন্ন সংক্রামক পীড়ার প্রসূতি ধাত্রীর হস্তে আপনার বধূ বা দুহিতাকে সমর্পণ করিয়া, মনে মনে পঞ্জিকা-কারের লিখিত সেই "অস্তি গোদাবরীতীরে জম্ভলানামে রাক্ষসী" মন্ত্র আবৃত্তি করিতে থাকেন। অসহায়ের সহায় ভগবান্, স্বভাবশক্তিবলে হতভাগ্যা বঙ্গনারীকে সুপ্রসব করাইয়া বাঙ্গালী হিন্দুর অস্তিত্ব রক্ষা করি-তেছেন। বাঙ্গালী-হিন্দুর সূতিকাগৃহ-নির্ম্মাণপ্রথা এক অদ্ভুত ব্যাপার। বায়ু চলাচলের পথ নাই, জলসিক্ত আর্দ্রভূমির উপর ধনুকাকারে কুঁড়ে

উঠানে হইয়া থাকে। উচ্চতায় দশমবর্ষীয় শিশুর মস্তকও এই কুঁড়ে ঘরের শীর্ষস্থান স্পর্শ করিতে পারে। তাহার উপর কেহ এই সূতিকা-গৃহের নিকটে আসিতে পারিবে না। সূতিকাগৃহ স্পর্শ করিলেই তাহাকে স্নান করিতে হইবে—ইত্যাদি কুসংস্কারাচ্ছন্ন হইয়া শতকরা ৭৫টী সদ্যোজাত শিশু ইহধাম পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছে। আমাদের জ্ঞান-গরিমা যতই বৃদ্ধি হইতেছে, ততই আমাদের বিলাসতরঙ্গের উৎস ছুটি-তেছে। আমরা আমাদের অর্জ্জিত জ্ঞানের অপব্যবহার করিতেছি। জ্ঞানে কুসংস্কারান্ধকার দূর করিয়া থাকে। আমাদের জ্ঞান আমাদের নৈতিকশক্তি হ্রাস করিয়া দিতেছে। আমাদের জ্ঞানী অচল-অটল স্থাণুবৎ দাঁড়াইয়া থাকিয়া আপনার জ্ঞানের উপাসনায় অনন্তে মিশাইয়া যাইতেছেন।

ভারতে বহুকাল হইতে যে জ্ঞান সংস্কাররূপে বংশপরম্পরা চলিয়া আসিতেছে, পৃথিবীর অন্য দেশে তাহার আজ পর্য্যন্তও আবিষ্কার হয় নাই। আবিষ্কার হইলেও তাহা নূতন তথ্যরূপে জগতে প্রচারিত হইতেছে। আমাদের দেশের নিরক্ষর স্ত্রীলোকেরাও জ্ঞাত আছে, গর্ভের লক্ষণ কি কি? কত দিনে সন্তান হইতে পারে? গর্ভের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে কি কি করিতে হয়, তাহা বঙ্গ-গৃহিণীগণ পরিজ্ঞাত আছেন। আমাদের দেশে চান্দ্রমাস-অনুযায়ী গর্ভকাল গণনা হইয়া থাকে। অষ্টমমাস হইলে গর্ভিণীর স্থানান্তরে যাওয়া নিষেধ। প্রথম রজোদর্শনের দিনে পঞ্চজন "এয়ো" বা সধবা স্ত্রীলোকে পাঁচটি ফল নব রজস্বলা রমণীর অঞ্চলে বাঁধিয়া দিয়া তাঁহাকে নির্জ্জন গৃহে বাস করিতে উপদেশ দেন। পুরুষ বা সূর্য্যের মুখ দেখিতে দেওয়া হয় না। ইহার পর শাস্ত্রমতে সংস্কারাদি কার্য্য হইয়া থাকে। তারপর গর্ভাধান। হিন্দুর সকল কার্য্যের সহিতই ধর্ম্মকর্ম্মের সম্বন্ধ। এখানে হয়ত পাশ্চাত্য পণ্ডিত বলিবেন, শিশুর দন্তোদ্গম হইলেই

তাহার মাংস হজম করিবার শক্তি হয় না। আমরা কোন বিষয়ের মীমাংসা করিবার শক্তি রাখি না, প্রাচীন কথার সমাবেশ করিবারই ইচ্ছা করি।

মহাভারতের পাঠক অবগত আছেন, রাজা পরীক্ষিৎ ষষ্ঠমাসে ভূমিষ্ঠ হইয়া ৬৫ বৎসর কাল জীবিত ছিলেন। জন্মমাত্র শিশুর জীবনীশক্তির চিহ্নমাত্র ছিল না। কুলক্ষয়ের সময়ে জন্মিয়াছিলেন বলিয়া অর্জ্জুন-তনয় অভিমন্যু-পুত্রের নাম পরীক্ষিৎ হইয়াছিল। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শিশুর জীবন সঞ্চার করিয়াছিলেন। আজ-কালকার স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান বলিয়া থাকে যে, ১৮০ দিনে যে সন্তান জন্মে তাহাও জীবিত থাকিতে পারে। এই তথ্য অতিপুরাকালে ভারতের লোকে আধুনিক মেডিক্যাল্ জুরিশ-প্রুডেন্সের হইলেও জানিতেন। পুরাকালে লোকশিক্ষাদি জন্য পুরাণাদি পাঠের ব্যবস্থা ছিল। পৌরাণিক জ্ঞান-গরিমা এইভাবে লোক-সমাজে প্রচারিত হইয়া সাধারণের হিতসাধন করিত। এখন পুরাণপাঠ লোপ পাইয়াছে; শিক্ষিত লোকেরাও এখন পুরাণাদি পাঠ করেন না। কাজেই প্রকৃত হিন্দুধর্ম্মের শাসনাদি লোকের নিকট অপরিজ্ঞাত থাকিয়া কুসংস্কার প্রকৃত ধর্ম্মের স্থানাধিকার করিয়া হিন্দুকে অহিন্দুর সাজে সাজাইয়া ভয়ঙ্কর বৈষম্য উপস্থিত করিয়াছে। হিংসায় ও ভেদজ্ঞানে হিন্দু রসাতলে যাইতে বসিয়াছে! জ্ঞানের অপব্যবহার আর কাহাকে বলে?

পরীক্ষিৎ-জননী উত্তরার সূতিকাগৃহের যে বর্ণনা ব্যাসদেব অশ্বমেধ পর্ব্বে পরীক্ষিতের জন্মদিনে করিয়াছেন, তাহা আজকালকার কুসংস্কারাচ্ছন্ন বাঙ্গালী হিন্দু সকলেরই পাঠ্য। সেই সূতিকাগৃহ আজকালকার রাজা-মহারাজের বিলাসনিকেতনকেও সাজ-সজ্জায় ম্রিয়মাণ করিয়া দেয়। ইহার কেবল এইমাত্র বিশেষত্ব যে, সকলের শয়নগৃহ হইতে পৃথক্ স্থানে সন্নিবেশিত। প্রসবকালে সকল প্রৌঢ়ারমণীগণ সূতিকাগৃহে উপস্থিত

থাকিয়া প্রসবের সাহায্য করিয়াছিলেন। সদ্যোজাত শিশুকে কোলে করিয়া পাণ্ডব-জননী কুন্তী উপবেশন করিয়াছিলেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই শিশুর জাত-কর্ম্মাদি সকল কার্য্য স্বয়ং নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। আজ সদ্যোজাত-শিশুর জাতকর্ম্ম কেহ করিলে, তাঁহাকে পতিত হইতে হয়। এই মহাভারতে নাড়ীচ্ছেদে বংশের নীল বা চোঁচ ব্যবহার প্রথার কথা আছে। নাড়ীর গাঁইট বা গিরা হইতে চারি অঙ্গুলি ব্যাপিয়া একটি গিরা শক্ত করিয়া বাঁধিয়া নাড়ীর গাঁইটের নিকট একটি বন্ধন দিয়া দুই বন্ধনের মধ্যভাগে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পরীক্ষিতের নাড়ীচ্ছেদ করিয়াছিলেন। এই প্রথা এখনও ভারতে প্রচলিত আছে। ইহাতে রক্তপাত হইতে শিশুর জীবন রক্ষা করে। মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে গর্ভস্থ ভ্রূণের অবস্থাদির বর্ণনা আছে। প্রথমমাসে ক্ষুদ্র সূত্রবৎ আকার ধারণ করে। দ্বিতীয়-মাসে মস্তকের, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির, মেরুদণ্ড, মূত্রাশয় ও হৃদ্‌পিণ্ডের আকার-পরিগ্রহের চিহ্ন দেখা যায়। তৃতীয়মাসে জীবের "ফুলের" (Placenta) সঞ্চার হয়। এই সময়ে দেহের আকার দুই অঙ্গুলি হয়। চতুর্থ মাসের ভ্রূণে স্ত্রী-পুরুষ-আকৃতি দেখা দিয়া থাকে। জীবদেহও পঞ্চাঙ্গুলি পরিমাণ দীর্ঘ হয়। পঞ্চমমাসে জীব-শরীরের মস্তকে চুল ও নখের সঞ্চার হইতে থাকে। শরীরের পরিমাণও দ্বাদশ অঙ্গুলি হইয়া থাকে। সপ্তমমাসে জীবশরীরের চক্ষু ফুটিয়া থাকে। অষ্টমমাসে গর্ভিণী হইতে প্রাপ্ত আচ্ছাদনাদি হইতে ক্রমশঃ বিয়োজিত হইতে থাকে। নবমমাসে জীবের বীজকোষ, অণ্ডকোষ পর্য্যন্ত লম্বিত হইয়া অধঃশিরা হইতে আরম্ভ করে। দশমমাসে অধঃশিরা হইয়া ভগবানের নাম করিতে থাকে। গর্ভিণীর দেহের সহিত নাড়ী দ্বারা জীব সংযোজিত থাকায় জীবদেহ গর্ভিণীর দেহের সহিত পরিপুষ্ট হইতে থাকে। তৃতীয়মাস পর্য্যন্ত "ফুল" দ্বারা জীব-শরীর পুষ্ট হইতে থাকে। আধুনিক ধাত্রীবিদ্যা সম্ভবতঃ ইহার অধিক আজ

পর্য্যন্ত অগ্রসর হইতে পারে নাই। ইহার পর গর্ভরক্ষার নানাকথা প্রসঙ্গ আছে, এমন কি গর্ভিণীর আহারাদির বিচারও হইয়াছে। এমন কি, গর্ভিণীর চলাফেরার কষ্ট হইলে, তলপেটে ব্যাণ্ডেজ-মত বন্ধনীর দ্বারায় গর্ভরক্ষার উপদেশ পর্য্যন্ত আছে।

মহাভারতের আদিপর্ব্বপাঠে অবগত হওয়া যায় যে, ক্ষত্রিয়গণের তাড়নায় ঔর্ব্ব মুনির জননী পলাইয়া হিমালয়-পর্ব্বতের গুহায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। তথায়ও ক্ষত্রিয়গণ তাঁহার গর্ভস্থ সন্তানকে বিনাশ করিবার কামনায় উপস্থিত হইলে জননী ব্রহ্মবিত্থা সন্তান প্রসব করেন। মহাভারতকার লিখিয়াছেন, তিনি ক্ষত্রিয়ভয়ে ভীতা হইয়া তাঁহার গর্ভ আপনার উরুদেশে সংস্থাপিত করেন। হিমালয় পর্ব্বতেই সন্তান প্রসব করেন। উরু হইতে সন্তান প্রসব হয় বলিয়া সন্তানের নাম ঔর্ব্ব হয়। উরুদেশেও গর্ভ হইতে পারে, সেই আদিকালেও ভারতীয় ঋষিগণের জানা ছিল। আজকালকার ধাত্রী-বিত্থার পাঠকও জানেন False pain pregnancy হইতে পারে। False pain tube উরুদেশে সংস্থাপিত। ইহার দৈর্ঘ্য ৩।৪ ইঞ্চের বেশী হইবে না। False pain pregnancyর সন্তান জীবিত থাকিতে পারে কি না তাহা আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞান বলিতে পারে কি না আমরা পরিজ্ঞাত নহি।

আমাদের দেশে সন্তান প্রসব হইবার পর ছয় দিনের দিন ষষ্ঠীপূজা হইয়া থাকে। এই পূজা-ব্যাপারে আধুনিক শিক্ষিত লোকে হয়ত বলিবেন, ইহাও হিন্দুর একটী কুসংস্কার। বাস্তবিক পক্ষে ইহার সঙ্গে প্রাচীন ধাত্রী-বিত্থার অতি নিকটসম্বন্ধ জড়িত আছে। হিন্দুর বিশ্বাস "ষষ্ঠী জাগর বাসরে" বিধাতাপুরুষ আসিয়া সত্থোজাত শিশুর ললাটে তাহার জীবনের শুভাশুভ ঘটনাবলী লিখিয়া দিয়া যাইয়া থাকেন। এখান হইতে "ললাটলিপির" সৃষ্টি। কিন্তু ইহার মধ্যে ধাত্রীবিত্থায় যে তথ্য লুক্কায়িত আছে,

তাহা সাধারণ-চক্ষে প্রতিভাত হয় না। ছয় দিবস অতীত হইলে প্রসবের বিপদ্ হইতে প্রসূতি নিরাময় হয়েন। সদ্যোজাত শিশুরও ধনুষ্টঙ্কারে প্রাণ যাইবার আর কোনও সন্দেহ থাকে না। ছয় দিন অতীত হইলে প্রসূতির আর সূতিকাজ্বর হইবার আশঙ্কা থাকে না। আধুনিক ধাত্রী-বিদ্যা-বিশারদগণ বলিয়া থাকেন, ছয় দিনের মধ্যে প্রসূতির যে জ্বর হয়, তাহার নাম "Puperal fever" সূতিকাজ্বর। এই জ্বরে অনেক প্রসূতি কালকবলে পতিত হইয়া থাকেন।

প্রসূতিকে একাকী প্রসবান্তে সংসারের গোলমাল হইতে দূরে রাখিতে হয়। তাহাকে প্রসবান্তে কিছু দিন সাংসারিক কোনও কার্য্যে যোগ দিতে দেওয়া উচিত নহে। প্রসূতিকে সর্ব্বতোভাবে বিশ্রাম করিতে দেওয়া উচিত। এমন কি প্রসূতিকে পরিবারের কোনও লোকজনের সহিত মিশিতে বা কথাবার্ত্তা কহিতে দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। এই তত্ত্বও প্রাচীন ভারতে অপরিজ্ঞাত ছিল না। এই কারণেই প্রাচীন ঋষিগণ স্মৃতি-শাস্ত্রে প্রসূতির এক মাস কাল অশুচির ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই অশুচি-ব্যাপার যদি না থাকিত, তাহা হইলে কত শত প্রসূতি যে কাল-কবলে কবলিত হইতেন, শুভঙ্করও বোধ হয় তাহার সংখ্যা করিতে পারিতেন না। কুসংস্কার এখানে Segregationএর কার্য্য করিয়া প্রসূতির স্বাস্থ্যরক্ষা করিয়াছে। সংক্রামক পীড়া স্পর্শাদিদোষ হইতে আর প্রসূতিকে আক্রমণ করিতে পারে না। এক মাস কাল এই ভাবে একাকী বিশ্রামাগারে বসবাস করিয়া প্রসূতি স্বাস্থ্যোন্নতি করিয়া থাকেন। প্রসবের দিন প্রসূতিকে হিন্দু গৃহিণীগণ উপবাসী রাখিয়া থাকেন। দ্বিতীয় দিনে প্রসূতিকে তাঁহারা লঘু পথ্য দিয়া থাকেন এবং তৃতীয় দিন হইতে ষষ্ঠ দিন পর্য্যন্ত একাহারের ব্যবস্থা আছে। সপ্তম দিবস হইতে আতপ চাউলের অন্ন ও মৎস্যের ঝোলের ব্যবস্থা হইয়া থাকে। এইভাবে পূর্ণ

এক মাস অতীত হইলে প্রসূতি ক্ষৌরাদি-কার্য্য করিয়া সূর্য্যার্ঘ্য দিয়া শুচি হইয়া থাকেন। এইভাবে ধর্ম্ম-কার্য্যের ভাণে শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা পালন করিয়া অজ্ঞাতভাবে হিন্দুগণ তাঁহাদের ধাত্রী-বিদ্যার পরিচয় দিয়া আসিতেছেন। অশিক্ষিতা ধাত্রীদের অজ্ঞানতাবশতঃ এই সকল নিয়ম ও বন্ধনের মধ্যেও দুর্ঘটনা হইয়া থাকে। আধুনিক শিক্ষিতগণ সেদিকে একবারও দৃষ্টিপাত করেন না। জ্ঞানী এইভাবে আপনার জ্ঞানের অপব্যবহার করিয়া কত বিপদ্-আপদে পড়িয়া অশান্তি ভোগ করিতেছেন, তাহা তাঁহার ভাবিবার বা চিন্তা করিবার অবসর আছে কি না আমরা আদৌ বুঝিতে অক্ষম।

পুরাণাদির কথা ছাড়িয়া দিলে প্রাচীন মেয়েলীব্রত-কথার মধ্যেও প্রাচীন ভারতের ধাত্রীবিদ্যার অনেক নিদর্শন পাওয়া যায়। সন্তানহিত-কামনায় জননীগণ ষষ্ঠীপূজার অনুষ্ঠান বৎসরের মধ্যে কয়েকবার করিয়া থাকেন। আমরা এখন সেগুলি কুসংস্কার বলিয়া সমাজ হইতে বিতাড়িত করিতেছি। কিছুদিনের পর আর "ব্রত" কথার চিহ্ন পর্য্যন্তও থাকিবে না। ক্রমে প্রাচীন ধাত্রীবিদ্যা একবারে ভারত হইতে বিলুপ্ত হইবে।

উচ্চ-উপাধিধারীর কথা বলি না। যাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি পরীক্ষা দেওয়ায় ক্ষমতাপ্রাপ্তি আশয়ে পাঠ আরম্ভ করিয়া থাকিল তাঁহারাও কালিদাসের রঘুবংশের তৃতীয় সর্গে পাঠ করিয়াছেন, সুদক্ষিণার গর্ভ-লক্ষণ প্রকাশ পাইলে গর্ভরক্ষার জন্য ও সুপ্রসবের নিমিত্ত মহারাজ "অজ" কি কি ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। প্রাচীন ধাত্রীবিদ্যা আপনার গুণ-গৌরবে এমন প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল যে মহাকবি কালিদাস তাঁহার কাব্যমধ্যে তাহার উল্লেখ পর্য্যন্ত না করিয়া পারেন নাই। আর আজ গর্ভাবস্থার প্রথম তিন মাসের বমন-উদ্রেক দেখিলে আমরা তাহা নিবারণ করিতে অসমর্থ। প্রাচীনা বলিয়া দিবে লবঙ্গের জল খাইলে সেই বিবমিষা একবারে সারিয়া যাইয়া প্রসূতিকে শান্তি দিয়া থাকে।

আমরা এই পরম উপকারী বিদ্যায় একবারে উদাসীন হইয়া পদে পদে অশান্তি ভোগ করিতেছি। লোকশিক্ষা-প্রচারের প্রধান সহায় মাসিক ও সাপ্তাহিক কাগজাদিতে কবিতা, উপন্যাস প্রভৃতি স্থান পায়, কিন্তু এসম্বন্ধে কোনও কথা লিখিত ও পঠিত হয় না। অন্তঃপুরবাসিনীদিগকে এ বিষয় শিক্ষা দেওয়ার কোনও চেষ্টা M. D, M. B, L. M. S,রা করেন না। অন্য দেশের সম্রাজ্ঞীরাও আপন আপন সন্তানকে জীবনের অভিজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়া শিক্ষা দিয়া থাকেন। কেবল অতি প্রয়োজনীয় বিষয়ে উদাসীন থাকিয়া আমরা জ্ঞানের অপব্যবহার করিয়া থাকি বলিয়াই আমাদের কবি আমাদের জাতীয় জীবন এক কথায় প্রকটিত করিয়া গিয়াছেন, "ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়।"

শ্রীকালীকান্ত বিশ্বাস।

ভারতে রোগোৎপত্তির কারণ এবং পল্লীবাসের অযোগ্যতা

সর্ব্বসুখ-স্বাস্থ্য-প্রদায়িনী ভারতভূমি বর্ত্তমান সময়ে দুঃখ ও অস্বাস্থ্যের আবাসে পরিণত হইয়াছে। ইহার মূলানুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, দারিদ্র্যই তাহার মূলীভূত কারণ। দারিদ্র্যের ভীষণ পীড়নে, এক-দিকে যেমন নিজ শ্রম-লব্ধ ফলের অসদ্ভাবহেতু শ্রম-বিরক্তি জন্মিতেছে, অপরদিকে তেমনি তদ্ধেতু স্বাস্থ্যভঙ্গ হইতেছে। কাহাকে কোন্ কর্ম্মে স্বল্পাধিক শ্রম করিতে বলিলে, প্রত্যুত্তর পাওয়া যায়, "যে বিদ্যা শিখিয়াছি, তাহারই পারিশ্রমিক পাইতেছি না—আর পরিশ্রম করিয়া কি করিব ?"

শ্রমবিমুখতায় যেরূপ স্বাস্থ্যের হানি হয়; আবার উদরপূর্ত্তির জন্য নিয়মাধিক শ্রমহেতু সেরূপ দেহের ক্ষয় হয়। সে ক্ষতিপূরণের সংস্থান-অভাবে জীবনের জড়ীয়-ভিত্তি শিথিল হইতেছে, কাজেই দেহ ব্যাধির আবাসস্থল হইতেছে। আবশ্যকীয় পরিমিত পুষ্টিকর খাদ্যদ্রব্যের অভাব ও অপাচ্য দ্রব্যের সমধিক প্রভাবহেতু পরিমাণরক্ষা না হওয়ায় পোষণ-প্রবাহ (Nutritive stream) স্থাপিত হইয়া জীবনী-শক্তির (Vital force) স্তব্ধতা আনয়ন করে, এবং তাহাতেই দেহে নানাবিধ বীজাণুরূপ শত্রুর আধিপত্য বিস্তার করিবার সুযোগ ঘটিয়া থাকে। মূলকথা, দেহের জীবনী-শক্তি-সম্পন্ন কোষাবলীর (Cell protoplasm or amoeba) অবসাদই রোগোৎপত্তির কারণ।

বর্ত্তমানকালে ভারতে বাষ্পীয় শকট, বাষ্পীয় পোত, এবং কল-কারখানার অত্যধিক প্রচলন অস্বাস্থ্য ও দারিদ্র্যের অন্যবিধ উদ্দীপক কারণ। এই সবের প্রচলনের যে আবশ্যকতা নাই, তাহা বলা যায় না। কারণ, দেশে সভ্যতাবিস্তার, ভাবের আদান-প্রদান, কিঞ্চিৎ ধনবৃদ্ধি, আমদানী-রপ্তানীর এবং শীঘ্র যাতায়াতের সুবিধা হইতেছে। তবে, দেশ-কাল বুঝিয়া প্রচলন-নিয়মের ব্যবস্থা করিতে হইবে, এবং দেশ, কাল, পাত্র বিবেচনা করিয়া প্রচলনের গতি-নির্ণয় করিতে হইবে। এই সমুদায়ের যতই প্রসার-প্রতিপত্তি পাইতেছে, ততই ভারতবাসী অকর্ম্মণ্য হইয়া দরিদ্র হইতেছে এবং বীর্য্যহীন হইয়া ব্যাধির করাল-কবলে নিপতিত হইতেছে। ইহাতে ভারতবাসীর যেমন যাতায়াতের, আমদানী-রপ্তানীর সুবিধা ও শ্রমের লাঘব হইয়াছে সত্য, তেমন আবার নদীর প্রাকৃতিক স্রোত অবরুদ্ধ হওয়ায়, বদ্ধ-জলাশয়, ডোবা, খাল-বিল ইত্যাদির সৃষ্টি হইয়া অবিরত পূতিবাষ্পোদ্গমে এবং দূষিত পানীয় সেবনে জন-সমাজ পীড়িত হইয়া পড়িতেছে। দেশব্যাপী রেলের রাস্তা হওয়ায়, রাস্তার

দুইধারে গর্ত্ত খনন করা হইতেছে এবং রাস্তার বাঁধের দরুণ জমির জল-নিকাশ হইতে পারিতেছে না। এই উভয় কারণেই বহু সময় ব্যাপিয়া জল আবদ্ধ থাকায় পূতিবাষ্পের উদ্ভব হইয়া ম্যালেরিয়ার বীজ সৃষ্টি করিতেছে। পরন্তু নদীর উপর সেতু নির্ম্মাণ করায় প্রাকৃতিক স্রোত বাধা পাইয়া নদী ক্ষীণা হইতেছে। আবার নদীর উপর অবিরত ষ্টীমার চলায়, প্রাকৃতিক বায়ু-বিতাড়িত-তরঙ্গাঘাতে দুইকূল ভাঙ্গিয়া যে পরিমাণে নদী ভরাট হয়, তদপেক্ষা অবিরত ষ্টীমারের তরঙ্গাঘাতে নদী অধিক ভরাট হইতেছে। স্বাভাবিক স্রোত এবং বায়ু-তাড়িত তরঙ্গাঘাতে নদীর এককূলই স্বভাবতঃ ভাঙ্গে, কারণ, স্রোতের তীব্রতা একদিকেই হয় এবং বায়ুও একদিকেই প্রবাহিত হইয়া থাকে। স্বভাবতঃ এক কূল ভাঙ্গে, অপর কূল গড়ে। আর, এই অবিরত অস্বাভাবিক তরঙ্গাঘাতে নদীর উভয় কূলই সমভাবে ভাঙ্গিয়া নদীর অবস্থা হীন করিয়া ফেলে। অর্ণবযান চলিবার উপযুক্ত ক্ষেত্র অর্ণব-ই, বোধ হয়, নদীসমূহ নহে। এই ক্ষীণকায় নদীসমূহে ষ্টীমার চলিবার সুবিধার জন্য, ষ্টীমার-কোম্পানী আবার নদীর উভয় পার্শ্ব বাঁধিয়া বিস্তৃত স্রোতকে এক-স্রোত করায়, উভয় পার্শ্বই শৈবালময় হইয়া জল অপেয় হইয়া উঠিতেছে। ষ্টীমার-কোম্পানী ক্ষীণ দেহকে একেবারেই মৃতদেহে পরিণত করিতে যাইতেছেন।

> "রাজহংস করে কেলি স্বচ্ছ-সরোবরে,
> যায় কি সে কভু আর পঙ্কিল সলিলে, শৈবালদলেরধাম।"

এই চিরপ্রসিদ্ধ কথাটি এখন দেখি কেবল কবির কল্পনাতেই পর্য্য-বসিত হইতে চলিল। স্বচ্ছসরোবর ত এখন শৈবালদলেরধাম পঙ্কিল সলিলে পরিণত হইয়াছে, তটিনীও এখন পঙ্কিল সলিল ও শৈবাল-দলের-ধাম হইতে চলিল। রাজহংস এখন কেলি করিবে কোথায়? সেজন্য এখন দায়ী হইবেন কে? নদীর এই হীনতার কারণেই হউক আর

ষ্টীমারের প্রতাপেই হউক, ক্রমে ক্রমে বাঙ্গালীর প্রধান খাদ্য মৎস্যাদির বংশলোপ হইতেছে। নদীর ক্ষীণতায় জল দূষিত হইতেছে এবং তদুপরি আবার মৎস্যাদির (Natural scavengers and purifiers) অভাবে জলের আবর্জ্জনাদির পরিষ্কারের ক্রটিতে আরও বিষদুষ্ট হইয়া রোগোৎপত্তির কারণ হইতেছে। কল-কারখানার অত্যধিক প্রচলনে, সহরে ও পল্লীগ্রামে বিভিন্ন রুচির বৈদেশিক লোক মাত্রাধিক বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহাতে খাদ্যদ্রব্য অত্যধিক মহার্ঘ্য ও অপ্রাপ্য হইয়া উঠিতেছে। এই লোকবৃদ্ধিহেতু খাদ্যদ্রব্যের অভাবই মনুষ্যসমাজে জীবন-সংগ্রামের একমাত্র কারণ এবং ইহাই চুরি-ডাকাইতির প্রশ্রয়দাতা। অভাবেই লোকের স্বভাব নষ্ট হয়। লোকবৃদ্ধি হইতেছে, অথচ খাদ্য ও বাসস্থান 'যথাপূর্ব্বং তথাপরং' কিন্তু অংশী অনেক; কাজেই, ঘোরতর সংগ্রামের পর যোগ্যতমের বা প্রবলতমের উদ্বর্ত্তন-ফলে (Survival of the fittest or strongest) বিজয়িদলই নানাপ্রকার বাধা-বিঘ্নের ভিতর দিয়া ঈপ্সিত-দ্রব্যপ্রাপ্তির যোগ্য হইয়া উঠিতেছে। যোগ্যের ও অযোগ্যের বৃদ্ধির তারতম্যানুসারে ধ্বংসের অনুপাত নিরূপিত হইয়া থাকে। যোগ্যতমের মাত্রাতীত পরিবর্দ্ধনই অযোগ্যের বিনাশের কারণ। আত্মরক্ষার জন্য প্রাণান্ত-পরিচ্ছেদ চেষ্টাপরায়ণতার যে অবস্থা, তাহারই নাম Struggle for existence—সত্বা বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা। অযোগ্য হইতে যোগ্যের যে পার্থক্য-সংঘটন, তাহারই নাম Natural selection—প্রাকৃতিক পাত্রনির্ব্বাচন। আর, অযোগ্যের উচ্ছেদ এবং যোগ্যের উদ্বর্ত্তন, তাহারই নাম Survival of the fittest-যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তন। বর্ত্তমান সময়ে, ভারত, এই অবস্থাত্রয়ের কোন্ অবস্থায় উপনীত তাহা বিশেষ চিন্তা করিবার বিষয়। গৃহ-কার্য্যাদির জন্য মুটে-মজুর-পাইটের বিশেষ অভাব হইতেছে এবং কল-কুঠীর আবর্জ্জনাদি

ও ব্যক্তিসঙ্ঘের মলমূত্রাদিতে স্থানীয় জলবায়ু দূষিত হইয়া উঠিতেছে। সহর পরিষ্কারের ব্যবস্থা থাকায় এবং খাদ্য দ্রব্যাদির ও মজুর লোকের আমদানী থাকায় তত অসুবিধা হইতেছে না, কিন্তু এ সবের অভাবে গ্রামের অবস্থা বড়ই শোচনীয় হইয়া উঠিতেছে।

যে সময় হইতে ভারতে এ সবের প্রচলন বেশী হইয়াছে, সেই সময় হইতেই রোগের প্রকোপ বেশী হইয়াছে, দেখা যাইতেছে। যখন এ সবের প্রচলন ছিল না, তখনও ভারতভূমি বর্ত্তমান সময় অপেক্ষা আর্থিক ও দৈহিক-সম্বন্ধে সমধিক সমৃদ্ধশালিনী ছিল। তখনও ভারত হইতে বহুবিধ পণ্যসমূহ বিদেশে রপ্তানি হইত এবং কোটি কোটি টাকা ভারতে আসিত। ভারতবাসী নীরোগ শরীরে স্বাস্থ্যসুখ ভোগ করিয়া দীর্ঘজীবী হইত। স্থিতিশীল দরিদ্রতা বা নৈসর্গিক পরিবর্ত্তন যে কোন প্রচ্ছন্ন কারণেই হউক, সুজলা-সুফলা-শস্যশ্যামলা ভারতভূমি এখন একরূপ নির্জ্জলা-নিষ্ফলা-বিরলশস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আবার, গোচারণ-ভূমির অভাবে এবং দরিদ্র গোরক্ষকদিগের অসমর্থতায় গবাদির খাদ্য-সংরক্ষণের বড়ই অভাব পরিলক্ষিত হইতেছে, তদ্ধেতু গোকুল অন্নাভাবে বড়ই দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে এবং হীনস্বাস্থ্য গাভী দ্বারা কৃষকেরা আবার হলকর্ষণ করায় তাহারা আরও অসুস্থ ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িতেছে। অতএব, দিন-দিনই দেশে দুগ্ধের পরিমাণ স্বল্প হইয়া যাইতেছে। আজকাল পুষ্করিণীর পাড়, রাস্তার ধার এবং জমির আলি ব্যতীত গোচারণ-যোগ্য স্থান বাঙ্গলাদেশে সুদুর্ল্লভ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। দেখিতে পাওয়া যায়, এক্ষণে অনেক জমিদার পুষ্করিণীর পাড়, ভরাট পুষ্করিণীর গর্ভ পর্য্যন্ত জমা-বন্দোবস্ত করিয়া ফেলিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তাহার ফলে, সর্ব্বত্রই খোঁয়াড়ের সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পাইতেছে। গোচারণ-যোগ্য-ক্ষেত্র না রাখাতে প্রত্যহ বহু গো, মহিষ খোঁয়াড়ে পড়িতেছে। এই

সমস্ত পাপজনক কার্য্যগুলির জন্য অনেকাংশে জমিদার মহাশয়দিগকেই দোষী সাব্যস্ত করা যাইতে পারে। যদি এখনও জমিদারবর্গ বিশেষতঃ হিন্দু জমিদারবর্গ একটু ত্যাগশীল না হন, ধর্ম্মবিশ্বাসী না হন, তবে অচিরাৎ দেখিতে পাওয়া যাইবে—তাঁহারা পেটের দায়ে উঠান চষিতে আরম্ভ করিয়াছেন এবং গরুমহিষগুলি খোঁয়াড়ের সম্পত্তিতে পরিণত হইয়া গিয়াছে। ইহার ফলভোগ সকলকেই সমভাবে করিতে হইবে।

হায় রে! আর মাঠে মাঠে পূর্ব্বের ন্যায় হৃষ্টপুষ্ট গরুর পাল দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না। আহা! সেই শ্যামলবৃন্দাবনে শ্যাম সখা-সনে গোপাল মধুর বংশীরবে আর বিচরণ করে না। সুস্থকায় বৎসগণ ঊর্দ্ধ-পুচ্ছ হইয়া ইতস্ততঃ পরিভ্রমণকরতঃ নব দুর্ব্বাদল ও প্রচুর মাতৃস্তন্য ভক্ষণ করে না। ধবলী-শ্যামলী গাভী সকলের সুমধুর হাম্বারবে শ্যামল বৃন্দারণ্য আর মুখরিত হয় না। তাহাদের সে স্বাধীনতাসুখ চলিয়া গিয়াছে—আনন্দসূচক হাম্বারবের বিষাদ-ধ্বনি এখন কাণে বাজিতেছে। ২৫।৩০ বৎসর পূর্ব্বেও এই বাঙ্গলাদেশে যথেষ্ট পতিত জমি ছিল। সর্ব্বত্রই যথেষ্ট গো-মহিষ ছিল এবং সে সমস্ত পশুগুলির স্বাস্থ্য অনেক ভাল ছিল। সে সময় অনেক গৃহস্থের এক মণ, দেড় মণ পর্য্যন্ত দুগ্ধ হইত। ছোট ছোট উৎসব অনুষ্ঠানে অনেক গৃহস্থ দুগ্ধ, ঘৃত এবং মাখন প্রভৃতির কার্য্য ঘর হইতেই চালাইয়া লইতে সমর্থ হইতেন। এখন একখানা গ্রাম ঘুরিলে অর্দ্ধ মণ দুগ্ধ সংগ্রহ করা দুঃসাধ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

পশুজাতির মধ্যে গোজাতির মন সর্ব্বাপেক্ষা সহজে বিরক্ত হয়—এই বিরক্তচিত্ততাহেতু তাহাদের দুগ্ধের অতি সহজেই গুণের ব্যত্যয় হয়। সুস্থ গাভীর দুগ্ধে যে সকল উপাদান থাকে, ব্যাধিগ্রস্ত কিম্বা বিকৃতচিত্ত গাভীর দুগ্ধে তদ্বিপরীত উপাদান দৃষ্ট হয়। এ ছাড়া অন্য দ্রব্যাদিও থাকিতে পারে। এই সকল দ্রব্য তাহাদের খাদ্য হইতে আসে। অনেক

সময় গাভীর খাদ্য নানাবিধ তৃণাদি, গাছপালা ও শস্যের গন্ধ দুগ্ধে অনুভূত হয়। গাভীকে অধিক পরিমাণে সুরাসার পান করাইলে তাহা দুগ্ধের সহিত নির্গত হয়। দুর্গন্ধপূর্ণ স্থানে অনেকক্ষণ রাখিয়া দিলে দুগ্ধেও তদনুরূপ গন্ধ অনুভূত হয়। গাভীর অনেকক্ষণ ঠাণ্ডায় থাকা, জলে ভিজা কিম্বা গরমে থাকা প্রভৃতি কারণে দুগ্ধের উপাদান ও পরিমাণের তারতম্য হয়। বিভিন্নজাতীয় গো-দুগ্ধের উপাদানেরও বিভিন্নতা দেখা যায়। গাভীকে দিনে দুইবার দোহন করিলে প্রাতের অপেক্ষা সন্ধ্যার দুগ্ধে স্নেহজাতীয় উপাদানের আধিক্য দৃষ্ট হয়। অতএব, গৃহস্থের বিশেষ বিবেচনা করিয়া স্তন্যদায়ী গাভীর খাদ্যের ব্যবস্থা করা উচিত। কারণ, খাদ্যের তারতম্যে দুগ্ধেরও তারতম্য হইয়া থাকে। গাভীসকল মুক্তভাবে উন্মুক্ত ময়দানে চরিয়া খাইতে পারিলে, তাহাদের স্বাভাবিক জ্ঞান বা প্রবৃত্তি অনুসারে উপযোগী খাদ্য এবং আহারোপযোগী খাদ্যাংশ (esculent parts) তাহারা বাছিয়া খাইতে পারে, তাহাতে তাহাদের শরীরের বিশেষ উপকার সাধন হয়। শাস্ত্রীয় স্বাস্থ্য-কথায় বলে,—

"স্বচ্ছন্দ থাহার দেহ বৎস সুস্থকায়।
সে গাভীর দুগ্ধ সদা অমৃত যোগায়॥"

মুক্তভাবে উন্মুক্ত বায়ুতে ইচ্ছামত বিচরণ করিতে পারিলে তাহাদের স্বাস্থ্যও ভাল থাকে এবং মনও প্রফুল্ল থাকে, তাহাতে দুগ্ধের উপকারিতা-শক্তি বর্দ্ধিত হয়। কথায় বলে, গোজাতির মনোভাব বুঝা কঠিন। অতএব, তাহাদের ব্যাধিনিরূপণও কঠিন হয়। তবে, মুক্ত ময়দানে স্বেচ্ছামত চড়িতে পারিলে ব্যাধি-প্রতীকারের জন্য নিজেরাই অনেক ঔষধ-তুল্য তৃণাদি বাছিয়া খায়। বাঁধা গরুর খাদ্যে তাহা হয় না—খাদ্য-সহযোগে অনেক অনুপযোগী অখাদ্যাংশও তাহাদের উদরস্থ হয়। তাহাতে ব্যাধি হয় ও দুগ্ধের গুণের তারতম্য হয়। লোকে কথায় বলে, "বাঁধা

গরুর যোগা ঘাস"। তবে, গৃহস্থের গৃহে কতকগুলি খাদ্য দেহপুষ্টির জন্য সংগৃহীত থাকে। গোমাতা মনুষ্য-মাতা হইতেও শ্রেষ্ঠ। মনুষ্য-মাতা কেবল সন্তানকে শৈশবেই স্তন্যদান করিয়া থাকেন, কিন্তু, গোমাতা মানবকে শৈশব হইতে বার্দ্ধক্য পর্য্যন্ত সমভাবে দুগ্ধপ্রদান করেন। অতএব, এই গরীয়সী গোমাতার খাদ্য এবং সেবা-শুশ্রূষার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা উচিত্। এই জন্যই হিন্দুরা গোজাতিকে এত সম্মানের চক্ষে দেখিয়া থাকেন।

একেই ত দুগ্ধ উৎপন্ন হইতেছে না, যাহা হইতেছে তাহাও দূষিত; অধিকন্তু, গোয়ালারা ব্যবসায় রক্ষার জন্য একভাগ দুগ্ধে তিনভাগ নানা-স্থানের দূষিত জল অতর্কিতভাবে মিশ্রিত করায় সে দুগ্ধ আরও বিষদুষ্ট হইতেছে। এবম্বিধ ব্যাপারগুলি রোগোৎপত্তির প্রধান কারণ হইয়া উঠিতেছে। স্বভাবতঃ দুগ্ধেই রোগ-বীজাণু বেশী উৎপন্ন হয়। অতএব, সে দুগ্ধ বিশুদ্ধ হওয়া একান্ত প্রয়োজন। যতপ্রকার খাদ্য আছে তন্মধ্যে দুগ্ধই নানাপ্রকার বীজাণুবর্দ্ধনের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী। সেজন্য ইহাতে নানাপ্রকার বীজাণু সহজেই জন্মিয়া থাকে। সুস্থ গাভীর দুগ্ধ ভিতরেই বীজাণুপূর্ণ কিম্বা বাহির হইবার সময় বীজাণুযুক্ত হইতে পারে। অবিকৃতাবস্থায় ইহাদিগের মধ্যে কতকগুলি রোগোৎপাদনকারী। আর, বিকৃতাবস্থায়ও অত্যধিক পরিমাণ বীজাণুর সৃষ্টি হয়। বিশেষ বৈজ্ঞানিক উপায়ে দোহন করিলে সুস্থ গাভী হইতে বীজাণুশূন্য দুগ্ধ পাওয়া যাইতে পারে। এই দুগ্ধকে বীজাণুশূন্য পাত্রে রাখিলে দুই বৎসর পর্য্যন্ত অবিকৃত অবস্থায় থাকে। সাধারণতঃ এরূপ দুগ্ধ পাওয়া অসম্ভব। সহরে ক্রেতার নিকট দুগ্ধ পৌছিতে ৬ হইতে ১২ ঘণ্টা পর্য্যন্ত সময় লাগে এবং এই সময় মধ্যে বীজাণুর সংখ্যাও যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। বাজারের দুগ্ধ সকল সময়েই বহুপরিমাণ বীজাণুপূর্ণ থাকে। এই সকল কারণে, ইহাদের সংখ্যার অনেক তারতম্য হয়।

আমেরিকার কলোম্বিয়া প্রদেশে নির্দ্ধারিত আছে যে, প্রথম শ্রেণীর ১৭ ফোটা দুগ্ধে (in ice of certified milk) ৫০০০এর অধিক বীজাণু থাকিবে না। বিশেষরূপ উপায় অবলম্বন করিলেও দুগ্ধে বীজাণুর সংখ্যা ইহাপেক্ষা কম করা যায় না। ১৭ ফোটায় (ice) ৫০০০এর অধিক হইতে ১,০০,০০০ লক্ষ পর্য্যন্ত বীজাণু থাকিলে তাহা দ্বিতীয় শ্রেণীর দুগ্ধ (Inspected milk) বলিয়া পরিগণিত হইবে।

যে দুগ্ধ অনেকক্ষণ অনাবৃত অবস্থায় রাখা হইয়াছে, তাহাতে বীজাণুর মাত্রা অধিক হয়। বীজাণুর সংখ্যা গণনা দ্বারা দুগ্ধ ব্যবহারের উপযোগী কি অনুপযোগী সে বিষয়ের বিশেষ কোন সিদ্ধান্ত হয় না। সংখ্যা-গণনা অপেক্ষা বীজাণু কোন্ জাতীয় তাহা জানাই অধিক আবশ্যক। দুগ্ধজাত অধিকাংশ জীবাণুই নিরাপদ, তাহারা কেবল দুগ্ধের পুষ্টিকারিতা হানি করিয়া নিজেদের সংখ্যা বৃদ্ধি করে। কিন্তু সময়ে সময়ে যক্ষ্মা, ডিফ্‌থিরিয়া, টাইফয়েড, কলেরা, উদরাময় এবং অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধির বীজাণু থাকিয়া দুগ্ধকে বিপজ্জনক করিয়া তুলে। সাধারণ বীজাণুর কতকগুলি দুগ্ধের অম্লত্ব উৎপাদন করে, কতকগুলি দুগ্ধের পচনে সহায়তা করে এবং অপর কতকগুলি বর্ণের পরিবর্ত্তন করে।

ভারতে দিন-দিনই খাদ্য-দ্রব্যাদির অভাব হইতেছে, বিশেষতঃ বাঙ্গলায়, বাঙ্গালীর প্রধান খাদ্য মৎস্যের অভাব, দুগ্ধ-ঘৃতাদির অভাব। বাঙ্গালী জীবন রক্ষা পাইবে কিরূপে? যে একটু দুগ্ধ মিলে তাহাও বিষাক্ত। অতএব বর্ত্তমান সময়ে ইহার প্রতীকারের উপায় চিন্তা বিশেষ প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছে। নহিলে, ভারতবাসী ক্রমেই ধ্বংসের পথে দ্রুত অগ্রসর হইবে।

নিম্নভূমি পূর্ব্ববঙ্গেই পাটের চাষ-আবাদ বেশী। তদ্দেশেও ইদানীং জলাভাববশতঃ পাট-পচনের সুবিধা এবং পট্ট-আঁশের উন্নতি-কল্পে মৃতকল্প-

নদীসমূহে পাট-পচন-প্রথা প্রচলন করায় নদীর জল অপেয় হওয়ায় ম্যালেরিয়ার প্রকোপ দিন দিনই বৃদ্ধি পাইতেছে। পাট-পচন-ক্রিয়াও কতকগুলি জীবাণু দ্বারা সংসাধিত হয়। এই সকল জীবাণু সেই পচন-জলে, পাটের জাগে এবং বায়ুতে অবস্থিতি করে। এই সকল জীবাণু অধিকাংশই মশক-বীজ-সম্ভূত বলিয়াই অনুমিত হয়। কারণ, মশকমাতা প্রধানতঃ দূষিত ও আবর্জ্জনাপূর্ণ জলেই ডিম্ব ত্যাগ করে। এই ডিম্ব এবং ডিম্ব-স্ফুট কীটগুলি ক্ষুদ্র মৎস্যাদির আহার, তাহারা ইহাদিগকে দেখিতে পাইলেই খাইয়া ফেলে। কাজেই, এরূপ স্থানেই ইহারা ডিম্ব প্রসব করিতে বাধ্য হয়। মশক-জীবনের মূলতত্ত্বও ইহাই। যে সব স্থানে এই পাট-পচন বেশী হয় এবং যথায় নল-খাগড়া উদ্ভিজ্জ ইত্যাদি আবর্জ্জনা-পূর্ণ দূষিত জলাশয় বেশী, তথায় মশক ও ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব বেশী দেখা যায়। ঐরূপ স্থানেই ঐরূপ জীবোৎপত্তির সম্ভাবনা স্বাভাবিক। কারণ, প্রাচ্য ও প্রতীচ্য উভয় দেশের বিবৃতিবাদী পণ্ডিতেরা "যৌন-নির্ব্বাচন" ও "প্রাকৃতিক-নির্ব্বাচন" এই দুই সূত্র লইয়াই সকল শ্রেণীর জীবের উৎপত্তি স্থির করিতে প্রায় একই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। ডারুইন বলেন, বিভিন্ন শ্রেণীর বিভিন্ন জীবে একই জীবাঙ্কুরের (Proto-plasm) ভিন্নরূপ বিকাশ। আর, সাঙ্খ্যদর্শনকার কপিল বলেন যে, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত বস্তুই মূল প্রকৃতির ভিন্নরূপ বিকাশ। উভয় প্রায় একই কথা। উভয় কথারই বেশ সামঞ্জস্য দেখা যায়।

ম্যালেরিয়া পল্লীগ্রামবাসীর প্রধান শত্রু হইয়া উঠিয়াছে। বর্ষার পরই ম্যালেরিয়ার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রকোপ দেখা যায়। পূতিবাষ্প হইতে উদ্ভূত একপ্রকার জীবাণু হইতে সর্ব্বপ্রথম ম্যালেরিয়ার উৎপত্তি হয়। নহিলে, প্রথম ম্যালেরিয়ার রোগী কোথা হইতে আসিল? ম্যালেরিয়াগ্রস্ত রোগীর রক্ত পরীক্ষা করিয়া বৈজ্ঞানিকগণ একরূপ জীবাণু দেখিতে

পাইয়াছেন। এই জীবাণু যে ম্যালেরিয়ার কারণ তাহার স্থিরসিদ্ধান্ত হইয়া গিয়াছে। এই জীবাণু ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে ফরাসী ডাক্তার ল্যাভেরান্ (Laveran) কর্ত্তৃক প্রথম আবিষ্কৃত হয়। ল্যাভেরান্ ইহাকে প্লাজমোডিয়াম্ ম্যালেরিয়া (*Plasmodium malaria*) নাম দিয়াছেন। ইহাকে বাঙ্গলায় ম্যালেরিয়া-বীজাণু-নামে অভিহিত করা যাইতে পারে। মশক-দংশনের দ্বারা এই জীবাণু মনুষ্য-শরীরে ক্রমশঃ সংক্রামিত হয়। মশকের সাহায্যে এই বীজাণু একদেহ হইতে দেহান্তরে, একস্থান হইতে স্থানান্তরে সঞ্চারিত ও সংবাহিত হইয়া থাকে। ইহারা ম্যালেরিয়ার বাহনমাত্র। কিন্তু সকল প্রকার মশক ম্যালেরিয়াবাহী নহে। "এনোফিলিস্ রসিয়াই" নামক কেবল এক জাতীয় মশকই ম্যালেরিয়া-বিষ বহন করিয়া থাকে। এনোফিলিসের কয়েকটি উপশ্রেণী আছে। এই মশক দ্বারাই বীজাণু মনুষ্য-শরীর মধ্যে নীত হয়। 'এনোফিলিস্' দংশন করিলেই যে জ্বর হইবে, তাহা নহে। ম্যালেরিয়া বীজাণু 'এনোফিলিসের' শরীর মধ্যে স্বতঃ উৎপন্ন নহে। ইহারা পরাঙ্গপুষ্ট কীটাণু—স্বাধীনভাবে জীবন ধারণ করিতে পারে না। ইহাদের প্রথম আশ্রয়দাতা মনুষ্য, দ্বিতীয় আশ্রয়দাতা মশক। ম্যালেরিয়াগ্রস্ত রোগীকে দংশন করিলেই রোগীর শরীর হইতে বিষ মশকে সংক্রামিত হয়। যখন এই-জাতীয় মশা ম্যালেরিয়াগ্রস্ত রোগীকে দংশন করে, তখন রোগীর রক্তের সহিত ম্যালেরিয়ার বীজাণুগুলি মশার পেটের ভিতর প্রবেশ করে ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। পরে যখন ঐ মশা কোন সুস্থ ব্যক্তিকে কামড়ায়, তখন সেই বীজাণুগুলি মশার হুলের ভিতর দিয়া দেহে প্রবেশ লাভ করে এবং রক্তের সহিত মিশিয়া যায়। ইহার পর ঐ বীজাণুগুলি সেই সুস্থ ব্যক্তির রক্তের ভিতরেই বসবাস করিতে থাকে। জীবরাজ্যে ম্যালেরিয়া-কীটাণুর স্থান সর্ব্বনিম্নস্তরে অবস্থিত। ইহারা প্রোটোজোয়া (Protozoa)

নামক জীবাণু শ্রেণীর অন্তর্গত। প্রোটোজেয়া জীবাণুর বিশেষত্ব এই যে, ইহাদের দেহ একটিমাত্র কোষ (cell) দ্বারা নির্ম্মিত। এই কোষটি প্রোটোপ্লাজম্ (Protoplasm) নামক জৈবণিক পদার্থ দ্বারা পরিপূর্ণ। কালক্রমে এই প্রাক্‌প্রাণী বা প্রোটোপ্লাজমের বিভাগ হয় এবং বিভক্ত আদিপদার্থ প্রাণপঙ্ক এক একটি নূতন জীবাঙ্কুর বা কোরককীটাণুতে (spores) পরিণত হয়। এই কোরককীটাণুগুলি রক্তের লোহিত-কণিকার মধ্যে আবদ্ধ না থাকিয়া বিমুক্ত হইয়া রক্তের মধ্যে ভাসিয়া বেড়াইতে থাকে। পুনরায় লোহিত-কণিকার মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহার সর্ব্বস্বধন যে হেমোগ্লবিন্ (Hoemoglobin) তাহা আহার করিয়া বেশ হৃষ্ট-পুষ্ট ও পরিণত হইয়া উঠে। আবার নূতন কোরক-কীটাণু উৎপাদন করিবার কালে রোগীর জ্বর দেখা দেয়। লোহিত-কণিকার যে অংশটুকু দেহসাৎ করিতে পারে না, তাহা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিন্দুর আকারে উহাদের গা-ময় ছড়াইয়া থাকে—ইহার নাম মেলেনিন্ (Melanin)। জীবাণু ও উদ্ভিজ্জাণুদিগের বংশবৃদ্ধি-প্রথা অতি অদ্ভুত। একটি প্রাণী দুইভাগে বিভক্ত হওয়ায় দুইটি প্রাণী উৎপন্ন হয় এবং ইহার প্রত্যেকে পুনরায় বিভক্ত হইয়া চারিটি প্রাণী সৃষ্টি করে। এইরূপে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই একটি প্রাণী হইতে লক্ষ লক্ষ প্রাণীর উৎপত্তি হইতে পারে। এইরূপ বাড়িয়া বাড়িয়া ইহাদের গাত্রনিঃসৃত বিষাক্ত রস দ্বারা রক্তকে দূষিত করে এবং তাহা হইতেই ম্যালেরিয়া-জ্বরের উৎপত্তি হয়। আমাদের দেশে এনোফিলিস্ মশক চিরকালই আছে, অথচ পূর্ব্বে এত ম্যালেরিয়া ছিল না। ইহার মুখ্য কারণ, ম্যালেরিয়া রোগীর অভাব। ম্যালেরিয়া রোগীর অভাবের সঙ্গে দেশ-বাসীর আর্থিক স্বচ্ছলতা—জলবায়ুর বিশুদ্ধতা—পল্লী বাসযোগ্য ছিল। ম্যালেরিয়া রোগীই সুস্থ ব্যক্তির ম্যালেরিয়া জন্মাইবার গৌণ বা উদ্দীপক

কারণ। এনোফিলিস্‌-বহুল স্থানে ম্যালেরিয়া রোগী আসিলেই তথাকার অধিবাসীদিগের ম্যালেরিয়া হইবার খুব সম্ভাবনা থাকে।

কোন কোন জায়গায় সময়ে সময়ে মশকের সংখ্যা এত বেশী হয় যে, সন্ধ্যার সময়ও বসিতে হইলে মশারি খাটাইয়া বসিতে হয়। বিশেষতঃ বর্ষাকালে ইহাদের উপদ্রব অত্যন্ত অধিক হয়। এই মশকজাতির আকৃতি-প্রকৃতি এবং ব্যবহার জানিয়া রাখা আবশ্যক, তাহা হইলে আমরা পূর্ব্ব হইতে সাবধান হইতে পারি। বিশেষ মনোযোগ-সহকারে না দেখিলে কেবল ছোট, বড় ব্যতীত সব মশকই এক রকমের বোধ হয়, কিন্তু তাহা নহে। সাধারণ মশক ও ম্যালেরিয়াবাহী মশক এই দুই রকমের মশক আছে। ইহাদের মধ্যে পার্থক্য আছে। সচরাচর যে সকল মশক দেখা যায়, তাহারা সাধারণজাতীয়। সাধারণ মশকের পেটের নীচে ডোরা ডোরা দাগ ও একটী হুল আছে। এই হুলটি মশার শরীরের সহিত সমকোণে থাকে, কাজেই দেওয়ালের গায়ে সোজা হইয়া বসে। আর ম্যালেরিয়াবাহী মশকের পালকে ছিট্‌ ছিট্‌ দাগ আছে, সাধারণ মশকের ন্যায় হুল ছাড়া হুলের দুই পাশে দুইটি শুঁড় থাকে, আর হুলটি সাধারণ মশার ন্যায় শরীরের সহিত সমকোণে না থাকিয়া সরলভাবে অবস্থান করে, তজ্জন্য রক্তশোষণ এবং আহারগ্রহণমানসে মনুষ্য-শরীরে এবং দেওয়ালের গায়ে বক্রভাবে বসিয়া থাকে। সাধারণ মশক অপেক্ষা এনোফিলিস্‌ দেখিতে সরু। মশকের মধ্যে স্ত্রীজাতি শুধু রক্তপান করিয়া থাকে। পুরুষজাতি পরমবৈষ্ণব—ফল-মূলের রস পান করিয়া জীবনধারণ করে। স্ত্রী-পুরুষকে চিনিবার সহজ উপায়—পুরুষের রেফ্‌ (atenua) পালকযুক্ত হংসপুচ্ছের ন্যায়, স্ত্রীজাতির তাহা নহে। এ ছাড়া স্ত্রীমশকের পেট অনেক সময় ডিম্ব-পরিপূর্ণ থাকে। মশকের উদরে যদি রক্ত থাকে, তাহা হইলে তাহারা

নিশ্চয় স্ত্রীমশক, কেননা পুরুষ-মশক কখন রক্তপান করে না। এনোফিলিস্ খানা, ডোবা ইত্যাদি যে সকল স্থানে জল বদ্ধ থাকে, তথায় ডিম পাড়ে। ডিম হইতে অত্যন্ত ক্ষুদ্র শুঁয়াপোকার ন্যায় মশক-শাবক সকল নির্গত হয়। কিছুকাল যাবৎ ইহাদের পালক বাহির হয় না। এই সকল শাবক একবার করিয়া নিশ্বাস লইবার জন্য জলের উপর ভাসিয়া উঠে এবং পরক্ষণেই আবার ডুবিয়া যায়। মশকশাবকের পক্ষোদ্গম হইলে তাহারা জল হইতে উড়িয়া যায়। নিকটে কোন লোকালয় থাকিলে, সেইখানেই আশ্রয়গ্রহণ করে। গ্রাম হইতে অর্দ্ধক্রোশ ব্যবধান মধ্যে মশক-উৎপত্তির পক্ষে যদি কোন অনুকূল জলাশয় প্রভৃতি না থাকে, তাহা হইলে ম্যালেরিয়া না হইবারই কথা। ইহারা অধিক দূর কি অধিক উচ্চে উড়িয়া যাইতে পারে না এবং বাড়ীর উপরের গৃহে ইহাদিগকে কদাচিৎ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের কয়েকটী উপশ্রেণীর মধ্যে কয়েকজাতীয় এনোফিলিস্ কদাচ লোকালয়ে আসে। ইহারা সচরাচর বন, জঙ্গল, পাহাড়-পর্ব্বতে বাস করে। আবর্জ্জনাদিই জঙ্গলের মশকের প্রধান খাদ্য। লোকালয়ে মশক প্রথমতঃ গলিত খাদ্যদ্রব্যাদির দ্বারা আকৃষ্ট হয়; পরে মনুষ্য-শোণিতের আস্বাদ পাইলে গৃহমধ্যেই বসবাস করিতে থাকে। এনোফিলিস্-মশকের একটী বিশেষ ধর্ম্ম এই যে, ইহারা অন্ধকারে থাকিতে ভালবাসে এবং সন্ধ্যার পূর্ব্বে প্রায়ই বাহির হয় না। ইহারা নিশাচর, দিবাভাগে অন্ধকার-গৃহের কোণে, বাক্স, আলমারী, সিন্দুক ইত্যাদির তলদেশে, আরসি, ছবি, আলনাস্থিত কাপড়, জামার পশ্চাদ্ভাগে এবং ভাঁড়ের মধ্যে, গোশালায়, আস্তাবলে, গৃহস্থিত কলসী প্রভৃতির ভিতরে লুকাইয়া থাকে, সূর্য্য অস্ত যাইবামাত্র শীকার অন্বেষণে বাহির হইয়া পড়ে এবং লোকজনকে দংশন করিতে থাকে। গৃহের আলোক দ্বারা আকৃষ্ট হইয়াও এবং সন্ধ্যাকাল ব্যতীতও অতি প্রত্যূষেও দরজা, জানালা

খোলা পাইলে বাহির হইতে অনেক মশা গৃহমধ্যে প্রবেশ করে। উষার আলোক ফুটিতে না ফুটিতে ইহারা অদৃশ্য হইয়া পড়ে। ইহারা রাত্রি ভিন্ন দিবাভাগে কদাচিৎ দংশন করিয়া থাকে। এই কারণে রাত্রি-কালকেই ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হইবার প্রশস্ত সময় বলিতে হইবে। এনোফিলিস্-মশকের জীবন কত দিন স্থায়ী হয়, তাহা ঠিক জানা যায় নাই। তবে, শীতঋতু দেখা দিলে অধিকাংশই মরিয়া যায়।

মশকের স্বাভাবিক শত্রুও অনেক। ডিম্বাবস্থায় ও কীটাবস্থায় ক্ষুদ্র মৎস্যকুল, ব্যাঙ্ ও ব্যাঙাচি ইহাদের বিশেষ শত্রু। পরিণতাবস্থায়, টিক্‌টিকি, গির্‌গিটি, মাকড়সা, বাদুড়, চাম্‌চিকা ও পেচক প্রভৃতি ইহাদের ঘোরতর বৈরী।

এইরূপ স্বাভাবিক ধ্বংসসত্ত্বেও ইহাদের বংশ-বৃদ্ধির যে সব উদ্দীপক কারণ বর্ত্তমান রহিয়াছে এবং ইহারা যেরূপ ম্যালেরিয়া-রাক্ষসীর ক্ষিপ্রগামী বাহকের কার্য্যে তৎপর থাকিয়া ইহার সঞ্চারের সহায়তা করিতেছে, তাহাতে ইহার ত্বরিত প্রতীকারের চেষ্টা অবশ্যকর্ত্তব্য। মশক-বংশ ধ্বংস এবং ম্যালেরিয়া-নিবারণের যে সব বৈজ্ঞানিক উপায় আছে, তাহাও বহু-ব্যয়সাধ্য। দেশের আর্থিক ও দৈহিক অবস্থা একেবারেই হীন হইয়া পড়িয়াছে। বিজ্ঞান বলেন, ম্যালেরিয়া প্রশমন-যোগ্য। প্রমাণ, পানেমার এবং যশোহরের স্বাস্থ্যোন্নতি। এই ম্যালে-রিয়া দূর হইলে দারিদ্র্যও অনেকাংশে দূর হইবে। কিন্তু, ইহার প্রতী-কারের চেষ্টা আমাদের সদাশয় প্রজাবৎসল গভর্ণমেণ্টের কৃপাদৃষ্টির উপরই বেশী নির্ভর করিতেছে। কেননা, তাঁহার প্রজাগণের অবস্থা বড়ই শোচনীয়।

সহরের উন্নতিতে বড় আসে যায় না। পল্লীগ্রামের উন্নতি-অবনতির উপরই দেশের উন্নতি-অবনতি বিশিষ্টরূপে নির্ভর করে। সহরের

উন্নতিতে দেশের স্বল্পসংখ্যক লোকের এবং বিদেশের বহুসংখ্যক লোকেরই উন্নতি সাধিত হয়। এইরূপ উন্নতিতে সমগ্র দেশের স্বাস্থ্য ও অর্থ-সম্বন্ধে ক্ষতি ভিন্ন লাভ অধিক হয় না। পল্লীগ্রামসমূহে বিশুদ্ধ পানীয় জলের বিশেষ অভাব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। গ্রামবাসীর আর্থিক স্বচ্ছন্দতার অভাবে গ্রাম্য-পুষ্করিণীগুলি বহুদিনাবধি সংস্কার না হওয়ায়, জলজ উদ্ভিদ্‌পূর্ণ, পঙ্কিল-সলিল পানে গ্রামবাসী রুগ্ন হইয়া পড়িতেছে। পল্লীবাসীর স্বাস্থ্যোন্নতির গৌণ-ফলই সহরের এবং দেশের সমৃদ্ধি।

পল্লীগ্রামগুলি জঙ্গলাদিতে পূর্ণ—হিংস্রজন্তুর আবাসস্থল। গ্রামে ভাল চিকিৎসক নাই, ভাল লোক নাই, ভাল রাস্তা-ঘাট নাই, ভাল পানীয় জল নাই, চাকর-বাকর, মুটে-মজুর পাওয়া যায় না—সকলেই স্ব-স্ব প্রধান—যাহারা বৃত্তি বা চাকরাণ ভোগ করিয়া পূর্ব্বে দশকর্ম্মের সাহায্য করিত, এখন আর তাহারা কর্ম্ম করিতে চাহে না। এমন কি তাহারা উচ্চজাতির স্পৃষ্ট-অন্ন গ্রহণেও অসম্মতি প্রকাশ করে। গ্রামে যে কোন রকমের ক্রিয়াদি করিতে গেলেই পরিচারকের অভাবে তাহা সম্পন্ন হওয়া অসম্ভব হইয়া পড়ে। নবশাখ-সম্প্রদায়গণও নিজেদের উচ্ছিষ্ট উত্তোলনে অস্বীকৃত হয়—এখন কর্ম্মকর্ত্তার সে কার্য্য সম্পাদন না করিলে আর উপায় নাই। বর্ত্তমান সময়ে ইহার প্রতীকারের উপায় উদ্ভাবন করাও একটী বিশেষ আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে।

নিম্নতন জাতিকে উদ্বর্ত্তনের অবকাশ দেওয়াও বর্ত্তমান সময়ে আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে, সন্দেহ নাই। কারণ ব্যবসায়-বাণিজ্যাদিতে ব্যবহারিক কার্য্যফলে এবং সমাজ-শাসনের স্বাধীনতার খর্ব্বতায় তাহাদের অর্থাগম হওয়ায়, তাহারা ধনশালী হইতেছে। সে অর্থে তাহারা নিজেদের জ্ঞানোন্নতি এবং দেশের অনেক কার্য্য করিবার উপযুক্ত সামর্থ্য লাভ করিতে পারে। কিন্তু ক্রমোন্নতিই জগতের স্বাভাবিক নিয়ম। তাহারা

একেবারেই সিদ্ধি চাহিতেছে—ইহাই অস্বাভাবিক। ঋদ্ধির বহু পরে সিদ্ধি আসে।

গ্রামে অল্পসংখ্যক বড় লোকদের কার্য্যাদি একরূপ চলিয়া যায়—কিন্তু বহুসংখ্যক মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের পল্লীবাস একরূপ অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। গ্রামে কেবল দলাদলি—কেবল পাটওয়ারী বুদ্ধি—কেবল হিংসা-দ্বেষ। পল্লীগ্রামগুলি বিভীষিকাময় স্থান হইয়া উঠিয়াছে। গ্রামের লোকের কর্ম্মহীনতাও ইহার উদ্দীপক কারণের অন্যতম। যেহেতু, মানব কর্ম্মশীল। নিষ্ক্রিয় মানবের অস্তিত্ব কষ্ট-কল্পনার বিষয়। মানুষ নিষ্ক্রিয় হইয়া বসিয়া থাকিতে পারে না। এখন যদি পল্লীগ্রামের বর্ত্তমান অভাব-অভিযোগগুলির সংস্কার আরম্ভ হয়, তবে পল্লীবাসীর অনেক কাজ করিবার থাকে—কর্ম্মক্ষেত্র প্রসারিত হয়—এবং হিংসা-দ্বেষের অবসরও কম হয়। পক্ষান্তরে পল্লীগ্রামসমূহ বাসের উপযুক্ত হয়।

এখন সমন্বয়ের যুগ। বাক্য ও কার্য্য উভয়ই সমভাবে চলিবে। নীরব কর্ম্মের যুগ পশ্চাৎ আসিতেছে। এইরূপ সুধী-সংহতির উদ্দেশ্য হইবে দেশের ও জাতির অভাব-অভিযোগের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা। সে উদ্দেশ্য যদি কেবল লেখনী ও মসীসংযোগে একটী চিহ্নমাত্র সরণী আবিষ্কার করতঃ সভাসমিতিতে উপস্থিত হইয়াই স্থগিত রহে—তবে দেশের ও জাতির অভাব-অভিযোগের প্রতীকার কি হইল?—সাহিত্য-সম্মিলনে কেবল সাহিত্যেরই শ্রীবৃদ্ধি-সাধন হওয়ায় একাঙ্গ পূর্ণ হইল—সাহিত্য-সংরক্ষণের যে স্থানের অভাব তাহা রহিয়াই গেল।

সোণার বাঙ্গলার সে স্বনামধন্য নাম-গৌরব এখন আর নাই—অভাব-অভিযোগের বিষাদময় কলঙ্ক-কালিমায় বাঙ্গালা বড়ই কলঙ্কিত।—বাঙ্গলার পল্লী-নিবাস বাসের অযোগ্য হইয়া উঠিয়াছে। অভাব-অভিযোগগুলি তিরোহিত হইয়া আবার পল্লীগ্রামসমূহ মানুষের বাসযোগ্য

হইলে মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী আর নির্ব্বংশের পথে অগ্রসর হইবে না, তাহারা যাহা উপার্জ্জন করে, তাহাতেই লক্ষ্মীশ্রী অর্জ্জন করিতে পারিবে। বাঙ্গলার পল্লীবাস পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইলে, বাঙ্গালীর সমাজ আবার সজীব হইবে, বাঙ্গলার পুরাতন মনুষ্যত্বের আদর্শ আবার সমুজ্জ্বল হইবে—কলঙ্ক-কালিমা ঘুচিয়া বাঙ্গালা আবার সোণার বাঙ্গলায় পরিণত হইবে। অভাব-অভিযোগাদি ছিল না বলিয়াই লোকে তখন পল্লীগ্রামে থাকিতে ভালবাসিত।

সমৃদ্ধসহরে জলের কলের সৃষ্টি হওয়ায়, জনসাধারণের পরিস্কৃত পানীয়ের ও জলের অভাব খুব দূর হইয়াছে সত্য; কিন্তু পক্ষান্তরে, বোধ হয় পীড়াদির ততোধিক বৃদ্ধি হইতেছে। জল-নালিকাগুলি রোগ-বীজের যেন আবাসস্থল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সহরে জলদানের বিরাম-কালে জলাধারে ও জল-নালিকার আবদ্ধস্থানে আর্দ্রতাহেতু যে সব জীবাণুর উদ্ভব হয়, সে সব জীবাণু জল-স্রোতের সহিত জল-গ্রাহকদের ব্যবহারে আসে এবং আরো ঐ সমস্ত স্থানে জলীয় বাষ্প দ্বারা যে ময়লা পড়ে, তাহা হইতেও ঐরূপ জীবাণুর উদ্ভব হইয়া থাকে। গঙ্গাজলে এরূপ রোগনাশক পদার্থ বিদ্যমান আছে যে, তাহাতে রোগ-বীজ সংস্পর্শমাত্র বিনষ্ট হইয়া যায়। গভর্ণমেণ্টের আদেশক্রমে জীবাণুবিৎ পণ্ডিতগণ ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া ইহার সত্যতা প্রতিপাদন করিয়াছেন। গঙ্গা-জলের এই সর্ব্বপ্রধান উপকারিতার জন্যই হিন্দুরা গঙ্গাজলকে এত সম্মান করিয়া থাকেন। বহুকাল পূর্ব্বে আর্য্যভারতে, বোধ হয়, ইহার পরীক্ষা হইয়াছিল। সেই ব্যাধিবিনাশক মলিন গঙ্গাজল জলের কলে কৃত্রিম উপায়ে শোধিত হইয়াই আরো জীবাণুময় হইতেছে। যে স্থানে অন্য নদী হইতে জল-সংগ্রহ হয়, সে স্থানে ত আরও হইবার কথা। সহরে, লোক-বৃদ্ধির সহিত স্বাস্থ্যরক্ষার এত নিয়মাদি থাকা সত্ত্বেও পীড়ার প্রকোপ

কমিতেছে না কেন? ইহাই আমাদের জিজ্ঞাস্য। যে পরিশ্রুত জল (Distilled water) নির্দ্দোষজ্ঞানে আমরা পান করিয়া থাকি, অণুবীক্ষণ-যন্ত্র সাহায্যে তাহার মধ্যেও বহুসংখ্যক বড় বড় জীবাণু দৃষ্ট হয়। বড়গুলি আবার ছোটগুলিকে খাইতেছে, অযোগ্যের উচ্ছেদ এবং যোগ্যের বা প্রবলের উদ্বর্ত্তন হইতেছে। জগতের সর্ব্বত্রই এই শাসন-তন্ত্রের বিধান চলিতেছে।

ভারতে, পূর্ব্বকালের পল্লীবাসী স্ত্রীলোকগণের প্রাতে ও সন্ধ্যায় কলসী কক্ষে করিয়া নদী হইতে জল আনয়ন-প্রথাটি মন্দ নয়। ইহাতে এক-দিকে স্রোতের বিশুদ্ধ জল পানীয়-স্বরূপে আনা হয়, অপরদিকে, আবার বিমুক্ত বিশুদ্ধ বায়ুতে বিচরণ ও পরিশ্রমজন্য স্বাস্থ্যের উন্নতি সাধিত হয়। বর্ত্তমানকালে, এ প্রথার প্রচলন কম হওয়ায়, বোধ হয়, পল্লি-বাসিনীদের স্বাস্থ্যহানিই হইতেছে।

অনেকে হয়তো বলিতে পারেন যে, পাশ্চাত্যদেশে জীবিকা-উপায় বড়ই আয়াস-সাধ্য। তথায় বৈজ্ঞানিক যন্ত্র-সাহায্যে পরিশ্রম লঘু এবং কিছু সময় উদ্বৃত্ত হইলেও জীবিকা-অর্জ্জনের ও বর্ত্তমান জ্ঞান-পিপাসা-তৃপ্তির জন্য আরও পরিশ্রম করিবার থাকে। সুফলা ভারত-ভূমিতে জীবিকা-অর্জ্জন বর্ত্তমান সময়ে অপেক্ষাকৃত সহজ-সাধ্য, ও পূর্ব্ববৎ অভাব-বোধের ন্যূনতা, বৈজ্ঞানিক-যন্ত্র-সাহায্যে পরিশ্রম লঘু এবং সময় উদ্বৃত্ত হইলেও শরীর-চালনার উপযুক্ত অভাব ঘটিয়া ব্যাধির আগম হয়, পক্ষান্তরে বিলাসিতাও আশ্রয়গ্রহণ করে। শিক্ষানুরাগের প্রভাবেই কর্ম্মক্ষেত্র বাড়িয়া যায়। যন্ত্র-সাহায্যে পরিশ্রম লঘু ও সময় উদ্বৃত্ত হইলেই যে, উপযুক্ত অঙ্গ-চালনার অভাব ঘটে এবং বিলাসিতা বাড়ে, বাস্তবিকপক্ষে তাহা নহে। অর্থকরী শিক্ষায় অনুরাগের অভাবেই কর্ম্মক্ষেত্র সঙ্কুচিত হওয়ায় উক্ত দোষ-সমুদায় প্রশ্রয় পায়। একটি সামান্য বিষয়েই দেখিতে পাই, মালদহের অনেক

আবাসদ্বারেই কাষ্ঠ-নির্ম্মিত কি প্রস্তর-নির্ম্মিত যে সকল পুরাতন কারু-কার্য্যখচিত চৌকাট-কপাট এখনও আছে, তৎসমুদায় পূর্ব্বকালের শারীরিক পরিচালনার এবং অর্থকরী শিক্ষায় অনুরাগের সমধিক সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। সে সময়ের হস্তনির্ম্মিত যে সমস্ত শিল্পচাতুর্য্য দেখা যায়, তাহা বর্ত্তমানকালের যন্ত্রনির্ম্মিত শিল্পকার্য্য হইতে একেবারে নিকৃষ্ট নহে।

ষড়্ঋতুর আবাসভূমি ভারতে এখন আবার ঋতুগুলির প্রভাবও সমভাবে উপলব্ধি হয় না। এই সমতাবিলোপও স্বাস্থ্যভঙ্গের কারণান্তর্গত। সর্ব্বসুখ-স্বাস্থ্য-বিধায়িনী ভারতভূমিকে মহাকালরূপিণী ম্যালেরিয়া, কলেরা, বসন্ত ও প্লেগ এই রাক্ষসী-চতুষ্টয় গ্রাস করিয়া ফেলিতে উদ্যত হইয়াছে। সম্প্রতি আবার কনিষ্ঠা ভগিনী বেরিবেরী আসিয়া ইহাদের দলপুষ্টি করিয়াছে। জ্যেষ্ঠা ভগিনীগণ রক্তের লোহিতকণা শোধন করিয়াছে, কাজেই দেহে জলের ভাগ বেশী হওয়ায় বেরিবেরীতে ক্ষমতা প্রকাশ করিবার সুযোগ ঘটিয়াছে, ক্ষয়াধিক্যই অবসাদের কারণ। দেহে আবার রক্তের লোহিতকণাধিক্য না হইলে এ অবসাদক-পদার্থের (Fatigue stuffs) বিনাশ হইবে না।

যে সব উদ্দীপককারণে এই সব রোগোৎপত্তি হইতেছে, সেই কারণ-নিচয়ের মধ্যে পূতিবাষ্পই (ম্যালেরিয়া) সর্ব্বপ্রধান কারণ বলিয়া বিবেচিত হয়। ম্যালেরিয়ার পরিচয়, সমসংজ্ঞা, নির্ব্বাচন, কারণতত্ত্ব, লক্ষণতত্ত্ব, নিদানতত্ত্ব, শ্রেণীভেদ, রোগের গতি ও পরিণতি ইত্যাদি আলোচনা করিলে, দেখিতে পাওয়া যায়, অন্যরোগগুলি ইহারই নামান্তর মাত্র। ম্যালেরিয়া যে কি পদার্থ, তাহা অদ্যাপি সম্পূর্ণরূপে নিরূপিত হয় নাই, উহা একপ্রকার বিশেষ বিষাক্তপদার্থ এইমাত্র জানা গিয়াছে। কোন কোন জীবাণুবিদ্ পণ্ডিতের সিদ্ধান্ত এই যে, সূর্য্যোত্তাপে আর্দ্রভূমি হইতে যে পূতিবাষ্পের উদ্ভব হয়, তাহাতে এই সকল বিষাক্ত জীবাণু সমুৎপন্ন হয়।

এই বিষাক্ত পদার্থের পরিমাণ ও প্রকারভেদে এবং ভিন্ন ভিন্ন রোগীর শারীরিক্‌ প্রকৃতির বৈলক্ষণ্য অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণাবলী প্রকাশ পায় এবং তাহাই বিভিন্ন রোগ নামে অভিহিত হয়।

দেশ-কাল ও অবস্থার অনুকূলতা অনুসারে এই জীবাণু উৎপন্ন হয় এবং ইহা জল ও বায়ুতে ভাসমান থাকে। সেই দূষিত জল ও বায়ু শরীরস্থ হইলেই এই সব পীড়া উৎপন্ন হয়। অতএব, যাহাতে দেশের জল-বায়ুর বিশুদ্ধতা রক্ষা করা যায়, তাহার উপায় উদ্ভাবন না হইলে, এই মহামারীর হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া কঠিন। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য উভয়দেশের "বিবরণীতে" দেখা যায় যে, যখনই দেশে দুর্ভিক্ষ ও দরিদ্রতা বৃদ্ধি পায়, তখনই ব্যাপক পীড়ার প্রাদুর্ভাব হয় এবং দরিদ্রদিগের মধ্যেই এই পীড়াদির প্রকোপ বেশী দেখা যায়। মূলকথা, দেশের দারিদ্র্য দূরীভূত না হইলে জল বিশুদ্ধ হইবে না, জল-বায়ু বিশুদ্ধ না হইলে ম্যালেরিয়াও অপসারিত হইবে না এবং ম্যালেরিয়া-বীজ বিদূরিত না হইলে জন-সাধারণের স্বাস্থ্যোন্নতি হইবে না। স্বাস্থ্যোন্নতি না হইলে বৈধানিক-তন্তু-কোষগুলির জীবনী-শক্তির হ্রাস-ক্রিয়া (tissue cell in state of low vitality) বিদূরীত হইবে না। জীবনী-শক্তির হ্রাস হেতুই সর্ব্ব-প্রকার ব্যাধির উৎপত্তি হয়। তাই, হোমিওপ্যাথির আবিষ্কর্ত্তা মহাত্মা হানিমান্‌ বলিয়াছেন যে, "Diseases are produced only by the disturbedVital-Force." উপরিউক্ত বিষয়গুলির গুরুত্ব অধিক এবং বর্ত্তমান সময়ে ইহার প্রতীকারের চেষ্টাকরাও দেশবাসীর একান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিয়াছে।

শ্রীনলিনীকান্ত বসু।

মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দুরবস্থা

অভাবমোচন ও বিলাস

মানুষ তাহার অভাব-মোচন-উদ্দেশ্যে রাত্রিদিন পরিশ্রম করিতেছে। সংসারের কৃষি-শিল্প-বাণিজ্যাদির বিপুল আয়োজনের উদ্দেশ্য মানুষের নানাবিধ অভাব মোচন করা। সহরের কলকারখানা বা গ্রামের পারিবারিক শিল্পকর্ম্ম, মন্থরগতি গরুর গাড়ী অথবা বেগবান্ মেল-ট্রেণ, নৌকা বা সামুদ্রিক জাহাজ, মুদীর দোকান অথবা বড় বড় হৌস্ বা ব্যাঙ্ক প্রভৃতি সবগুলিই মানুষের নানাবিধ অভাব-মোচনের জন্য সৃষ্ট হইয়াছে। অভাবমোচনের জন্য সমগ্র সমাজ শ্রমবিভাগ নির্দ্দেশ করিয়া নিম্নলিখিত কার্য্যপ্রণালী অবলম্বন করিয়া থাকে—[পর পৃষ্ঠা দেখ]

প্রথমে কৃষিজাত দ্রব্য অথবা খনিজ পদার্থ হইতে দ্রব্য প্রস্তুতকরণের উপকরণ-সামগ্রী পাওয়া যায় (ক)। ঐ সমস্ত উপকরণ লইয়া কারখানা-ফ্যাক্টরীতে দ্রব্য প্রস্তুত হয় (খ)। পরে বাণিজ্যের দ্বারা যাহার অভাব তাহার নিকট নীত হইয়া অভাবমোচন করে (গ)। এই তিন প্রকার কার্য্যের জন্য প্রত্যেক ক্ষেত্রেই পরিশ্রম এবং মূলধনের সংযোগ প্রয়োজনীয়। ধনোৎপাদনের জন্য অহোরাত্র যে বিপুল পরিশ্রম লাগিতেছে, উহার বিনিময়ে মানুষ প্রথমতঃ আপনার অভাবমোচন করিতে পারিতেছে। আত্যন্তিক অভাবমোচন করিয়া উদ্বৃত্ত ধন হয় বিলাস-ভোগ (ঘ) অথবা ভবিষ্যৎ লাভের আশায় ধনোৎপাদনের জন্য পুনরায় নিয়োজিত করিতেছে (ঙ)। শেষোক্ত অর্থপ্রয়োগই সমাজের অর্থবৃদ্ধির বিশেষ সহায়। দুই একটি উদাহরণ দিলে স্পষ্ট বুঝা যাইবে। কোন কৃষক শস্য বিক্রয় করিয়া কিছু টাকা পাইয়াছে। সে ঐ টাকায় যদি একখান লাঙ্গল

ক

কৃষি এবং খনিজ দ্রব্য।
দ্রব্য প্রস্তুত করণের
উপকরণসামগ্রী
উৎপাদন।

পরিশ্রম
মূলধন

ঙ

উদ্বৃত্ত ধনভোগ
বিলাস-সামগ্রী

খ

দ্রব্য প্রস্তুত করণ

ঘ

ধনোৎপাদন-ক্রিয়ার
ক্ষতিপূরণ
মূলধন

পরিশ্রম
মূলধন

গ

দ্রব্য বিক্রয়
বাণিজ্য

পরিশ্রম
মূলধন

অথবা জমির উপযুক্ত সার ক্রয় করে, তাহা হইলে ভবিষ্যতে তাহার কৃষিকার্য্যে পরিশ্রমের অনেক লাঘব হইবে; কিন্তু যদি সে তাহা না করিয়া মদ খাইয়া ঐ টাকা খরচ করিয়া ফেলে, তাহা হইলে তাহার পূর্ব্ব

পরিশ্রমের কোন চিহ্নই থাকিবে না। সাময়িক উত্তেজনায় ক্ষণিক আমোদের জন্য অর্থ ব্যয়িত হইল, অর্থব্যয়ের কোন স্থায়ী ফললাভ হইল না। আর একটি উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে। কোন জমিদার কি করিয়া তাঁহার অর্থব্যয় করিবেন ঠিক করিতে পারিতেছেন না। বিদ্যালয়-স্থাপন, পুষ্করিণী-খনন, শিল্পব্যবসায়-প্রবর্ত্তন প্রভৃতির জন্য অর্থ ব্যয় করা তাহার ইচ্ছা, কিন্তু সম্প্রতি পারিষদবর্গের পরামর্শে তিনি নৃত্যগীতাদির জন্য অনেক অর্থব্যয় করিতেছেন। যেস্থলে অর্থবয়ের ফল অধিককালব্যাপী হয় না, তাহাকে আমরা প্রচলিত কথায় বিলাস-ব্যাপার বলিয়া থাকি। নৃত্য-গীতাদিতে অর্থব্যয়ের ফল বেশীক্ষণ থাকে না; অপরদিকে সেই পরিমাণ অর্থে যদি একটি ব্যবসায় বা বিদ্যালয় চলিতে থাকে, এই প্রকার অর্থ-ব্যবহারের সুফল আমরা অনেক বৎসর পর্য্যন্ত দেখিতে পাই। ধনবিজ্ঞানের দিক্ হইতে শেষোক্ত প্রকার অর্থ-ব্যবহারকে মূলধননিয়োগ (৬) বলা হয়। ইহার দ্বারা দেশের ধনবৃদ্ধি অথবা নৈতিক এবং মানসিক উৎকর্ষ সাধিত হইয়া থাকে। একদিক্ হইতে দেখিতে গেলে মানসিক অথবা নৈতিক উন্নতি সমাজের ধনবৃদ্ধির উপায় মাত্র।

যেখানে অর্থ-ব্যবহার বৈষয়িক উন্নতির কোন কাজেই আসে না, অর্থ আছে অতএব অর্থব্যয় করিতে হইবে, নিজের বা সমাজের শক্তি বৃদ্ধির জন্য যখন উহা নিয়োজিত হয় না, কেবলমাত্র ক্ষণিক সুখের জন্য স্বার্থান্ধদিগের দ্বারা ব্যয়িত হয়, তখন উহাকে আমরা বিলাসিতা, সৌখীনতা, বাবুয়ানী বলিয়া থাকি।

এইস্থলে একটি কথা মনে রাখা আবশ্যক। সামাজিক রীতিনীতি এবং দেশের জল-বায়ু অনুসারে অনেক দ্রব্য বিভিন্ন দেশে নিত্য আবশ্যক অথবা বিলাস-সামগ্রী হইয়া থাকে। ইউরোপে জুতা এবং জামা পরিধান কোন শ্রেণীর পক্ষেই বিলাস নহে, আমাদিগের দেশে দরিদ্র কৃষকগণের

পক্ষে উহা বিলাস হইবে। আমাদিগের মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের পক্ষে ছাতা ব্যবহার বিলাস নহে, কিন্তু ইউরোপে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে উহা বিলাস হইবে। চীন দেশে চা-পান বিলাস নহে, আমাদিগের দেশে ইহা বিলাস (চ)। বাস্তবিক পক্ষে বিভিন্ন দেশের জলবায়ু এবং সামাজিক অভ্যাস-অনুসারে বিলাসসম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইবে। দেশের জলবায়ু এবং সামাজিক অনুষ্ঠানকে কেহ অবজ্ঞা করিতে পারে না। কিন্তু যদি কেহ কতকগুলি কৃত্রিম অভাব-মোচন করিবার জন্য শুধু ব্যস্ত হয়, অথচ ঐ সমস্ত অভাব-মোচন না করিলেও বৈষয়িক জীবন-সংগ্রামে তাহার শক্তির হ্রাস হয় না, তাহা হইলে ধনবিজ্ঞান অনুসারে আমরা তাহাকে বিলাসী বলিব।

বিলাস-ভোগসম্বন্ধে কয়েকটি মতামত

এক্ষণে বিলাস-ভোগ কোন ব্যক্তিবিশেষ এবং সমগ্র সমাজের পক্ষে কতদূর বাঞ্ছনীয় তাহা বিচার করিতে হইবে। বিলাসীরা বলিয়া থাকেন, আমরা যদি বিলাস ভোগ না করি, অধিকসংখ্যক লোক কোন কাজ না পাইয়া অনাহারে থাকিবে। অনেক লোক বিলাস-সামগ্রী প্রস্তুত করিবার জন্য পরিশ্রম করিতেছে, উহাদিগের কাজ যাইলে সমাজের ক্ষতি হইবে। কিন্তু একটু ভাবিয়া দেখিলে তাঁহাদিগের ভ্রম দূর হইবে। যে টাকা তাঁহারা বন্ধুবান্ধবদিগের সহিত আমোদ-প্রমোদের ক্ষণস্থায়ী সুখের জন্য খরচ করিতেছেন, সেই টাকায় যদি তাঁহারা একটি হাসপাতাল নির্ম্মাণ করিয়া দিতেন, তাহা হইলে রোগীদিগের খাদ্য, বস্ত্র, ঔষধ প্রভৃতি উৎপাদনের জন্য প্রায় অতগুলি শ্রমজীবী কাজ পাইত। শ্রমজীবীদিগের পক্ষে ফল সমানই হইত। উপরন্তু সমাজে একটি চিরস্থায়ী অনুষ্ঠানের সূচনা হইত; যাহাদিগের জীবন দুর্ব্বহ এবং অন্ধকারময় তাহারা কিয়ৎ-

পরিমাণে সুখী হইয়া সমাজের শক্তি ও আনন্দবৃদ্ধি করিত। এমন কি যদি ধনীরা বিলাস-ভোগে অর্থব্যয় না করিয়া ব্যাঙ্কে টাকা রাখিয়া দেন, তাহা হইলে ব্যাঙ্কের দ্বারা উহা ব্যবসায়-বাণিজ্যে নিয়োজিত হইবে। অনেক শ্রমজীবী এইরূপে কাজ পাইবে এবং ধনীদিগের অর্থও বৃদ্ধি পাইবে। য়্যাডাম স্মিথ বলিয়াছিলেন, কোন ধনী যদি কয়জন চাকর নিযুক্ত করেন, তিনি ক্রমে গরীব হইতে থাকিবেন, কিন্তু যিনি শিল্পী নিযুক্ত করেন, তিনি আরও ধনী হইবেন। কিন্তু এক্ষেত্রে ধনীর নিজের অর্থবৃদ্ধি অপেক্ষা সমাজের অর্থ এবং আনন্দবৃদ্ধি অধিক বাঞ্ছনীয় মনে করিতে হইবে। বিলাসীরা আরও বলিয়া থাকেন, সমাজের যদি বিলাস-ভোগের আকাঙ্ক্ষা না থাকে, তাহা হইলে অভিনব অভাব-মোচনোপযোগী অভিনব দ্রব্যসম্ভার প্রস্তুত হইবে না। ইহার ফলে সমাজের ধনোৎপাদন-শক্তি হ্রাস পাইবে, কর্ম্মশক্তি ক্রমাগত একই প্রকার অভাব-মোচন-উদ্দেশ্যে ব্যয়িত হইলে উহা বিকাশ লাভ করিতে পারিবে না। কিন্তু এই প্রসঙ্গে উৎপাদনের আর এক দিক্ও বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। ধনোৎপাদন সময়-সাপেক্ষ। সমাজ যদি নিত্যনূতন জিনিষ চাহে, তাহা হইলে অনেক জিনিষ, যেগুলি কারখানায় প্রস্তুত হইতেছে, সেগুলি বাজারে আসিবার পূর্ব্বেই পুরাতন হইয়া যাইবে। ঐগুলি যদি বিক্রয় না হয়, তাহা হইলে সমাজের কত পরিমাণ শক্তি যে ব্যর্থ হইবে তাহা সহজেই অনুমেয়।

নীতির দিক্ হইতে দেখিতে গেলে বিলাস-ভোগ সর্ব্বথা নিন্দনীয়।

রাস্কিন একস্থলে লিখিয়াছেন—যতদিন পর্য্যন্ত সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তিই উপযুক্ত আহার এবং বাসস্থান লাভ না করিতে পারে, ততদিন সে সমাজে বিলাসভোগ অতি নিষ্ঠুর কার্য্য এবং সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জনীয়। রাস্কিনের এ কথা অস্বীকার করা যায় না। বাস্তবিকপক্ষে ইউরোপ-

আমেরিকায় অর্থের যেরূপ অপব্যবহার হয়, তাহা ধারণা করিলে বিপুল অর্থশালী পাশ্চাত্য-সমাজের পক্ষেও এ কথার সার্থকতা উপলব্ধি হয়। আমেরিকার এক একজন কোটিপতি বান্ধুবান্ধবদিগের সহিত ভোজনে বসিয়া এক রাত্রে কোটি টাকাও খরচ করিয়া থাকেন! সেখানকার ধনীরা কে সর্ব্বাপেক্ষা উদ্ভট উপায়ে অর্থব্যয় করিতে পারে, এই চিন্তাতেই ব্যস্ত! পাশ্চাত্যজগতে যেরূপ বিপুল অর্থোপার্জ্জন, সেরূপ অর্থের অপব্যবহারও সমানভাবে দেখা দিয়াছে। অথচ অসংখ্য শ্রমজীবী আহার্য্য এবং পরিচ্ছদের ব্যয় সঙ্কুলান করিয়া উঠিতে পারে না।

আমাদের বিলাসভোগ

আমাদের দেশে আজকাল বিলাস-ভোগ কি পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহা ভাবিবার বিষয় হইয়াছে। বাঙ্গালাদেশের বিভিন্ন জেলা হইতে পারিবারিক ব্যয়ের তালিকা সংগ্রহ করিয়া আমি একটি আদর্শ (average) তালিকা গঠন করিয়াছি। উহা হইতে দেশের মধ্যবিত্ত এবং শ্রমজীবী সম্প্রদায়ের মধ্যে বিলাস-সামগ্রীতে ব্যয়ের পরিমাণ বুঝা যাইবে—আমি তিন-চারি বৎসর হইতে বৈষয়িক তথ্য সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করিয়াছি। আমি তিনটি আদর্শ তালিকা প্রস্তুত করিয়াছি, ঐ তালিকাগুলি লইয়া স্কুল-কলেজের ছাত্রগণ বিভিন্ন জেলা হইতে নানাবিধ বৈষয়িক তথ্য সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর নিকট হইতে সংগ্রহ করিতেছেন। স্থানে স্থানে যে সকল নৈশ বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে, উহাদের শ্রমজীবি কৃষক অথবা শিল্পিগণও এই সমস্ত তথ্যসংগ্রহের বিশেষ সহায়তা করিয়াছে।

যে সমস্ত তথ্য আমরা শ্রমজীবিগণের নিকট হইতে জানিয়াছি, ইহাতে আমাদের কঠোর দারিদ্র্য নিরূপিত হয়। দারিদ্র্যের অনেক কারণ আছে। একটি কারণ আমাদের দেশে ধন-বিজ্ঞানের সৃষ্টি হয় নাই। ইহার

প্রধান কারণ আমাদের দেশে এখনও বৈষয়িক জীবনের মূল তথ্যগুলি এখনও বিশেষভাবে সংগ্রহ আরম্ভ হয় নাই। মৈমনসিংহের অধিবেশনে সাহিত্য-সম্মিলনের বৈষয়িক তথ্য-সংগ্রহ-সমিতি নামে একটি Com-

	মজুর	কৃষক	সূত্রধর	কর্ম্মকার	দোকানদার	দীন মধ্যবিত্ত
১। খাদ্য	৯৫'৪	৯৪'০	৮৪'৫	৭৯'০	৭৭'৭	৭৪'০
২। বসন	৪'০	৩'০	১২'০	১১'০	৯'০	৪'৭
৩। চিকিৎসা	×	১'০	১'০	৫'০	৫'৯	৮'০
৪। শিক্ষা	×	×	×	×	১'০	৩'৩
৫। সামাজিক ক্রিয়াকলাপ	'৬	২'০	২'৫	৪'০	৫'০	৮'০
৬। বিলাসের সামগ্রী	×	×	১'০	১'০	১'৪	২'০
মোট	১০০'০	১০০'০	১০০'০	১০০'০	১০০'০	১০০'০

mittee স্থাপন করিয়াছিলেন। ইহার উদ্দেশ্য ছিল, বৈষয়িক তথ্য সংগ্রহ করিয়া, এই সমস্ত তথ্য নিরূপণের দ্বারা ভারতীয় ধনবিজ্ঞান সৃষ্টি করা। ধনী-লোকদিগের ব্যয়ের তালিকা সংগ্রহ করিতে পারা যায় নাই; তাঁহাদিগের তালিকা সংগ্রহ করিলে উঁহাদিগের বিলাস-সামগ্রীতে ব্যয়ের পরিমাণ জানা যাইত। উল্লিখিত তালিকাটি হইতে বুঝা যায় যে, কয়েক শ্রেণীর শ্রমজীবী শিক্ষার জন্য ব্যয় না করিয়াও বিলাস-সামগ্রী ক্রয় করে। মধ্যবিত্তদিগের মধ্যে বিলাস-সামগ্রীর জন্য ব্যয় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। প্রত্যেক শ্রেণীর সামাজিক ক্রিয়াকলাপের জন্য অর্থব্যয়, বিলাস, শিক্ষা এবং চিকিৎসার জন্য ব্যয় অপেক্ষা অধিক। আমাদের বিলাসিতা, বিশেষতঃ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে বিলাসিতাই অবনতির মুখ্য কারণ।

সামাজিক ক্রিয়াকর্ম্মে ব্যয় বিলাসিতা নহে

এ ব্যয়কে অনেকে অর্থের অপব্যবহার মনে করেন। আধুনিক কালে ইহার ভার যে দুর্ব্বহ হইয়া উঠিয়াছে ইহা স্বীকার্য্য। ইউরোপীয় সভ্যতার সমাগমে এ দেশের চালচলন খুব বাড়িয়া গিয়াছে। অনেকগুলি নূতন কৃত্রিম অভাব সৃষ্ট হইয়াছে, কাজেই এক্ষণে সামাজিক ক্রিয়াকলাপগুলি সংক্ষেপে সারিতে অনেকে বিশেষ মনোযোগী হইতেছেন। কিন্তু পাশ্চাত্য-জগতের মাপকাঠির দ্বারা আমাদের সামাজিক ক্রিয়াকলাপগুলি বিচার করা অনুচিত। আমাদের ক্রিয়াকর্ম্ম সমুদয় ধর্ম্ম এবং সমাজানুমোদিত; হিন্দুজাতি যে সামাজিক আদর্শ উপলব্ধি করিয়াছিল, ঐ আদর্শের দিক্ হইতে ইহাদিগকে বিচার করিতে হইবে।

ভারতবর্ষে ব্যক্তির সহিত সমাজের সম্বন্ধ

আমাদিগের দেশে একান্নবর্ত্তী পরিবারের প্রতিপত্তি এখনও কেহ অস্বীকার করিতে পারিবেন না। স্বজাতি এবং সমাজের মর্য্যাদা লোপ

পায় নাই। ব্যক্তিবিশেষের সুখদুঃখে স্বজাতিদিগের সহানুভূতি এবং সমবেদনা এখনও শ্রদ্ধার সামগ্রী রহিয়াছে। কোন হিন্দুকে আমরা তাহার জ্ঞাতি এবং স্বজাতিবর্গ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ভাবিতে পারি না। তাই হিন্দু তাহার মাথায় দারিদ্র্যের গুরুভার বহন করিয়াও সামাজিক ক্রিয়াকর্ম্মে তাহার জ্ঞাতি এবং স্বজাতিবর্গের সহিত আমোদ-আহ্লাদ করিতে কুণ্ঠিত হয় না। এ প্রকার অনুষ্ঠান স্বেচ্ছাচারী ব্যক্তির নিকটতম বন্ধুদিগের সহিত বিলাসভোগের জন্য নহে,—ইহা আমাদিগের সামাজিক জীবনের সাধনার ফল। ইহা উচ্ছৃঙ্খলতা নহে, ইহা সমাজের বন্ধন। সামাজিক ক্রিয়াকলাপগুলি সমাজের সহিত হিন্দুর জীবন্ত যোগ-অনুভূতির ফল। হিন্দু জন্ম হইতেই সেবার জন্য উৎসৃষ্ট। প্রথমে পারিবারিক জীবন, তাহার পর জাতিগত বা সামাজিক জীবন তাহার কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্ণয় করিয়া দেয়। পরিবার, জাতি বা সমাজকে উপেক্ষা করিয়া কেহই স্বেচ্ছাচারী হইতে পারে না, স্বেচ্ছাচারী হইলে সমাজ তাহার কঠোর শাস্তি-বিধানের ব্যবস্থা করিয়াছে। হিন্দুসমাজ ব্যক্তিগত জীবনকে নিমন্ত্রিত করিয়া জাতিত্ব বিকাশের পথ মুক্ত করিয়া দেয়। গাছে যেমন পৃথিবী হইতে শিকড় ছাড়াইয়া ফল ধরিতে পারে না, সেইরূপ হিন্দুর ব্যক্তিত্ব বিশাল সমাজ-ভূমিকে অতিক্রম করিয়া বিকাশ লাভ করে না।

পাশ্চাত্যজগতে ব্যক্তির সহিত সমাজের সম্বন্ধবিচার

আজ-কাল নূতন সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়া আমাদিগের দেশ এক নূতন প্রকার ব্যক্তিত্বের পরিচয় পাইয়াছে। এ ব্যক্তিত্ব পরিবার এবং সমাজবন্ধনকে অবজ্ঞা করে, এমন কি গৃহবন্ধনকেও অস্বীকার করিতে অনেক সময় কুণ্ঠিত হয় না। বন্ধনের ভিতর দিয়াই যে মুক্তি, তাহা স্বীকার করে না। সমস্ত বন্ধনকে শৃঙ্খলের মত দূরে নিক্ষেপ করিতে

পারিলে এ ব্যক্তিত্ব স্ফূর্ত্তিলাভ করে না। ব্যক্তিত্ব বিকাশ তখনই সম্পূর্ণ, যখন বিলাস-ভোগ উচ্ছৃঙ্খল হয়, নিজ ইচ্ছা সর্ব্বোচ্চ সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়া সমাজের সমস্ত দাবীকেই অগ্রাহ্য করে। পাশ্চাত্য-জগতে এ আদর্শ কোন দেশবিশেষের নহে। সমগ্র পাশ্চাত্য-সমাজ বহুশতাব্দীর ক্রম-বিকাশের ফলে এই আদর্শেরই পুষ্টিসাধন করিতেছে। অন্তর্দ্দেশীয় বাণিজ্য এবং যুদ্ধবিগ্রহ এবং স্বদেশে জীবন-সংগ্রামের প্রতিযোগিতার ফলে এই আদর্শই সেখানে প্রাধান্যলাভ করিয়াছে। ইহার ফলে পাশ্চাত্য-সমাজের মনুষ্যের কর্ম্ম-শক্তির যেরূপ পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, জগতে আর কোথাও এরূপ পাওয়া যায় নাই। কিন্তু মনুষ্য সেখানে শক্তিশালী হইলেও আপনার শক্তির অপব্যবহার করিতেছে। ইহাতে সমাজে ঘোর অশান্তি এবং বিপ্লবের সূচনা দেখা দিয়াছে। বিগত ৪ঠা মার্চ্চ প্রেসিডেণ্ট উড্রো উইলসন্ আমেরিকার যুক্তরাজ্যের সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়া একটি সুন্দর বক্তৃতাতে আমেরিকার জাতীয় জীবনের কঠিন সমস্যাগুলি বিশদভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। আমেরিকা জগতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ধনী, আমেরিকার ব্যবসায়ী এবং ধুরন্ধরগণের প্রতিভার নিকট সভ্যজগৎ মস্তক অবনত করিয়া রহিয়াছে। কিন্তু বিপুল অর্থো-পার্জ্জনের সঙ্গে অর্থের নিকৃষ্ট ব্যবহারও আমেরিকাবাসিগণকে জগতের সমক্ষে লজ্জা দিতেছে। অর্থোপার্জ্জনের বিনিময়ে সমাজে যে সমস্ত ভয়ানক ব্যাধি প্রবেশ করিয়াছে, তাহার দিকে দৃক্‌পাত নাই—টাকার ঝন্‌ঝনানির শব্দে অসংখ্য শ্রমজীবীর রোদন-ধ্বনি শুনা যায় না। আমে-রিকা বড় হইয়াছে, বড় হওয়াতে তাহার দীনতা আরও প্রকাশ পাইয়াছে।

পাশ্চাত্য-সমাজ যে ব্যক্তিত্বকে তাহার বিপুল প্রয়াসের মধ্য দিয়া ফুটাইয়া তুলিয়াছে, উহা মানব-সভ্যতার পরিপোষক নহে বলিয়া সেখানকার চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ বিবেচনা করিতেছেন। তাঁহারা সকলেই

একটা নূতন যুগের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। এই নূতন যুগে সমাজের সহিত ব্যক্তির সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠতর হইবে। সমাজের বাহিরে, দীনদরিদ্র-দিগের দৈনন্দিন জীবন-প্রবাহ হইতে দূরে নিঃসম্পর্কভাবে বাস করা হেয় হইবে। সমাজ যে সকলকে লইয়া,—সমাজে সকলেই সুখশান্তির জন্য পরস্পরের মুখাপেক্ষী, এবং এজন্য সকলেরই পরস্পরের নিকট কর্ত্তব্য আছে,—এ জ্ঞানের তখন উপলব্ধি হইবে। ধনী বা নির্ধন, পণ্ডিত বা মূর্খ সকলেই যে মানুষ—তাহার বোধ হইয়া মনুষ্যত্বের আর অমর্য্যাদা হইবে না। মানুষের মনুষ্যত্বের প্রতি যখন শ্রদ্ধা বাড়িবে, তখন প্রজাতন্ত্র এক নূতন প্রাণ পাইবে, সমাজের সকরুণ সহানুভূতির সুরের সহিত আপনার সুর মিলাইবে, উহার মঙ্গল সাধন করিতে আপনার সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিবে। রুসোর ঐক্যমন্ত্র, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের উচ্চ নৈতিক আদর্শ, শেলির গভীর সমবেদনা, এবং ম্যাজিনির ধর্ম্মমূলক প্রজাতন্ত্রবাদ হইতে আরম্ভ করিয়া কার্লাইল এবং এমার্শনের মানব-পূজা, ধনবিজ্ঞানবিদ্-গণের সমাজ-তন্ত্রবাদ, জেমস্ ও বার্গনার আধ্যাত্মিকতা এবং আধুনিক চিত্রকলার অতীন্দ্রিয়তা প্রভৃতি স্থিরভাবে অনুধাবন করিলে সকলেরই মধ্যে একটা নূতন যুগের ভাবুকতা,—মহাপ্রাণ নবজীবনের সূচনা দেখিতে পাই। পাশ্চাত্য-জগৎ এক বিপুল আন্দোলনের সম্মুখে রহিয়াছে।

আধুনিক হিন্দুসমাজে পরানুকরণ

আমাদের বিশেষ দুর্ভাগ্য,—ইউরোপ যে সময়ে আপনার সভ্যতার মূলমন্ত্র এবং আদর্শগুলি আমূল পরিবর্ত্তন করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছে, আমরা এখন সে গুলিই খুব আগ্রহের সহিত আমাদের জাতীয় জীবনে অবলম্বন করিতে উদ্যত হইয়াছি। ইউরোপীয় জাতিদিগের রাষ্ট্রীয় ও বৈষয়িক উন্নতি, এবং তাহাদিগের সাম্রাজ্য ও বাণিজ্য বিস্তার করিবার

ক্ষমতায় মুগ্ধ হইয়া আমরা আমাদিগের জাতীয় আদর্শ এবং সামাজিক অনুষ্ঠানগুলির প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়াছি। আমাদিগের দেশে পুরাতন এবং নূতন আদর্শের মধ্যে তুমুল দ্বন্দ্ব বাধিয়া গিয়াছে। ইউরোপীয় সভ্যতার প্রভুত্ব এবং প্রাবল্যের নিকট আমাদের জাতীয় আদর্শগুলি হার মানিতে চলিয়াছে। আমাদের একান্নবর্ত্তী পরিবার এবং জাতিভেদ-প্রথার প্রতি শ্রদ্ধা কমিয়া আসিতেছে। ইউরোপ যখন আপনার মাপ-কাঠি পরিবর্ত্তন করিতে উদ্যত হইয়াছে, আমরা ঠিক তখনই ইউরোপীয় মাপকাটি এদেশে আনিয়া উহা দ্বারা আমাদিগের সমস্ত অনুষ্ঠান বিচার করিতেছি। ইউরোপের সমাজ-বিরুদ্ধ ব্যক্তিত্বের আদর্শ আমরা ভারত-বর্ষে আনিয়া উপস্থিত করিয়াছি। অথচ আমাদের সমাজের পক্ষে ঐ আদর্শ গ্রহণ করিবার সামর্থ্য একেবারেই নাই বলিলেও চলে। আমরা একান্নবর্ত্তী পরিবারের মধ্যে অশান্তিকলহ আনিয়াছি, পাশ্চাত্যগৃহস্থের স্বার্থপরতা আনিয়াছি বটে, কিন্তু তাহার স্বাধীনতা এবং কর্ম্মদক্ষতা লাভ করিতে পারি নাই। আমরা আমাদিগের জাতিভেদপ্রথাকে বন্ধন মনে করিয়া উহার বিরুদ্ধে চীৎকার করিতে আরম্ভ করিয়াছি, অথচ ইউ-রোপের ঐক্যমন্ত্র হজম করিবার শক্তি আমাদিগের নাই। পাশ্চাত্য-সমাজে ব্যক্তিগত জীবনের স্বাতন্ত্র্য ব্যক্তির স্বাধীন-জীবিকার্জ্জনের উপায় হইয়া সমাজের বিপুল অর্থোৎপাদনের সহায় হইয়াছে। কিন্তু আমাদের দেশে পাশ্চাত্য-আদর্শের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা তাহার উচ্ছৃঙ্খলতার আবরণ মাত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে। স্বাধীন অন্ন-সংস্থানের কোন চেষ্টা হইতেছে না, অথচ পরিবারবর্গের প্রতি কর্ত্তব্যকর্ম্মে অনাস্থা হইয়াছে। স্বার্থ পরতার সঙ্গে অর্থ-পৈশাচিকতা এবং ভোগ-বিলাস-স্পৃহা সমাজকে আক্রমণ করিতেছে। ইউরোপীয় আদর্শের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা আমাদের সমাজে বিলাস-প্রিয়তা এবং সমাজ-বন্ধনের শৈথিল্য আনিয়া দিয়াছে।

পরানুকরণের কুফল

পূর্ব্বেই আমাদের শ্রমজীবিগণের বিলাস-সামগ্রাতে ব্যয়ের পরিমাণ দেখান হইয়াছে। মধ্যবিত্তদিগের বিলাস-খাতে ব্যয় যে অন্যশ্রেণী অপেক্ষা অধিক বলা হইতেছে, ইহার প্রতি এখনও সমাজের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় নাই। আমাদের দেশে এখন হিন্দুজাতির উচ্চশ্রেণীর সংখ্যা যে হ্রাস পাইতেছে তাহার কারণ, সমাজে ভোগ-বিলাসের বৃদ্ধি এবং বৈষয়িক জীবনের প্রবাহ-রোধ। নদীপ্রবাহের বেগ হ্রাস, বহুবৎসর চাষ, কৃষকের অল্পতা প্রভৃতি কারণে ভূমির উর্ব্বরতা হ্রাস পাইতেছে। গ্রাম্যশিল্পগুলি কলকারখানার সহিত প্রতিযোগিতায় বিধ্বস্ত হইতেছে। শিল্পিগণের বংশ-পরম্পরালব্ধ কর্ম্মনৈপুণ্য ব্যর্থ হইতেছে। দেশে মধ্যবিত্তদিগের জন্য শিল্প-ব্যবসায় শিক্ষার-বিশেষ কোন আয়োজন নাই। ধুরন্ধরগণেরও আবির্ভাব হয় নাই। অপরদিকে ভোগবিলাসের বাসনা বাড়িয়াই চলিতেছে। পল্লীগ্রামের কুটীরেও বিলাসিতার স্রোত পৌঁছিয়াছে। কৃষক এবং শ্রমজীবীদিগের মধ্যে কাঁসা-পিত্তলের বাসনের পরিবর্ত্তে এনামেলের বাসনের প্রচলন আরম্ভ হইয়াছে। কাঁসা-পিত্তলের বাসনগুলি এনামেলের বাসন অপেক্ষা অধিককালস্থায়ী এবং ভাঙ্গিয়া গেলেও ঐগুলি কাঁসা-পিত্তলের দরে বিক্রয় হয়। কিন্তু এনামেলের জিনিষগুলি অব্যবহার্য্য হইলে উহাদিগের পরিবর্ত্তে আর কিছু পাওয়া যায় না। বাস্তবিক পক্ষে তৈজসপত্রগুলি দরিদ্রদিগের মূলধনবিশেষ। অবস্থা মন্দ হইলে ঐগুলি বন্ধক রাখিয়া বা বিক্রয় করিয়া দৈনিক খরচ চালান যাইতে পারে। কিন্তু সম্প্রতি কৃষকগণ এনামেল বাসনের চাকচিক্যে মুগ্ধ হইয়া দুর্দ্দিনের সহায় ঐ সমস্ত তৈজসপত্রকে ত্যাগ করিতেছে। জামা, জুতা, এবং মিহি সূতার বিলাতী কাপড় পরিধানও আরম্ভ হইয়াছে। দেশের

বিদ্যালয়ের এমনি গুণ—কোন কৃষক বা শ্রমজীবী কয়েকদিন পণ্ডিত মহাশয়ের কাছে পড়িলেই বাবু না হইয়া ফিরিতে পারে না। অনেক সময় এমনি চাল বিগড়াইয়া যায় যে, তাহারা বসিয়া থাকিবে সেও ভাল, তবু বাপ-পিতামহের কর্ম্ম করিবে না।

মধ্যবিত্তদিগের দুরবস্থা

মধ্যবিত্তেরা এ বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা দোষী। তাঁহাদিগের মধ্যে সকলেই চাকুরীজীবী। আফিস আদালতে তাঁহাদিগকে কাজ করিতে হয়, কাজেই তাঁহারা বিদেশী বেশভূষা, চালচলন অবলম্বন করিতেছেন। কার্য্যোপলক্ষে তাঁহাদিগের সহরে থাকা আবশ্যক। গ্রাম অপেক্ষা সহরে সংসারের খরচ অনেক অধিক। গ্রামে থাকিয়া অনেক গৃহস্থ মৎস্য, শাক-সবজী বিনামূল্যে পাইয়া থাকেন, কিন্তু সহরে আসিয়া ঐগুলি ক্রয় করিতে হয়।

আহার্য্য সামগ্রীর মূল্য শতকরা ২৭৲ এবং অন্য সামগ্রীর মূল্য শতকরা ২২৲ বাড়িয়াছে। ইহার ফলে মধ্যবিত্তদিগের অবস্থা ক্রমশঃ মন্দ হইতেছে। চাকুরীজীবিদিগের মাহিয়ানা বাড়িবার আশা নাই। বরং শিক্ষিত ব্যক্তিগণের সংখ্যা যতই বৃদ্ধি পাইতেছে ততই উহা কমিতেছে। শিক্ষিত ব্যক্তিগণ ব্যবসায়-বাণিজ্যে অথবা অন্যপ্রকার স্বাধীন অন্নসংস্থানের দিকে মন বেশী দেন নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশের হার-বৃদ্ধির সঙ্গে গভর্ণমেণ্টের আফিস-আদালতে বা ব্যবসায়ীদিগের আফিসে কেরাণীগিরি পাওয়া কঠিন হইয়াছে; উকীল, মোক্তার, ডাক্তার প্রভৃতি স্বাধীন ব্যবসায়িগণের গড় আয় বিশেষ কমিয়াছে। অপরদিকে দেশের মূল্যাধিক্যের সমস্ত ভারই মধ্যবিত্তদিগের উপর পড়িয়াছে, কারণ মূল্যাধিক্যের সহিত তাহাদিগের আয়-বৃদ্ধির কোন সম্বন্ধই নাই।

অধিকমূল্যের বিদেশী বেশভূষা পরিধান, চা-পান, সিগার-সিগারেট, ধূম-সেবন, বরফ-পান প্রভৃতির সঙ্গে সহরে অবস্থানের অন্যবিধ আনুষঙ্গিক ব্যয়ের পরিমাণও বৃদ্ধি পাইয়াছে। যাতায়াতে সময়সংক্ষেপউদ্দেশ্যে না হইয়া অনেক সময়ে আরাম উপভোগের জন্য কেরাণীদিগের মধ্যে ট্রামের টিকিট বিক্রয় হইতেছে। সহরে স্বাস্থ্যরক্ষা, জলের কল, জল-সরবরাহ এবং আবর্জ্জনা-পরিষ্কারের জন্য মিউনিসিপালিটি-সমুদয়ের খরচ খুব অধিক হইয়াছে, অনেক সহরেই মিউনিসিপাল্ ট্যাক্সের পরিমাণ দুর্ব্বহ হইয়া পড়িয়াছে। তাহার পর সহরের বাড়ী-ভাড়াও বাড়িয়াই চলিতেছে। উপরন্তু সমস্ত দিন কঠোর পরিশ্রম করিয়া চাকুরীজীবিগণ বিশ্রামলাভের জন্য উৎকট আনন্দ-উপভোগের পক্ষপাতী হইতেছেন। উহাতে তাঁহাদিগের কেবলমাত্র যে অধিক ব্যয় হইতেছে তাহা নহে, নৈতিক অবস্থারও অবনতি হইতেছে। এই সমস্ত কারণে মধ্যবিত্তদিগের অবস্থা ক্রমে শোচনীয় হইয়া উঠিতেছে।

ক্রমিক সংখ্যা-হ্রাস

মধ্যবিত্তদিগের ব্যয় বাড়িতেছে, অথচ অন্ন-সংস্থানের সুবিধা হইতেছে না, সুতরাং তাঁহাদিগের পক্ষে আধুনিক চালচলন রক্ষা করা অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। বৈষয়িক অবস্থার যদি ক্রমোন্নতি না হয়, তাহা হইলে সমাজে হয় লোক-সংখ্যা হ্রাস পাইবে, না হয় সমাজানুমোদিত চালচলন রক্ষিত হইবে না। অধিকাংশ স্থলেই চালচলন রক্ষা করিবার জন্য সমাজের সমস্ত শক্তি ব্যয়িত হয়, লোকসংখ্যা হ্রাস পাইতে থাকে। ফ্রান্স এবং নিউ ইংলণ্ডে বৈষয়িক জীবন-সংগ্রাম ইউরোপের অন্য দেশ অপেক্ষা কঠোর হওয়াতে এই দুই দেশে লোক-সংখ্যার বৃদ্ধির অনুপাত অধিক কম। এজন্য এই দুই দেশের সমাজবিজ্ঞানবিদ্‌গণ বিশেষ চিন্তিত

হইয়াছেন। আমাদের দেশে উচ্চজাতিসমূহের সংখ্যা যে ক্রমশঃ হ্রাসপ্রাপ্ত হইতেছে, তাহার প্রধান কারণ একই—আমাদের দারিদ্র্য। ইউরোপীয় সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়া আমাদের চালচলন উচ্চ হইয়াছে, অনেক নূতন কৃত্রিম অভাবের সৃষ্টি হইয়াছে, কিন্তু ঐ চালচলন রক্ষা, ঐ সমস্ত নূতন নূতন অভাব মোচন করিবার জন্য দেশের নূতন নূতন বৈষয়িক অনুষ্ঠানের সূচনা হয় নাই। আমাদের বৈষয়িক জীবন-প্রবাহ প্রবলতর না হইয়া বরং বৎসরের পর বৎসর ক্ষীণ হইতেছে। কাজেই সমাজ তাহার লোক-সংখ্যা বৃদ্ধি না করিয়া চালচলন রক্ষা করিবার জন্য অধিক ব্যস্ত হইয়াছে।

ধনবৃদ্ধির উপায়—বিলাসবর্জ্জন

ধনবিজ্ঞান-বিদেরা বলিয়াছেন, ধনাগমের প্রধান উপায় মূলধনবৃদ্ধি। ধনী এবং মধ্যবিত্ত-সম্প্রদায় অন্নবস্ত্রাদির অভাব মোচন করিয়া যদি বিলাস-সামগ্রীতে তাঁহাদিগের উদ্বৃত্ত ধন-ব্যয় না করেন; পরন্তু উদ্বৃত্ত ধন শিল্প-বাণিজ্য-ব্যবসা ইত্যাদিতে নিযুক্ত হয়, তাহা হইলে দেশের ধনবৃদ্ধি অতি শীঘ্রই হইবে।

ধনী এবং মধ্যবিত্ত-সম্প্রদায়ের বিলাস-বর্জ্জন, কৃষি ও ব্যবসায়-ক্ষেত্রে যোগদান এবং উদ্বৃত্ত ধন-নিয়োগ জাতীয় ধনবৃদ্ধির একমাত্র উপায়।

আধুনিক কালে আমাদের দেশে কোন্ শিল্প এবং ব্যবসায় বিশেষ লাভজনক,—ফ্যাক্টরী, ছোট কারখানা অথবা গৃহশিল্প ইহাদিগের মধ্যে কোন্ অর্থোৎপাদন-প্রণালী বিভিন্নক্ষেত্রে অবলম্বন করা কর্ত্তব্য, বহির্বাণিজ্য এবং অন্তর্বাণিজ্য দ্বারা আমাদের মধ্যবিত্তেরা কি পরিমাণ লাভ করিতে পারেন, এ সমস্ত বিষয়ের শীঘ্রই মীমাংসা না করিলে বৈষয়িক জীবনে উন্নতির আশা করা বৃথা। এই প্রবন্ধে উক্ত জটিল বিষয়গুলি আলোচনা

করা হইবে না। কিন্তু ধনোৎপাদনের আর একটি দিক্,—ধনী এবং মধ্যবিত্তদিগের বিলাস-বর্জ্জনসম্বন্ধে দুই একটি কথা বলা আবশ্যক —

পূর্ব্বে সমাজের দিক্ হইতে বিলাস-বর্জ্জনের আবশ্যকতার কথা বলা হইয়াছে। যে সমাজে অনেক লোক অন্নবস্ত্রাভাব মোচন করিতে সমর্থ নহে, সেখানে বিলাস-ভোগ নিশ্চয়ই সমাজ-নিন্দিত এবং নীতি-বিরুদ্ধ। ধনোৎপাদনের দিক্ হইতে দেখিতে গেলেও বিলাস-বর্জ্জনের উপকারিতা বেশ বুঝা যাইবে। ধনোৎপাদন-ক্রিয়ায় সমাজের অনেক শক্তি ব্যয় হয়। এই শক্তিব্যয়ের ফলে সমাজ তাহার নানাবিধ অভাব মোচন করিতে পারে। শারীরিক অভাবগুলি মোচন করিয়া সমাজ যদি ক্রমাগত নূতন নূতন কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করিতে থাকে, তাহা হইলে শেষে সমাজ তাহার সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিয়াও তাহারই চিন্তাপ্রসূত অভাবগুলি মোচন করিতে সমর্থ হইবে না। বিলাসিতার,—সৌখীনতার সীমা নাই, কিন্তু সমাজের শক্তির সীমা আছে। সুতরাং ব্যক্তির মত সমাজেরও তাহার নির্দ্দিষ্ট শক্তির যথোচিত ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। বিলাসভোগে শক্তির অপব্যয় করিলে সমাজ ক্রমে দুর্ব্বল হয়।

ভোগে অশান্তি

কেবলমাত্র ধনবৃদ্ধির জন্য এবং সামাজিক জীবনে আনন্দ-ভোগের জন্যও বিলাস-দমন আবশ্যক।

পাশ্চাত্য-সমাজে অশান্তি

পাশ্চাত্য-জগতে ভোগবিলাসের আকাঙ্ক্ষা খুব বাড়িয়া গিয়াছে। এ কারণ ধনী এবং দরিদ্র সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যবধান খুব বেশী হইয়া পড়িয়াছে। এক দিকে কঠোর দারিদ্র্য আর এক দিকে বিলাস-ভোগের লীলাখেলা, ইহাই পাশ্চাত্যজগতের বৈষয়িক জীবনের চিত্র। অর্থের তারতম্য-অনুসারে পাশ্চাত্য-সমাজ বিশিষ্ট জাতিসমূহে বিভক্ত হইয়াছে।

অর্থপূজার বিপুল সমারোহের মধ্যে সমাজের ধর্ম্ম, প্রেম এবং আধ্যাত্মিকতা ক্রমশঃ লোপ পাইতেছে। প্রকৃত ধর্ম্ম নাই, এখন ধর্ম্মের ভাণ মাত্র হইয়াছে। ধর্ম্মের মহাপ্রাণ ভাবুকতা পাশ্চাত্যসমাজের আব্‌হাওয়াতে পুষ্টিলাভ করিতে পারিতেছে না। ধর্ম্মঅভাবে সমাজে উচ্ছৃঙ্খলতা প্রবেশ করিয়াছে। পারিবারিক জীবনের প্রতি শ্রদ্ধা আর নাই, এমন কি গৃহবন্ধনের শৈথিল্যও দেখা দিয়াছে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও অসংযম,—রাষ্ট্রীয়-জীবন দলাদলির ভাবে বিভোর হইয়া উঠিয়াছে। দলাদলি ভুলিয়া সমগ্র সমাজের যাহা প্রকৃত অভাব তাহা চিন্তা করিবার অবসর নাই। ইহার সঙ্গে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অর্থের প্রতিপত্তিও দেখা দিতেছে।

ইউরোপে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু ধনকুবেরগণই ব্যবসা-বাণিজ্যসম্বন্ধীয় সমস্ত আইনকানুন নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন। সমাজের চিন্তাপ্রণালীর মধ্যেও বিশেষ পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে। সাহিত্য-জগতে মহনীয় ভাব ও সত্য আর আবিষ্কৃত হইতেছে না। যে বিদ্যা অর্থকরী নহে তাহার সম্মান কমিয়া আসিতেছে। শিক্ষার উদ্দেশ্য নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক উন্নতি নহে। জীবিকার্জ্জনোপযোগী কর্ম্মশক্তির বৃদ্ধি শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য হইয়াছে।

বিজ্ঞান বিলাস-সামগ্রী প্রস্তুত করণের জন্য নিয়োজিত হইতেছে,—সমাজের বিশ্রাম-ভোগ যাহাতে সহজসাধ্য হয় এবং বিশ্রাম লাভ করিয়া সমাজ যাহাতে আপনার আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধন করিতে পারে তাহারদিকে দৃক্‌পাত নাই। ভূতির অভাব দেখা দিয়াছে। ডারুইন প্রমুখ সমাজ-তত্ত্ববেত্তারা বলিয়াছেন, বিজ্ঞানের সহিত চিত্রকলাও এখন বিলাস-উপভোগের সহায় হইয়াছে। সমাজের নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক আদর্শের সহিত তাৎকালিক চিত্রকলার যে জীবন্ত সম্বন্ধ ছিল, তাহা এখন লোপ পাইয়াছে।

বিলাস-ভোগের সহিত সমাজে সহানুভূতির অভাব দেখা দিয়াছে। ডারুইনপ্রমুখ সমাজ-তত্ত্ববেত্তারা বলিয়াছেন—সমাজ কেবলমাত্র প্রতি-যোগিতার ভিতর দিয়াই উন্নতিলাভ করিতে পারে। তাঁহারা বুঝাইয়াছেন, প্রতিযোগিতার ফল সক্ষমের জয় এবং অক্ষমের পরাজয়, সক্ষমেরাই সমাজের উন্নতির পথ নির্দ্ধারণ করিয়া দেয়। এই মতই পাশ্চাত্য-জগতে সাধারণতঃ গ্রাহ্য। কিন্তু বিবর্ত্তনবাদের এই মূল তথ্যটি সমাজ-বিজ্ঞানের শেষ কথা নহে। কেবলমাত্র প্রতিযোগিতার দ্বারাই সমাজের ক্রমোন্নতি হইতে পারে না, প্রতিযোগিতার সহিত সহযোগিতাও সমাজের ক্রমবিকাশ নিয়ন্ত্রিত করে। কিন্তু পাশ্চাত্যসমাজ প্রতিযোগিতাকেই এখন সভ্যতাবিকাশের মূলমন্ত্র বলিয়া স্বীকার করিয়াছে,—সহযোগিতা সামাজিক উন্নতির কিরূপ সহায়, তাহা অনুভব করিতে পারে নাই। সুতরাং প্রতিযোগিতা এবং তাহার অবশ্যম্ভাবী ফল অনৈক্যকে বর্ত্তমানে পাশ্চাত্যজগৎ স্বাভাবিক বলিয়াই স্বীকার করিয়া লইয়াছে।

আধুনিক সমাজ-তন্ত্রবাদ

কিন্তু এই অনৈক্যের সহিত যে বিলাসভোগের উচ্ছৃঙ্খলতা এবং সম-বেদনার অভাব দেখা গিয়াছে, তাহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া আধুনিক পাশ্চাত্য-পণ্ডিতেরা এক নূতন দর্শনের সৃষ্টি করিতেছেন। তাঁহারা অনৈক্য অস্বীকার করেন। তাঁহাদের মূলতত্ত্ব ঐক্যের উপরই প্রতিষ্ঠিত—ইহার নাম সোসিয়া-লিজম্ বা সমাজতন্ত্রবাদ। তাঁহারা বলেন, অনৈক্য নহে, ঐক্যই স্বাভাবিক, —পাশ্চাত্য-সমাজে শতকরা ৮০ জন এখনও স্বদেশোৎপন্ন ধনসম্পদের পাঁচ ভাগের একভাগও ভোগ করিতে পারিতেছে না, তাহার কারণ তাহাদিগের কর্ম্ম বা বুদ্ধিশক্তির অভাব নহে। তাহার কারণ ধনীরা শ্রমজীবিগণকে তাহাদিগের প্রাপ্য হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছেন। এইরূপে কৃত্রিম

অবৈধ উপায়ে শ্রমজীবিগণকে দরিদ্র করা হইয়াছে। এই বলিয়া তাঁহারা ধনীদিগকে বিচার করিবার ভার নিজদের হাতেই লইয়াছেন। ধনীরা বিলাস-উপভোগে উন্মত্ত, তাঁহাদিগের সম্পত্তি কাড়িয়া লইয়া দরিদ্র শ্রমজীবিগণের মধ্যে ভাগ করিয়া দিতে হইবে। ইহাতে যদি তুমুল বিপ্লব উপস্থিত হইবার আশঙ্কা থাকে, তাহা হইলে অধিক পরিমাণে ট্যাক্স করিয়া ধীরে ধীরে ধনীদিগের নিকট হইতে সম্পত্তি দরিদ্রদের আয়ত্তে আনিতে হইবে। যতদিন পর্য্যন্ত দেশের সমস্ত সম্পত্তি এবং মূলধন সমাজের হস্তগত না হয়, ততদিন তুমুল আন্দোলন চালাইতে হইবে। শেষে সমাজ দেশের সমগ্র ধনসম্পত্তির অধিকারী হইয়া প্রত্যেকের অভাবানুযায়ী ধন বিতরণ করিবে। বিলাসিতা চিরকালের জন্য লোপ পাইবে। অথচ কর্ম্মশক্তিও হ্রাস পাইবে না। সমাজের সহিত ব্যক্তির সম্বন্ধ তখন আরও ঘনিষ্ঠ বলিয়া বিবেচিত হইবে। প্রত্যেকে আপনার দায়িত্ব বুঝিয়া সমাজের প্রতি আপনার কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিতে কুণ্ঠিত হইবে না। অলস হইয়া সমাজের নিকট হইতে আপনার প্রাপ্য লইতে সকলেই লজ্জিত বোধ করিবে। সমাজতন্ত্রবাদীদের ইহাই আশা। মানুষ তখন প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ করিতে পারিবে,—সমাজে প্রতিযোগিতা এবং অনৈক্য থাকিবে না, ভ্রাতৃপ্রেম এবং সহকারিতা সমাজের ভিত্তি সুদৃঢ় করিয়া দিবে।

সমাজ-তন্ত্রবাদের অলীকতা

সামাজিক-জীবনে ঘোর অশান্তির ফলে এই উদ্ভট কল্পনার সৃষ্টি। সমাজে অনৈক্য না থাকিলে এক বৈচিত্র্যহীন সমতা আসিয়া সমাজকে আক্রমণ করিবে, ইহাতে সমাজ অচিরেই প্রাণহীন এবং অন্তঃসারশূন্য হইয়া পড়িবে। ইহা কখনই বাঞ্ছনীয় নহে। অধিকন্তু মনুষ্য যতদিন দেবত্বপ্রাপ্ত না হয়, ততদিন সমাজতন্ত্রবাদীদের আশা কার্য্যে পরিণত

হইবে না। প্রতিযোগিতা এবং অনৈক্য উভয়কে মানিয়াই মনুষ্য-সমাজ গঠন করিতে হইবে। কিন্তু প্রতিযোগিতা এবং অনৈক্য যাহাতে সমাজের মঙ্গলবিধানে প্রযুক্ত হয়, তাহার উপায় নির্দ্ধারণ করিয়া দিতে হইবে।

হিন্দুসমাজে ঐক্য ও অনৈক্যের সমন্বয়

আমাদের পুরাতন সমাজ বিভিন্ন আশ্রম এবং অধিকারভেদ সৃষ্টি করিয়া একদিকে প্রতিযোগিতা রক্ষা এবং অপর দিকে গোষ্ঠীর প্রভাবকে প্রবল রাখিয়াছিল। ইহার ফলে সমাজ ব্যক্তিত্বকে রক্ষা করিয়া উহার সহিত গোষ্ঠীজীবনের সামঞ্জস্য বিধান করিতে পারিয়াছিল। একদিকে ব্যক্তিত্ব বিকাশ, অপরদিকে সামাজিক জীবনে শৃঙ্খলা-বিধান, হিন্দু-সমাজের ইহাই উদ্দেশ্য ছিল। হিন্দুসমাজের এ আদর্শ এখন লুপ্তপ্রায়। মুসলমান-বিজয়ের পর হিন্দুসমাজের ক্রমোন্নতির পথ রুদ্ধ হইয়াছে। এই কারণে হিন্দুসমাজের আদর্শগুলি পরিস্ফুট হইতে পারে নাই। এই কারণেই হিন্দুর জাতি, কুল এবং ধর্ম্ম ক্রমশঃ ব্যক্তিগত হইতেছে, সমাজে গোষ্ঠী-জীবনের প্রভাব লোপ পাইতেছে। বিশাল সামাজিকত্বের আদর্শ ত্যাগ করিয়া হিন্দু এখন বাহ্য আচার-ব্যবহার এবং কার্য্য-কলাপের বিশিষ্টতা সৃষ্টি করিয়া সমতাস্থাপন এবং গোষ্ঠীর প্রভাব রক্ষা করিতে প্রয়াসী হইয়াছে। ইহাতে পদে-পদে অকৃতকার্য্য হইতেছে। আধুনিক কালে বৈষয়িক জীবন-সংগ্রাম দিনে-দিনে যতই কঠোর হইতেছে, ততই আচারমূলক সামাজিক ব্যবস্থা হীনবল হইয়া পড়িতেছে। বিশিষ্ট আচার-ব্যবহার এখন হিন্দুজাতির মধ্যে সমতা স্থাপন করিতে পারিতেছে না। আধুনিক হিন্দু-সমাজ-বন্ধনকে অগ্রাহ্য করিতেছে, সমাজ-বিরুদ্ধ ব্যক্তিত্ব এখন পুষ্টিলাভ করিতেছে। হিন্দুসমাজের ক্রমবিকাশ এখন ঠিক বিপরীত দিকে হইতেছে। হিন্দুসমাজ অহিন্দু হইতে চলিয়াছে।

হিন্দুসমাজের বাণী

কিন্তু এককালে হিন্দু-সমাজই সাম্য ও বৈষম্যের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া আমাদের বৈষয়িকজীবনে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য এবং ধর্ম্মজীবনে শান্তি এবং আনন্দ আনিয়া দিয়াছিল। হিন্দুসমাজ প্রতিযোগিতা রাখিয়াও স্বৈরাচার ও অসংযমের শাস্তিবিধান করিয়াছিল, অধিকার-ভেদ মানিয়াও স্বার্থপরতা এবং উচ্ছৃঙ্খলতাকে দমন করিয়াছিল। হিন্দুসমাজ অনৈক্যকে বরণ করিয়াছিল, কিন্তু প্রেম এবং ভাবুকতার দ্বারা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সদ্ভাব, সমতা ও প্রকৃত ঐক্য প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিয়াছিল। আধুনিক ধনবিজ্ঞানবিদ্‌গণ বিলাসবিষ-জর্জ্জরিত পাশ্চাত্যজগতে ঐক্যমূলক সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করিয়া সমাজের ঘোর অশান্তি দূর করিবেন বলিয়া যে আশার কথা প্রচার করিয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই পাগলের পাগলামি। অনৈক্যকে না মানিয়া সমাজগঠন করা অসম্ভব। অনৈক্যকে মানিতেই হইবে, অথচ অনৈক্য যাহাতে অত্যাচার ও নির্য্যাতনে পরিণত না হয়, তাহার প্রতি-বিধান করিতে হইবে। এই কথা পাশ্চাত্যজগতে প্রচারিত হওয়া আবশ্যক।

বিংশ শতাব্দীতে হিন্দু-সমাজ এই কথাই পাশ্চাত্য জগতের নিকট প্রচার করিবে। এ কথা প্রচারিত না হইলে পাশ্চাত্য-জগতের দুঃখ এবং অশান্তির অবসান হইবে না। শান্তি চাই, স্বস্তি চাই। বিলাস-অর্চ্চনার নিষ্ফল আয়োজনের ভারে প্রপীড়িত পাশ্চাত্য সভ্যতার অন্তঃস্থল হইতে দীনতার করুণ ক্রন্দন বিশ্বদেবতার চরণে পৌঁছিয়াছে। তাই বিশ্বজগতের সর্ব্বত্র নূতন জীবনের আয়োজন চলিতেছে। হিন্দুসমাজ ঐক্য ও অনৈক্য, সাম্য ও বৈষম্য, ভোগ ও ত্যাগের সমন্বয় সাধন করিয়া এক নূতন জীবনের অমৃত-মন্দাকিনী-ধারা ধাতার কমণ্ডলু হইতে মর্ত্ত্যে আনয়ন করিবে। আমরা আমাদের জাতীয় জীবনের সেই ভবিষ্যৎ সার্থকতার আশায় রহিলাম।

শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায়।

হিন্দু-মুসলমানসম্বন্ধে চিন্তার কতিপয় জলবিম্ব

বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনীতে হিন্দু মুসলমানকে ও মুসলমান হিন্দুকে চিনিতে চেষ্টা করা একটী অবশ্য কর্ত্তব্যকার্য্য। পুরাতন ঐতিহাসিকতত্ত্ব, প্রত্নতত্ত্ব যাহা আজি সাহিত্যিকগণের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া আছে, তাহার সমস্ত তত্ত্বেই হিন্দু মুসলমানের কীর্ত্তি ও স্মৃতি বিজড়িত রহিয়াছে। ভারতবর্ষে খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে মুসলমান প্রবেশ-লাভ করিয়াছে। স্বীয় বাহুবলে মুসলমান প্রবেশাধিকার লাভ করিয়া ভারতবর্ষকে নিজের করিয়া লইয়াছিল। পুনরায় নিজের জন্মভূমিতে ফিরিয়া যাইবার ইচ্ছা পরিত্যাগ করিয়া পুরুষ-পুরুষানুক্রমে ভারতবর্ষকে স্বকীয় করিয়া লইয়াছিল। কেবল তাহাই নহে, এসিয়াবাসী মুসলমান ভারতবর্ষের অধিবাসিগণকে অস্পৃশ্য, ঘৃণ্যজাতি মনে না করিয়া তাহাদের সঙ্গে রীতি-মত সম্বন্ধ পাতাইয়া পুত্রকন্যাগণের আদান-প্রদান পর্য্যন্ত চালাইয়াছিল।

এ দিকে যেমন সৌধরাজেশ্বরী তাজমহল, মতি-মসজিদ, দেওয়ান-খাস, দেওয়ান-ই-আম, আদিনা, সেকান্দ্রা নির্ম্মাণ করাইয়া জগৎসমক্ষে মুসলমান তাহার উন্নত ও প্রশস্ত-হৃদয়, অগাধ সৌন্দর্য্যজ্ঞান, জগৎ-উন্মাদ-কারী কীর্ত্তি স্থাপন করিয়াছিল, তেমনি ব্যবহারে ভক্তি ও ভালবাসার প্রস্রবণ ছুটাইয়া সমগ্র ভারতবাসীকে আপন করিয়া ফেলিয়াছিল। সাধে কি ভক্তি ও ভালবাসা-পরিপ্লুত "দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা" ধ্বনি দরবার সভায় সমুত্থিত হইয়াছিল। পলিসি অথবা কূটশাসননীতি সে সময় হিন্দু কিম্বা মুসলমানের হৃদয়কে নিয়মিত করিয়াছিল না, যাহা কিছু তাহাদের হৃদয়ের কথা তাহাই আমরা এই সুদূর ভবিষ্যতে শুনিতে পাইতেছি। আবুলফজল-ফৈজীর সংস্কৃতভাষা-চর্চ্চা, সংস্কৃতের হিতোপদেশ-পুথি আরবী ভাষার কালিয়া-দামনা গ্রন্থে পর্য্যবসিত হইয়া মুসলমান-জগৎকে দেখাইয়াছে

যে স্বাতন্ত্র্য মুসলমান-ধর্ম্মের রীতি অথবা নীতি নহে। তাহা যদি না হইত, তাহা হইলে মুসলমান অ্যাট্‌লান্টিক মহাসাগর হইতে প্রশান্ত মহাসাগর পর্য্যন্ত স্বীয় প্রাধান্য বিস্তার করিয়া বহু শতাব্দী ধরিয়া সে প্রাধান্য বজায় রাখিতে ও সেই প্রাধান্যের সাহায্য জগৎবাসীগণের নিকট পাইতে সক্ষম হইত না। হাফেজ, উমর খইউম, সাদি, মৌলাবাক্স, আধ্যাত্মিক জগতে যে আলোড়ন উৎপাদন করিয়া গিয়াছেন, তাহা আজি পর্য্যন্ত চিন্তা-সমুদ্রে লহরীলীলা দেখাইতেছে এবং সভ্যজগৎ যত দিন অক্ষুণ্ণ থাকিবে তত দিন দেখাইবে। বিশেষতঃ ভারতবর্ষের পশ্চিমপ্রান্ত হইতে পূর্ব্ব প্রান্ত পর্য্যন্ত প্রদেশসমূহ মুসলমানের কীর্ত্তি-কলাপ দ্বারা মুখরিত রহিয়াছে।

ইস্‌লামের একেশ্বরবাদ, মাদকদ্রব্য বর্জ্জনব্যবস্থা, ও ভ্রাতৃভাব শিখ-ধর্ম্মের প্রধান ভিত্তিস্তম্ভ। গুরু নানক মুসলমানধর্ম্ম-গুরুগণের 'সা' উপাধিতেই প্রথিত হইয়াছেন।

যুক্তপ্রদেশেও মহামতি কবিরশাহ হিন্দু ও মুসলমানধর্ম্মকে একই সূত্রে গ্রথিত করিতে চেষ্টা করিয়া কবিরপন্থী ধর্ম্মের সৃষ্টি করিয়াছেন। এ ধর্ম্মেরও বীজমন্ত্র ইসলামের জগজ্জনীন ভ্রাতৃভাব। শাহ নানক ও কবিরের অনুসরণ করিয়া বহু সাধুগণ মুসলমান ধর্ম্ম দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া হিন্দু-ধর্ম্মকে মুসলমান ধর্ম্মমতের যোগে এক করিয়া নূতন নূতন ধর্ম্মমত প্রবর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন।

তৎপর ইংরেজাধিকারের প্রাক্কালে মহাত্মা রামমোহন রায় ইসলাম-ধর্ম্মগ্রন্থ কোরানশরিফ এবং হিন্দুধর্ম্মের বেদ-উপনিষদ্ আদি-মন্থন করিয়া যে অমৃত সংগ্রহ করিয়াছিলেন তাহারই ফলে 'লা এলাহা ইল্লেল্লা' জগদীশ-বাণীর প্রতিরূপ একমেবাদ্বিতীয়ম্ শ্লোকের উদ্ধার করিয়া হিন্দু ধর্ম্মকে জগৎবাণীর সমক্ষে অতি উচ্চে স্থাপিত করিয়াছেন। রামমোহন

রায়ের আরবী পারসী ভাষার জ্ঞান এত গভীর ছিল যে, মুসলমান মৌলবী-গণই তাঁহাকে মৌলবী রামমোহন রায় বলিয়া অভিহিত করিতে সঙ্কোচ প্রদর্শন করেন নাই। এই গভীর জ্ঞানই মুসলমানধর্ম্মের ভাণ্ডার হইতে রামমোহন রায়ের নিমিত্ত খোলা ছিল, তাহারই ফলে ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রবর্ত্তন।

উপরের লিখিত ধর্ম্মমতগুলির প্রবর্ত্তনে ভারতবর্ষীয় হিন্দুভ্রাতাগণের যে আধ্যাত্মিক উন্নতির কারণ হইয়াছে তাহা বোধ হয় সকলেই স্বীকার করিবেন এবং সেজন্য ইসলাম যে কার্য্য করিয়াছে তাহা বোধ হয় সকলেই বিদিত আছেন। ইসলামের নিকট ভারতবর্ষীয় হিন্দু এত ঋণী থাকা সত্ত্বেও প্রত্যেক নাটক-নভেল দেখিতে পাইয়াছিলাম। মুসলমানকে সমস্ত অপকর্ম্মের কর্ত্তা এবং অতীব ঘৃণ্য ও অস্পৃশ্যজাতীয় মানব বলিয়া পরিকীর্ত্তিত করিয়াছেন। মোগলসম্রাট্‌গণ ভোগবিলাস-লালসায় নিমজ্জিত বিশাল সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র অধীশ্বরগণ হিন্দু গ্রন্থকার-গণের হস্তে অশীতি বৎসরের অথর্ব্ব, অর্ব্বাচীন জ্ঞানহীন ক্রীড়াপুত্তলীর ন্যায় জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন বলিয়া লাঞ্ছিত। বঙ্গীয় সাহিত্যে বঙ্গীয় মুসলমানগণের জন্য আগ্নেয়গিরির অগ্নিস্রোত বর্ষিত হইয়াছে। মুসলমান যদি সাহিত্য-চর্চ্চার নিমিত্ত সেই সাহিত্যক্ষেত্রে বিচরণ করিতে অগ্রসর হয়, তবে অগ্নিস্রোতের জ্বালায় তাহাদের পদতল ও হৃদয় এবং শরীর ঝলসাইয়া যায়। এজন্যই মুসলমানগণের দুর্ণাম রটিয়াছে যে, বাঙ্গলার মুসলমানগণ বঙ্গীয় সাহিত্যচর্চ্চা হইতে বিরত। সুখের বিষয় বঙ্গীয় সাহিত্যিকগণের মতিগতি অনেকটা সংযমিত হইয়াছে। মুসলমানকে কৃষ্ণবর্ণে রঞ্জিত করা বড় প্রশংসার কার্য্য বলিয়া এখন সাহিত্যিকগণ আর ভাবেন না। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মুসলমানের সহিত সহানুভূতি দেখাইয়া স্বদেশপ্রিয়তার কোনও নিয়ম লঙ্ঘন করিয়াছেন বলিয়া মনে করেন নাই, সেজন্য মুসলমানগণ তাঁহাদিগের

প্রশংসা করিতেছেন। সাহিত্য-সম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় হইতে আরম্ভ করিয়া সেদিন যে অমর কবি হঠাৎ ইহধাম বিস্মৃত হইয়া ধরাতলে লুণ্ঠিত হইয়াছেন, সকলেই তাঁহাদের অনেকগুলি মুসলমান পুরুষকে অল্পবিস্তর কলঙ্ককালিমায় অপ্রিয়দর্শন করিয়াছেন। মুসলমান সাহিত্যিকগণ সে কথা হিন্দুভ্রাতাগণকে না বলিলে তাঁহাদের কর্ত্তব্য-কার্য্যের ক্রটী হয় বলিয়া বিবেচনা করি। অল্পদিন হইতে মুসলমান সাহিত্যিকগণ শিক্ষা করিয়াছেন যে, বাঙ্গলাভাষা কেবল বাঙ্গালী হিন্দুরই মাতৃভাষা নহে। বাঙ্গালী মুসলমানগণেরও মাতৃভাষা এবং যদিও ভদ্র মুসলমানগণের মধ্যে সামাজিক ভদ্রতা রক্ষা করার নিমিত্ত উর্দ্দূ ভাষা ব্যবহার করা হয়, কিন্তু সুখে-দুঃখে রোগে-তাপে বাঙ্গালা ভাষাতেই হৃদয়ের মর্ম্মবেদনা সমুথিত হইয়া থাকে। সেজন্য আজি-কালিকার পাশ্চাত্য-শিক্ষা মুসলমানকে বাঙ্গালা সাহিত্যচর্চ্চার নিমিত্ত প্রবুদ্ধ করাইয়াছে। অল্পদিন হইল, ভারতবাসীর চিন্তাস্রোতের গতি কতক ফিরিয়াছে। এখন নিজের স্বার্থ লইয়া ব্যস্ত থাকা ইষ্টের কারণ নহে বলিয়া অনেকে বুঝিতে পারিয়াছেন। হিন্দু-মুসলমান স্বার্থ স্বার্থ করিয়া মাতিয়া থাকিলে কাহারই মঙ্গলকর নহে, ইহা কেহ কেহ বুঝিতে পারিয়াছেন। এই চক্ষু ফুটিলে মুসলমান বহুশতাব্দী ধরিয়া যে উপকার করিয়া আসিয়াছে, তাহাও হিন্দু ক্রমে ক্রমে স্মরণ করিবে। তখন মুসলমানকে যে গালাগালি করিয়াছে তজ্জন্য লজ্জিত হইবে। মুসলমানও বুঝিতে পারিবে যে শত শত বহিতে যে মুসলমানবিদ্বেষ উদ্গীরিত হইয়াছে, তাহা ভ্রমপ্রমাদ মাত্র। মুসলমান বহুশতাব্দী ধরিয়া ভারতবর্ষের অধিবাসী হওয়াতে হিন্দুর সমান অধিকারী হইয়াছে। হিন্দু যেমন আর্য্যদিগের দোলমঞ্চ হইতে ভারতবর্ষে আসিয়া অনার্য্যদিগকে তাড়াইয়া স্বীয় আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিল—মুসলমানও তাহাদিগের পথেরই অনুসরণ করিয়াছিল। এখন উভয় জাতিই ভারতবর্ষের অধিবাসী।

ঘটনাচক্রে উভয়ে একই রাজার প্রজা—উভয়েরই স্বার্থ সমান। ভারতবর্ষের উন্নতি ও ভারতবর্ষের অধিবাসিগণের উন্নতি হিন্দু-মুসলমান উভয়েরই তুল্যরূপে বাঞ্ছনীয়। ইংরেজ কবি স্ত্রীজাতি ও পুরুষজাতিসম্বন্ধে যে কথা বলিয়াছেন আমরা হিন্দু-মুসলমানসম্বন্ধে সে কথা প্রয়োগ করিতে পারি—

"The one's cause is the others
They rise or sink together
Dwarfed or God-like bond or free"

মৌলবী ইয়াকুনুদ্দিন আহম্মদ

পল্লীচিত্র

হে আমার পল্লীভবন, তোমার স্মৃতি আমার প্রাণে-প্রাণে বিজড়িত। তোমার সুখ-স্মৃতি আমার অনেক দুঃখ-যন্ত্রণা দূর করে, ঘোর দুর্দ্দিনে, গভীর কাতরতার মধ্যেও হৃদয়ে অতুল আনন্দ-ধারা ঢালিয়া দিয়া আমাকে ক্ষণকালের জন্য বিশুদ্ধ প্রেমের স্রোতে ভাসাইয়া লইয়া যায়। হে আমার জন্মপল্লি, আমার শৈশবের মাতৃক্রোড়, তোমার শ্যামল-বক্ষে, কত বার কত আনন্দে বাল্য-ক্রীড়া-কৌতুকে স্বর্গসুখ অনুভব করিতাম, তোমার বনফল সুধাফল বলিয়া সঙ্গীগণ সঙ্গে কাড়াকাড়ি করিয়া খাইতাম। এখন রাজভোগে সে আনন্দ কই, সে মধুরতা কোথায়। মানুষের জীবন-পল্লীতে, কায়া-নগরে, হৃদয়-পল্লী-ভবনে, মস্তকনগর-হর্ম্ম্যে, ধর্ম্ম-পল্লীবাসীর কুটীরদ্বারে প্রহরী, নাগরিকের অট্টালিকায় ভিখারী। মানব-জাতীয় জীবনের প্রথম সামগান পল্লীকুটীর হইতে, মানবের প্রথম প্রেমতান পল্লীর নিকুঞ্জ হইতে—মানবের স্বর্গের সোপান পল্লী-পথ হইতে উত্থিত। পৃথিবী-দর্শনাকাঙ্ক্ষী দেবকুমারগণ প্রথমে পল্লী-কুটীরেই

আতিথ্য-স্বীকার করিয়াছিলেন। তাই পল্লীর শুষ্ক নদীও প্রেম-প্রবাহিণী, পল্লীর বুনতরু কল্পতরু, পল্লীর শ্যামল-প্রান্তর কমলার লীলাভূমি। পল্লীর বনফল সুধামাখা।

সেই প্রাচীন বদরীবৃক্ষ ডালে ডালে কত সুখ-স্মৃতি গাঁথিয়া রাখিয়াছে। যখন বৃক্ষে আরোহণ করিতে অসমর্থ ছিলাম, তখন ঐ বৃক্ষটীকে কত আপনার জন বলিয়া কত মধুর-সম্ভাষণে একান্ত আপনার জনের ন্যায় জ্ঞান করিয়া কখনও বা প্রেমভরে কখনও বা অভিমানে সুপক্ব অম্লমধুর বদরীফল প্রার্থনা করিয়াছি। বায়ু-সঞ্চালনে বা বিহঙ্গ-চঞ্চুতাড়নে স্খলিত ফল পাইয়া অতিথি-বৎসল বৃক্ষকে প্রাণ ভরিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়াছি। যদি ঐ বৃক্ষকে কল্পবৃক্ষ না বলিব তবে কি কাল্পনিক স্বর্গের অদৃষ্ট, অলৌকিক, অপ্রাকৃত বৃক্ষকে কল্পবৃক্ষ বলিয়া ধন্য হইব।

পথপ্রান্তে জয়মণির বটবৃক্ষ। কোন্ অতীত কালে জয়মণি কোন শোকনিবারণ জন্য এই বৃক্ষ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল, তাহা ঐতিহাসিক লিপিবদ্ধ করে নাই, কবি কোন কাহিনীতে গায় নাই, কিন্তু জয়মণি এই পুণ্যফলে শান্তিধামে অনন্ত সুখভোগ করিতেছে। এই পথ-তরু জয়মণির কীর্ত্তিস্তম্ভরূপে, ভক্তিমান্ পুত্ররূপে আপন প্রতিষ্ঠাত্রী দেবীর যশোকীর্ত্তন করিতে করিতে মায়ের মায়ার মত ছায়া বিস্তার করিয়া পথিকের ক্লান্তি দূর করিয়া আপনি ধন্য হইতেছে। অর্থব্যয় ব্যতীত পুণ্যার্জ্জনের কোন পন্থা নাই বলিয়া যাহাদের ধারণা, তাহারা এই বৃক্ষমূলে বসিয়া বৃক্ষ-জীবনের পুণ্য-কাহিনী অবগত হইয়া পুণ্যার্জ্জনের নূতন পথ শিক্ষা করিয়া ধন্য হউন। কোন্ শুভ-মুহূর্ত্তে কোন্ ক্লান্ত পথিকের ঘর্ম্মাক্ত কলেবর-নিরীক্ষণে জয়মণির কোমল-হৃদয়ে করুণার ধারা প্রবাহিত হইয়াছিল, সেই অমৃতোপম স্নেহরসে সিক্ত করিয়া জয়মণি এই পুত্রসম পথতরু প্রতিষ্ঠিত করিয়া ধন্য হইয়াছিল তাহা কে বলিবে? ধন্য জয়মণি!

আজিও তোমার পাদপ-পুত্র, মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ সকলকে সমভাবে শান্তিদান করিতেছে, এবং তোমার অক্ষয় সদাব্রতের পুণ্যদ্বার উন্মুক্ত রাখিয়াছে। যদি পরকাল থাকে, যদি পাপ-পুণ্যের জন্য তিরস্কার-পুরস্কার থাকে, তবে এই পথতরুর স্থাপয়িত্রী নিশ্চয় পরকালে অতুল আনন্দ উপভোগ করিতেছে। অয়ি মা, বঙ্গপল্লি, তোমার সন্তান-সন্ততি যেমন পরদুঃখে কাতর, বোধ হয় আর কোন দেশের সন্তান সেরূপ নাই। বঙ্গপল্লির ধূলিকণা তীর্থধূলী, পঙ্কিল জল তীর্থ-সলিল, প্রতি তরু কল্পতরু।

ঐ ক্ষুদ্র নদী এখনও আঁকিয়া বাঁকিয়া কৃষক-ক্ষেত্রের নিকট দিয়া ধীরে ধীরে বহিয়া যাইতেছে। কত বর্ষায়, কত গ্রীষ্মে উহার স্রোতে গা ঢালিয়া দিয়া সাঁতার কাটিতাম, শরীর শীতল হইত, প্রাণ জুড়াইত। অনেক দিন জলকেলি করিতে করিতে চক্ষু রক্তবর্ণ হইত, শরীর শীতল হইয়া আসিত, তবু ক্লান্তি নাই, শ্রান্তি নাই, কেবল নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ। তখন এই নদীবক্ষ মাতৃবক্ষ বলিয়া অনুমিত হইত। পল্লীর ক্ষুদ্রনদী, স্নেহভরা মা আমার, যখন তোমার কূলে বটের মূলে ছুটাছুটী খেলিয়া ক্লান্ত হইতাম, তখন করপুটে তোমার জলপান করিয়া শান্ত হইতাম। স্বর্গের প্রান্তরে প্রান্তরে শত মন্দাকিনী বহিয়া যাউক, দেববালকগণ তাহাতে আনন্দ-কোলাহলে দেবক্রীড়া করুক, চাইনা আমি সে স্বর্গের সুখ, তুমি আমার শান্তি-বিধায়িনী, তুমিই আমার মোক্ষ-দায়িনী। তোমার ক্রোড়ে নয়ন মুদিয়া তোমার সলিলের অণুতে অণুতে দেহের প্রতি অণু মিশাইতে পারিলে ধন্য হইব। সেই আমার স্বর্গ, সেই আমার মুক্তি।

ওগো পল্লী-রমণি, জগজ্জননীর প্রতিমা, পাঠের অবকাশে বা খেলার অবসরে যখনই ক্ষুধার্ত্ত হইয়া সঙ্গীসহ তোমার সমীপে উপনীত হইয়াছি, তখনই তুমি মায়ের মত আপন-পর বিচার না করিয়া যত্নে রক্ষিত পল্লী-ফলমূল, মোয়া-মুড়ি দ্বারা আমাদের নানা ভোগ যোগাইতে। যেন

সকলেই তোমার সন্তান, সকলের জন্যই তোমার স্নেহ শতমুখী গঙ্গাধারা। আমরা যেন ব্রজবালক, তুমি যেন আমাদের মা যশোদা।

ঐ যে গ্রাম্য ভোগের মধ্যে স্নেহমাখা তাহা নাগরিক ভোগে কোথায়? সে স্নেহ-মাধুরী স্বর্গে কল্পনা করা যাইতে পারে, প্রকৃতপক্ষে পল্লীতেই উপভোগ করা যায়।

ওগো পল্লীলক্ষ্মি, তুমি মানবজাতির আদি-জননী, যে শৈশবে তোমার স্নেহ-সরোবরে অবগাহন করিবার অবসর পায় নাই, সে নিতান্ত অধম, তাহার শিক্ষা অসম্পূর্ণ রহিয়া গিয়াছে। তাহার প্রেমের পূর্ণ বিকাশ হয় নাই, হৃদয় সঙ্কীর্ণ রহিয়া গিয়াছে।

যখন পল্লীকুটীর-দ্বারে অপরাহ্ণ-ছায়া গড়িয়া পড়ে, পল্লীবধূ বৈকালিক গৃহ-কার্য্যে রত থাকে, ঘুঘুগুলি পূরবীতে বিভুগীতি গাইতে আরম্ভ করে, তখন বাহির-আঙ্গিনায় ভাগবত বা মহাভারত খুলিয়া পল্লীবৃদ্ধ মধুরস্বরে পাঠ আরম্ভ করেন, ধর্ম্মে ঢাকা ভক্তি মাখা হৃদয় লইয়া পল্লীর নর-নারী একে একে আসিয়া আঙ্গিনায় উপনীত হয়, পড়িতে পড়িতে বৃদ্ধ তন্ময়, শুনিতে শুনিতে শ্রোতৃবৃন্দ সংসারের জ্বালা-যন্ত্রণা হইতে বিমুক্ত, তাহারা যেন সুখদুঃখের অতীত কোন এক অজানা আনন্দধামে উপনীত। শুনিয়াছি, স্বর্গে বৃহস্পতি বেদগান করেন দেবসভায়। শুনেন দেবরাজ ইন্দ্র ও তাঁহার অমাত্যবর্গ। সেখানে পাপী-তাপীর স্থান নাই। তাই প্রায় ঐ দেবসভা উপেক্ষা করিয়া পল্লীসভার দিকে ধাবিত হয়, চায় না প্রাণ বৃহস্পতির বেদধ্বনি শুনিতে, চায় প্রাণপল্লী বৃদ্ধের চরণতলে বসিতে। এখানে পুণ্যাত্মা ও পাপীর প্রভেদ নাই। এখানে পাপ-তাপ জুড়াইবার অবসর আছে, ইন্দ্রের সভায় পুণ্যাত্মার ভোগ-সময় শেষ হইয়া পুণ্যক্ষয় হয়, পল্লীসভায় পাপ বিদূরিত হইয়া অক্ষয় পুণ্য সঞ্চিত হয়।

দেবতার দুয়ারে ভিখারী, কেহ শিবত্ব, কেহ বিষ্ণুত্ব, কেহ ব্রহ্মপদ লাভের আশায়। রাজদ্বারে ভিখারী কেহ বা অর্দ্ধেক রাজত্ব, কেহ বা রাজকন্যালাভের প্রত্যাশায়। নগরে নানা বিষয়ের খাতা লইয়া প্রার্থী উপস্থিত, কিন্তু পল্লীকুটীরদ্বারে অভাবের ভিখারী মুষ্টিভিক্ষায় তুষ্ট। নাগরিক লজ্জার খাতিরে চাঁদার খাতায় দস্তখত করিবার সময় বুঝিয়া বাক্স চাবি হারাইয়া ফেলে। আর পল্লীদুয়ারে ভিক্ষুক উপনীত হইলে তিন বৎসরের মেয়েরাও তাহার দুঃখে কাতর। পল্লীভাণ্ডার দরিদ্রের জন্যই উন্মুক্ত, তাই করুণাময়ী বালিকা ভিক্ষা দিতে উৎসুক।

আবার বিকালে হরিনাম করিতে করিতে ভিক্ষুক উপস্থিত, নাম বিলাইয়া যাইতেছে, অযাচিতভাবে যে যাহা দান করিয়াছে তাহাতেই সন্তুষ্ট। এমন অযাচিতভাবে নাম-গান, এমন অকাতরে ইহপরকালের সম্বলবিলীন, এমন অকুণ্ঠিতভাবে ভিক্ষা-দান দেবের দুর্লভ বঙ্গেই সম্ভব।

বঙ্গের পল্লীতে মুষ্টিভিক্ষার প্রচলনে বঙ্গের গৃহে গৃহে অন্নপূর্ণার আবির্ভাব সূচিত হয়, কোথায় আছে পৃথিবীর এমন প্রচলন, যাহা কোটীপতির অর্থ-সাহায্যে অসম্ভব, মুষ্টিভিক্ষায় দরিদ্র পল্লীবালা তাহা সম্ভব করিয়া রাখিয়াছে। ধন্য পল্লী, ধন্য তোমার অধিবাসী।

ভারতের সভ্যতা পল্লী হইতেই উপ্ত হইয়া, পল্লী হইতেই বিশালতা লাভ করিয়াছিল। দয়ার আধার বুদ্ধদেব রাজকুলে জন্মিয়া রাজগৃহে লালিত-পালিত হইয়াও, পল্লীতেই আপন অলৌকিক প্রতিভায় লোকশিক্ষায় ধরা ধন্য করিয়াছিলেন। শঙ্করের অবতার শঙ্করাচার্য্য পল্লী হইতেই স্বীয়-মত প্রচার করিয়া ভারতবাসীর হৃদয়ে ধর্ম্মভাব জাগরূক করিয়াছিল। এই বঙ্গপল্লী হইতেই জয়দেব, চণ্ডিদাস বঙ্গভূমি মুখরিত করিয়াছিল। কাশীদাস, কৃত্তিবাস প্রভৃতি লোকশিক্ষকগণ আপন আপন মঙ্গলগানে বঙ্গভূমি পবিত্র করিয়াছেন, বঙ্গ-পল্লীই বাঙ্গালীর মহাতীর্থ, বঙ্গের এমন

পল্লী নাই, যেখানে কোন মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়া তাহা ধন্য করে নাই। ইতিহাসে তাহার প্রমাণ না থাকিলেও পথতরু, পান্থশালা, দেবমন্দির, জলাশয় প্রভৃতি একদিকে পল্লী-মহাজনের কীর্ত্তিস্তম্ভরূপে বিরাজিত, অন্য-দিকে নামহীন গ্রাম্যকবির কাহিনীতে কথঞ্চিৎ ব্যক্ত। পল্লীর কত সাধু, কত মহাত্মা, বন-যূথিকার ন্যায় আপনি পরিমল বিস্তার করিয়া ঝরিয়া পড়িয়াছে কে বলিবে?

এখানে অভাব আছে, অশান্তি নাই, দান আছে, ঘটা নাই। পরোপকার আছে, আড়ম্বর নাই। সহানুভূতি আছে, অহঙ্কার নাই। আতিথেয়তা আছে, প্রত্যাখ্যান নাই। অনেক ছিল, অনেক গিয়াছে। এখনও যাহা আছে, তাহা বঙ্গ-পল্লীতেই অবিকৃত অবস্থায় আছে।

ওগো আমার স্বদেশবাসি, যদি বাঙ্গালায় স্বর্গসুখ আনিতে চাও, যদি বাঙ্গালীর মুখে হাসি, বুকে আশা, হৃদয়ে প্রেম, কুটীরে শান্তি, বাহুতে বল আনিতে চাও, তবে একবার পল্লীর দিকে ফির। পল্লীতে গোবিন্দের দোলে ফাল্গুনে বঙ্গপল্লী ছেলা-খেলায় শ্রীকৃষ্ণের লীলাভূমি করিয়া তোলে, যেখানে জাতীয় মহোৎসব দুর্গোৎসবের উপলক্ষে ভেদা-ভেদ ভুলিয়া সার্ব্বজনীন প্রেমের মধুরতা বহিয়া যায়। যে পল্লীর পঞ্চায়ত-সভায়, সামাজিকতায়, পূজায়, পার্ব্বণে, কথকতায়, পুরাণপাঠে, শ্মশানে, রাজদ্বারে, বৃক্ষস্থাপনে, জলাশয়-প্রতিষ্ঠায়, অতিথিসৎকারে মুষ্টি-ভিক্ষায়, রামায়ণ, কবিকঙ্কণ গানে, যাত্রা, কবি, ঢুলী, সারী জারী প্রভৃতি স্বল্প-ব্যয়, আমোদ-প্রমোদে সভ্যতার প্রাণপ্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। সেই পল্লীর শিক্ষার দিকে দৃষ্টিপাত করুন। যেখানে উচ্চবংশে সন্তান শিক্ষার অভাবে স্বার্থপর ও নীচমনা হইতেছে, নীচবংশ ও দরিদ্রসন্তান পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইতেছে, তাহার শিক্ষার দিকে দৃষ্টিপাত করুন। যেভাবে পল্লীর শিক্ষা চলিয়া আসিতেছে, সেই পক্ষেই তাহাদের শিক্ষার বিধান করিতে হইবে,

আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রাচীন পুরাণ একত্র করিয়া সরল ভাষায় পল্লী-বাসীকে শিক্ষা না দিলে সাহিত্যের অঙ্গ অসম্পূর্ণ রহিয়া যাইবে।

বঙ্গের পল্লীশিক্ষা বিশেষরূপে সুসম্পন্ন হইলে, আবার বঙ্গ পল্লী-ভবন আনন্দভবনে পরিণত হইবে। শত শত রামকৃষ্ণ, চৈতন্য, নিত্যানন্দ, চণ্ডিদাস প্রভৃতি আবার বঙ্গপল্লী হইতে জন্মগ্রহণ করিয়া লোকশিক্ষায় ধরা ধন্য করিবে। বঙ্গপল্লী স্বর্গে পরিণত হইবে। বঙ্গপল্লীর নিরক্ষর নিরন্ন দরিদ্র কৃষক ও শিল্পীর হৃদয়ে সরলতা ও পবিত্রতা বিরাজ করিতেছে, তাহা শতগুণে বর্দ্ধিত হইয়া বঙ্গপল্লীকে দেবপল্লীতে পরিণত করিবে।

শ্রীমাধবচন্দ্র শীকদার।

আয়ুর্ব্বেদোক্ত শস্ত্র-নির্ম্মাণ

গত বৎসর (১৯১২) জুন মাসে আমি নিম্নলিখিত পত্রখানি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সম্পাদক মহাশয়কে লিখিয়াছিলাম।

মান্যবর সাহিত্য-পরিষদ্-সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

সবিনয় নিবেদন,

অদ্য আপনার নিকট যে প্রস্তাব লইয়া উপস্থিত হইতেছি, তাহা অনেক দিবস হইতে আমি ভাবিয়া রাখিয়াছি, কিন্তু এ বিষয়ে নিজের অক্ষমতা-জ্ঞানে এতদিনে প্রস্তাবটি কার্য্যে পরিণত করিতে পারি নাই। কয়েক বৎসর ধরিয়া আমি আয়ুর্ব্বেদে রসায়ন-শাস্ত্রের কথঞ্চিৎ আলোচনা করিতেছি, সেই উপলক্ষে আয়ুর্ব্বেদের অন্যান্য বিভাগও অল্পস্বল্প পাঠ

করিয়া থাকি। আয়ুর্ব্বেদবিদ্যার্থিমাত্রেই সুশ্রুতের অতি বিস্তৃত অস্ত্র-চিকিৎসা (Surgery) পাঠ করিয়া মুগ্ধ না হইয়া থাকিতে পারেন না। সুশ্রুতে ১২৪ প্রকার বিভিন্ন প্রকারের যন্ত্র ও শস্ত্রের উল্লেখ আছে। উহারা কোন্ কোন্ দ্রব্যের দ্বারা প্রস্তুত হইবে, আকারে কত বড় ও উহাদের ব্যবহার বিস্তৃত ও বৈজ্ঞানিকভাবে বর্ণিত আছে। বড়ই আক্ষেপের বিষয় এই যে, প্রাচীন ভারতের গৌরবস্থল এই শস্ত্র-চিকিৎসা অধুনা ভারত হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছে; এক্ষণে দেশীয় শস্ত্র-চিকিৎসা অজ্ঞ নরসুন্দরবর্গের হস্তে গিয়া পড়িয়াছে। পুনরায় শস্ত্র-চিকিৎসা দেশের আয়ুর্ব্বেদ-ব্যবসায়ীদিগের মধ্যে প্রচলিত করিবার জন্য কি কি উপায় অবলম্বন করা যাইতে পারে তাহাই এক্ষণে বিচার্য্য।

অবশ্য প্রথম ও প্রধান উপায় হইবে বৈজ্ঞানিকভাবে আয়ুর্ব্বেদীয় কলেজ স্থাপন করা ও তথায় বৈজ্ঞানিক শস্ত্র-চিকিৎসা আয়ুর্ব্বেদ-বিদ্যার্থী-দিগকে শিক্ষা দেওয়া। এইরূপ বৃহৎ ব্যাপারে দেশের সমগ্র শক্তির সমবায় প্রয়োজন হইবে। আমাদের মত অবসর ও সামর্থ্যবিহীন ব্যক্তির এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা আদৌ ফলদায়ক হইবে না।

আমার মনে হয় যে, এই শস্ত্র-চিকিৎসা আয়ুর্ব্বেদ-ব্যবসায়ীদিগের মধ্যে প্রচলিত করার দ্বিতীয় উপায় হইতে পারে—আয়ুর্ব্বেদোক্ত বিভিন্ন যন্ত্র ও শস্ত্রের নমুনা প্রস্তুত করিয়া প্রকাশ্য প্রদর্শনীতে প্রদর্শন করা। অন্ততঃ এইরূপ নমুনা প্রস্তুত করার একটা বৈজ্ঞানিক দিক্‌ও আছে, এবং সেইজন্য সাহিত্য-পরিষদ্‌কে এই বিষয়ে পত্র লিখিতে সাহসী হইলাম। আমার অনেকদিন হইতে মনে হইতেছে যে, আমি নিজেই সুশ্রুত ও বাগ্‌ভটের প্রধান প্রধান শস্ত্রের দুই সেট করিয়া নমুনা প্রস্তুত করিয়া এক সেট সাহিত্য-পরিষদে ও আর এক সেট এসিয়াটিক-সোসাইটির মিউজিয়মে প্রেরণ করি। এই সকল শস্ত্রের কয়েকটি চিত্র বিভিন্ন গ্রন্থে দেখিতে

পাই। গণ্ডালের ঠাকুর সাহেব কৃত "History of the Aryan Medical Science" গ্রন্থে ২৮টি শস্ত্রের সুন্দর চিত্র আছে। Dr. Wise কৃত "Commentary on the Hindu System of Medicine" নামক গ্রন্থেও অনেকগুলি ছবি আছে। কবিরাজ নগেন্দ্রনাথ সেনের সুশ্রুতের বঙ্গানুবাদেও অনেকগুলি চিত্র দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু কোন গ্রন্থে সকলগুলির চিত্র দেওয়া দেখিতে পাই নাই। আমি নিজে আয়ুর্ব্বেদ-ব্যবসায়ী নহি। এ ক্ষেত্রে এই প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিবার অধিকার আমার নিজের নাই বলিয়া মনে করি ও সেইজন্য সাহিত্য-পরিষদের বিজ্ঞানশাখার অন্তর্ভুক্ত বলিয়া এই প্রস্তাব সাহিত্য-পরিষদে প্রেরণ করিতে সাহসী হইলাম।

আমার মনে হয় নিম্নলিখিত উপায়ে এই বিষয়ে কার্য্য আরম্ভ করা যাইতে পারে।

(১) পরিষদ্ প্রথমে আয়ুর্ব্বেদ-ব্যবসায়ী ও অন্যান্য ইচ্ছুক ব্যক্তিদিগকে লইয়া একটি কমিটি নির্ব্বাচিত করিতে পারেন। আমি এই কমিটির মধ্যে কার্য্য করিতে স্বীকৃত আছে।

(২) এই কমিটি নিম্নলিখিত কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিবেন :—

(ক) যাবতীয় প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত আয়ুর্ব্বেদীয় যন্ত্র ও শস্ত্রের বিবরণ ও চিত্র-সঙ্কলন করা।

(খ) কোন্ কোন্ ধাতুর দ্বারা প্রত্যেক যন্ত্র বা শস্ত্র নির্ম্মিত হইবে ও প্রত্যেকটির আকার ও মাপ কিরূপ হইবে তাহা নির্ণয় করা।

(গ) তাহাদের মধ্যে কোন্ কোন্ অস্ত্রের নমুনা প্রস্তুত করা প্রয়োজন তাহা নির্দ্ধারণ করা। দৃষ্টান্ত স্বরূপ "শলাকা" ত্রিশ প্রকার আছে। উহার মধ্যে হয়ত ৩।৪ টির নমুনা প্রস্তুত করিলেই যথেষ্ট হইবে। এই কমিটির কার্য্য ছয় মাসের মধ্যে শেষ হওয়া উচিত। তাহার পর

Bengal Chemical & Pharmaceutical Works এ বা দেশীয় অন্য কোন ফারমে দুই সেট করিয়া নমুনা (অন্ততঃ ১ সেট) প্রস্তুত করিয়া প্রকাশ্য প্রদর্শনীতে প্রদর্শন করা যাইতে পারে। পরিষদ্ যদি এই কার্য্য গ্রহণ করেন, তাহা হইলে আমি উহার ব্যয়কল্পে ১০০৲ টাকা প্রদান করিতে স্বীকৃত আছি। এই কার্য্যে এক বা দুই শত টাকার বেশী খরচ হইবে না বলিয়া আমার বিশ্বাস। এ সম্বন্ধে পরিষদের ইচ্ছা জ্ঞাপন করিলে বাধিত হইব। ইতি ভবদীয় শ্রীপঞ্চানন নিয়োগী

ইহার উত্তরে পরিষৎ আমাকে জানান যে আমার প্রস্তাব পরিষদ্ কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইয়াছে এবং প্রস্তাবটি কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য ১৩১৯ সালের ১৬ই আষাঢ়ের পরিষদের কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতিতে নিম্ন-লিখিত ব্যক্তিগণকে লইয়া এক শাখা-সমিতি গঠিত হইয়াছে।

১। কবিরাজ শ্রীযুক্ত দুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী
২। " " যোগেন্দ্রনাথ সেন এম্ এ, বৈদ্যরত্ন
৩। " " গণনাথ সেন এম্ এ, এল্-এম্-এস্
৪। " " যামিনীভূষণ রায় এম্ এ, এম বি
৫। " " দক্ষিণারঞ্জন রায় চৌধুরী এল্-এম্-এস্
৬। " " শীতলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
৭। ডাক্তার " জ্ঞানেন্দ্রনাথ কাঞ্জিলাল
৮। " " পি, সি, রায়, ডি এস্ সি, পি, এচ, ডি, সি আই, ই
৯। " পঞ্চানন নিয়োগী এম্ এ
১০। " মনোহর দাস বিশারদ
১১। " বনওয়ারীলাল চৌধুরী বি এ, বি, এস্ সি

(সম্পাদক)

সেই পত্রে আমি আরও জ্ঞাত হই যে, যথাসম্ভব শীঘ্র এই শাখা-সমিতির অধিবেশন আহূত হইবে। কিন্তু আজ প্রায় এক বৎসর অতীত হইল, এই শাখা-সমিতির একটিও অধিবেশন হয় নাই। এই বিষয় এই সম্মিলনে উপস্থিত করিবার আমার উদ্দেশ্যে এই যে, প্রকাশ্য সভায় এ বিষয়ের কথঞ্চিৎ আলোচনা হইলে এই বিষয়ে শাখা-সমিতির মনোযোগ আকৃষ্ট হইতে পারে। আয়ুর্ব্বেদোক্ত বিবিধ শস্ত্রনির্ম্মাণসম্বন্ধে আমার বক্তব্য পত্রখানিতেই ব্যক্ত করিয়াছি। এখানে এ সম্বন্ধে বেশী কিছু বলিবার নাই। যদি কেহ মনে করেন যে, এই সকল শাস্ত্রের নমুনা প্রস্তুত-ক্রিয়া আয়ুর্ব্বেদ-ব্যবসায়ীদিগের মধ্যে শস্ত্রবিদ্যার প্রচলনকল্পে সহায়তা করিবে না, আমি তাঁহাদিগের দৃষ্টি শস্ত্রনির্ম্মাণ-ক্রিয়ার বৈজ্ঞানিক দিক্‌টার প্রতি আকর্ষণ করিতে ইচ্ছা করি। প্রাচীন ভারতের চিন্তা-শক্তির এই অমূল্য নিদর্শন দেশ হইতে বহুদিন লোপ পাইয়াছে, কিন্তু তাই বলিয়া এই সকল শস্ত্রের কিরূপ আকার, গঠন ও ক্রিয়া ছিল তাহা কি এ জন্মে কেহ প্রত্যক্ষ করিতে পাইবে না? এই কার্য্য আমার মত অনভিজ্ঞ ব্যক্তির দ্বারা নিষ্পন্ন হইলে সুষ্ঠুভাবে নিষ্পন্ন হইবে না, পূর্ব্বোক্ত অভিজ্ঞ শাখা-সমিতি কর্ত্তৃক নিষ্পন্ন হইলে উহা সর্ব্বজনগ্রাহ্য হইবে। এই ভরসায় আমি দেশের অভিজ্ঞ জনসাধারণের ও উপরোক্ত শাখা-সমিতির দৃষ্টি পুনরায় এই বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট করিতে ইচ্ছা করি। যদি প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে আমি আরও ১০০৲ টাকা আমার পরিচিত ব্যক্তি ও বন্ধু-বান্ধবগণের মধ্য হইতে তুলিয়া দিব স্বীকার করিতেছি।

পরিশেষে গত বৈশাখের "ভারতী" হইতে মৎপ্রণীত "সুশ্রুত" নামক প্রবন্ধ হইতে "সুশ্রুতোক্ত অস্ত্রচিকিৎসা" অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম, পাঠক-পাঠিকা ইহা হইতে আয়ুর্ব্বেদোক্ত শস্ত্রবিদ্যার কথঞ্চিৎ পরিচয় পাইবেন।

সুশ্রুতোক্ত অস্ত্র-চিকিৎসা

(১) শিক্ষা

সুশ্রুত অস্ত্রচিকিৎসা আট ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন—(১) ছেদ্যক্রিয়া (কোন অঙ্গছেদন করা), (২) ভেদ্যক্রিয়া (কোন স্থান ভেদ করা), (৩) লেখ্যক্রিয়া (কোন স্থানের চর্ম্ম উত্তোলন করা), (৪) বেধ্যক্রিয়া (দূষিত রক্তাদি বাহির করিয়া দিবার জন্য শিরাদি ভেদ করা), (৫) এষ্যক্রিয়া (নালীঘা, বাঘী প্রভৃতি রোগে ক্ষতাদির পরিমাণ অন্বেষণ করা), (৬) আহার্য্যক্রিয়া (অশ্মরী প্রভৃতি রোগোদ্ভূত দ্রব্যাদি বাহির করা), (৭) বিস্রাব্যক্রিয়া (স্রাব উৎপাদন করা), ও (৮) সীবন (সেলাই করা)। চিকিৎসকে অস্ত্রক্রিয়াদি কর্ম্মে পারদর্শিতা লাভ করিতে হইলে শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলেই চলিবে না, অস্ত্রাদির দ্বারা প্রকৃতরূপে ছেদনাদি অস্ত্র-ক্রিয়া বহুদিবস ধরিয়া অভ্যাস করিতে হইবে। কিরূপ কৌতূহলোদ্দীপক উপায়ে গুরুশিষ্যকে বিবিধ অস্ত্রক্রিয়া শিক্ষা দিতেন, তাহার অভ্যাস নিম্নে প্রদত্ত হইল।—

১। ছেদ্যক্রিয়া (incision)—কুমড়া, লাউ প্রভৃতি দ্রব্যকে ছেদন করিয়া অঙ্গচ্ছেদনাদির প্রণালী শিক্ষা করিতে হইবে।

২। ভেদ্যক্রিয়া (puncturing)—চামড়ার থলি, মৃত পশুর প্রস্রাবের থলি বা চামড়ার থলির মধ্যে জল ও কর্দ্দম পুরিয়া তাহা ভেদ করিয়া ভেদ্যক্রিয়া শিক্ষা করিতে হইবে।

৩। লেখ্যক্রিয়া (scratching)—মৃত পশুর লোমযুক্ত চর্ম্ম আঁচ-ড়াইয়া শিক্ষা করিবে।

৪। এষ্যক্রিয়া (probing)—ঘুণধরা বাঁশ বা কাষ্ঠ, অথবা শুষ্ক লাউর মুখে অস্ত্র প্রবেশ করাইয়া এষ্যক্রিয়া শিক্ষা করিবে।

৫। আহার্য্য (extraction)—কাঁঠাল প্রভৃতি ফলের মজ্জা এবং মৃত পশুর দন্তে যন্ত্র প্রবেশ করাইয়া এই ক্রিয়া শিক্ষা করিবে।

৬। বিস্রাব্যক্রিয়া (evacuating fluids)—মোমের দ্বারা পূর্ণ একখানি সিমুলকাষ্ঠে যন্ত্র প্রবেশ করাইয়া রক্তপূঁজাদি স্রাব করিবার প্রণালী শিক্ষা করিবে।

৭। সীব্যক্রিয়া (sewing)—বস্ত্র বা নরম চর্ম্ম সূচীদ্বারা সেলাই করিয়া সীব্যক্রিয়া শিক্ষা করিতে হইবে।

৮। বেধ্যক্রিয়া (boring)—মৃত পশুর শিরা বা পদ্মের ডাঁটা বিঁধিয়া বেধ্যক্রিয়া শিক্ষণীয়।

৯। বন্ধনকার্য্য (bandage)—বস্ত্রাদির দ্বারা নির্ম্মিত পুরুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বন্ধন করিয়া বন্ধনকার্য্য শিক্ষা করিবে। কোমল মাংসপেশী বা পদ্মের ডাঁটা বন্ধন করিয়া সন্ধিবন্ধন শিক্ষা করিবে।

১০। ক্ষার ও অগ্নিকার্য্য (cautery by caustics and fire)—মৃত পশুর কোমল মাংসখণ্ডের উপর ক্ষার ও অগ্নি প্রয়োগ করিয়া শিক্ষা করিতে হইবে।

১১। বস্তিকার্য্য (catheterisation)—জলপূর্ণ কলসীর প্রান্তভাগ ছিদ্র করিয়া তাহার স্রোতে এবং লাউর মুখদেশে বা সেইরূপ অপর দ্রব্যে পিচকারী প্রয়োগ করিয়া বস্তিক্রিয়া শিক্ষণীয়।

এইরূপে অস্ত্রক্রিয়া সম্যক্‌রূপে শিক্ষা করিবার পর চিকিৎসাকার্য্যে অভ্যাস ও দক্ষতালাভ করিলে চিকিৎসক চিকিৎসাকার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন; অস্ত্র প্রয়োগ করিবার পূর্ব্বে চিকিৎসক তৎকর্ম্মোপযোগী যন্ত্র, অস্ত্র, তুলা, বস্ত্রখণ্ড, সূত্র, পাখা, শীতল ও উষ্ণজল প্রভৃতি দ্রব্য ও উপযুক্ত সবল পরিচারক সংগ্রহ করিবেন। মূঢ়গর্ভ, উদর, অর্শ, অশ্মরী, ভগন্দর ও মুখরোগে অস্ত্র করিতে হইলে রোগীর আহারের পূর্ব্বে অস্ত্র-ক্রিয়া সম্পাদন

করিতে হইবে। চিকিৎসক বিশেষ সতর্কতার সহিত অস্ত্র প্রয়োগ করিবেন, যেন সূক্ষ্ম শিরা ও স্নায়ু কাটিয়া না যায়। অস্ত্র করিবার পর অঙ্গুলির দ্বারা পূঁযরক্ত বাহির করিয়া দিয়া নিমপাতাদি কষায় দ্রব্যের জলে বেশ করিয়া ক্ষতস্থান ধৌত করিয়া দিবেন। পরে তিল বাটা, মধু ও ঘৃতমিশ্রিত করিয়া পলিতা বা বস্ত্রখণ্ড মাখাইয়া ক্ষতমধ্যে পুরিয়া দিবেন ও তদুপরে মসিনার পুলটিশাদি দিয়া তিন চারি পর্দ্দা কাপড়ের দ্বারা শক্ত করিয়া বাঁধিয়া তিন দিবস অতিবাহিত হইলে ক্ষতের বন্ধন খুলিয়া পুনরায় নিমপাতাদির কষায়জলে ধৌত করিয়া ঔষধাদি দিয়া পুনরায় বাঁধিয়া দিবেন। এইরূপ যতদিবস ক্ষত বেশ শুকাইয়া না যায় ততদিবস ধৌত করিয়া ঔষধ ও মলম লাগাইয়া দিবেন।

(২) যন্ত্র

অস্ত্র-প্রয়োগকল্পে সুশ্রুত ১২৫ প্রকার অস্ত্রের উল্লেখ করিয়াছেন। সেগুলি আবার দুই ভাগে বিভক্ত—যন্ত্র ও শস্ত্র। যন্ত্র সর্ব্বসমেত ১০১টি, ও শস্ত্র ২৪ প্রকার। যন্ত্রের মধ্যে হস্তই প্রধানতম যন্ত্র, কারণ হস্ত ভিন্ন কোন যন্ত্রই প্রয়োগ করা যায় না। যন্ত্রগুলি আবার ছয়ভাগে বিভক্ত—(১) স্বস্তিক যন্ত্র (চব্বিশ প্রকার), (২) সন্দংশ যন্ত্র (দুই প্রকার), (৩) তাল যন্ত্র (দুই প্রকার), (৪) নাড়ীযন্ত্র (বিংশতি প্রকার), (৫) শলাকাযন্ত্র (আটাইশ প্রকার) ও (৬) উপযন্ত্র (পঁচিশ প্রকার)। এই সকল যন্ত্র লৌহ বা স্বর্ণাদি পাঁচটি ধাতুর দ্বারা নির্ম্মিত হইত। আবশ্যকমত অন্যপ্রকার যন্ত্রাদি প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থাও সুশ্রুত দিয়া গিয়াছেন।

১। স্বস্তিকযন্ত্র—অষ্টাদশ অঙ্গুলি দীর্ঘ এবং দুই খণ্ড লৌহ একটি খিল দ্বারা আবদ্ধ। সিংহ, ব্যাঘ্র, মৃগ প্রভৃতি দশ প্রকার পশুর ও কাক,

চিল, শকুনি প্রভৃতি চতুর্দ্দশ প্রকার পক্ষীর, সর্ব্বসমেত চব্বিশ প্রকার জন্তুর মুখের সাদৃশ্যে চব্বিশ প্রকার স্বস্তিযন্ত্র নির্ম্মিত হইত। হাড়ের মধ্যে বাণ বা কোন প্রকার শল্য বিদ্ধ হইলে তাহা বাহির করিবার জন্য স্বস্তিকযন্ত্রই ব্যবহৃত হইত।

২। সন্দংশ যন্ত্র—ষোল অঙ্গুলি দীর্ঘ। এক প্রকার সন্দংশ যন্ত্র কর্ম্মকারের সাঁড়াশীর মত ও অপরটি ক্ষৌরকারের সন্নার মত। চর্ম্ম, মাংস, শিরা ও স্নায়ু হইতে ক্ষুদ্র শল্য বা কণ্টক বাহির করিবার জন্য সন্দংশ যন্ত্র ব্যবহৃত হইত।

৩। তাল যন্ত্র—বার অঙ্গুলি দীর্ঘ। কর্ণ-নাসিকাদির ভিতর হইতে মলাদি বাহির করিবার জন্য ব্যবহৃত হইত।

৪। নাড়ীযন্ত্র—নানা আকারে নির্ম্মিত ও নানা কার্য্যে ব্যবহৃত হইত। অর্শোযন্ত্র, অঙ্গুলিত্রাণ-যন্ত্র প্রভৃতি নাড়ীযন্ত্রের রূপান্তর।

৫। শলাকাযন্ত্র—আটাইশ প্রকার—শলাকাযন্ত্র বিভিন্ন-কার্য্যে ব্যবহৃত হইত বলিয়া নানা আকারে নির্ম্মিত হইত।

(৩) শস্ত্র বা অস্ত্র

সুশ্রুত শস্ত্র বা অস্ত্র বিংশতি প্রকার বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন—(১) মণ্ডলাগ্র, (২) করপত্র, (৩) বৃদ্ধি, (৪) নখশস্ত্র, (৫) মুদ্রিকা, (৬) উৎপলপত্র, (৭) অর্দ্ধধার, (৮) সূচী, (৯) কুশপত্র, (১০) আটীমুখ, (১১) শারীরমুখ, (১২) অন্তর্মুখ, (১৩) ত্রিকূর্চ্চক, (১৪) কুঠারিকা, (১৫) ব্রীহিমুখ, (১৬) আরা, (১৭) বেতসপত্রক, (১৮) বড়িশা, (১৯) দন্তশঙ্কু, (২০) এষণী।

এই সকল অস্ত্র ছেদ্যক্রিয়া, ভেদ্যক্রিয়া, এষণক্রিয়া, সীবন প্রভৃতি পূর্ব্বোক্ত অষ্টপ্রকার অস্ত্রপ্রয়োগক্রিয়ায় প্রয়োজনানুসারে ব্যবহৃত হইত।

এই সকল অস্ত্র উৎকৃষ্ট লৌহের দ্বারা নির্ম্মিত, তীক্ষ্ণধারবিশিষ্ট, উত্তমরূপে ধরিবার উপায় বিশিষ্ট ও দন্তবিহীন হওয়া আবশ্যক। অস্ত্রসকলের ধার যন্ত্রভেদে মসূরকলায়ের ন্যায় স্থূল হইতে অর্দ্ধচুল প্রমাণ সূক্ষ্ম হওয়া আবশ্যক। অস্ত্রের ধার সমান রাখিবার জন্য অস্ত্র শিমূলকাষ্ঠের খাপে রক্ষিত হইত এবং অস্ত্রে শান দিবার জন্য মাষকলাইয়ের রংবিশিষ্ট প্রস্তর ব্যবহৃত হইত।

কিরূপ দুরূহ অস্ত্রচিকিৎসার উপদেশ সুশ্রুত দিয়া গিয়াছেন, দৃষ্টান্তস্থলে আমরা গর্ভস্থিত মৃতসন্তান ছেদন করিয়া বাহির করিবার প্রক্রিয়া এস্থলে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম—"গর্ভস্থ মৃতসন্তান হস্ত-সাহায্যে বাহির করিতে না পারিলে অস্ত্র দ্বারা ছেদন করিয়া বাহির করিতে হইবে। কিন্তু সন্তান যদি জীবিত থাকে, তাহা হইলে কদাচ অস্ত্রপ্রয়োগ করিতে নাই, কারণ তাহাতে গর্ভিণী ও সন্তান উভয়েরই মৃত্যু হইয়া থাকে। গর্ভস্থ মৃতসন্তান বাহির করিতে হইলে, গর্ভিণীকে আশ্বাস-প্রদানপূর্ব্বক মণ্ডলাগ্র বা অঙ্গুলি-শস্ত্র দ্বারা প্রথমতঃ গর্ভের মস্তক বিদীর্ণ করিবে, এবং শঙ্কু (আকর্ষণী) অস্ত্রের দ্বারা খণ্ড খণ্ড খর্পরগুলি বাহির করিয়া, পরে বক্ষঃ ও কক্ষদেশ ধরিয়া নিষ্কাশিত করিবে। যদি মস্তক বিদীর্ণ করিতে না পারা যায়, তাহা হইলে অক্ষিপুট বা গণ্ডদেশ ধরিয়া বাহির করিতে হয়। গর্ভস্থ সন্তানের স্কন্ধদেশ অপত্যপথে আবদ্ধ হইলে, সেই স্কন্ধসংলগ্ন বাহু ছেদন করিতে হয়। গর্ভস্থ বালকের উদর, দৃতি অর্থাৎ ভিস্তীর ন্যায় বায়ুপূর্ণ থাকিলে, তাহা চিরিয়া অন্ত্রসমূহ আগে বাহির করিবে। ইহাতে গর্ভস্থ দেহ শিথিল হইয়া পড়ে, সুতরাং তখন অনায়াসেই বাহির করিতে পারা যায়। জঘনদেশ দ্বারা অপত্যপথ অবরুদ্ধ হইলে, জঘনদেশের অস্থিখণ্ডসকল ছেদন করিয়া নিষ্কাশিত করিবে।......মৃতগর্ভ ছেদন করিয়া বাহির করিতে হইলে, মণ্ডলাগ্র নামক অস্ত্রই প্রয়োগ করা উচিত; উহাতে তীক্ষ্ণাগ্র বৃদ্ধিপত্র অস্ত্র প্রয়োগ করিতে নাই; করিলে গর্ভিণীকে আঘাত লাগিতে

পারে।" হায়! অধুনা আয়ুর্ব্বেদ-ব্যবসায়িগণের নিকট গর্ভস্থ মৃত-সন্তানের ছেদনের কল্পনাও আকাশকুসুমরূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকে, এমন কি তাঁহারা মণ্ডলাগ্র বা অন্য প্রকার অস্ত্র কখনও স্বচক্ষে দেখেন নাই! এমন দিন কি আসিবে না যখন আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসায় আবার উন্নত অস্ত্রচিকিৎসা স্বকীয় উচ্চ আসন গ্রহণ করিতে সমর্থ হইবে?

শ্রীপঞ্চানন নিয়োগী